শেখ মুজিব : জীবন ও রাজনীতি

স্বাধীনতা পরবর্তী

বাংলাদেশ

ড. মাহফুজ পারভেজ

সম্পাদিত

শেখ মুজিব: জীবন ও রাজনীতি

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ

শেখ মুজিব: জীবন ও রাজনীতি

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ

ড. মাহফুজ পারভেজ
সম্পাদিত

মাজহারুন-নূর ফাউন্ডেশন
রেক্স পাবলিকেশন্স

প্রকাশক
মাজহারুন-নূর ফাউন্ডেশন
৫/৬ (৩য় তলা), ব্লক-এ, লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭
০১৭১৩০৬২৫৯২, ০১৮১৮১১৬৪১৮, ৮১১৭২৪৭
<mazharun_noor_foundation_bd@yahoo.com>

ISBN : 984-611-002-2

Mazharun-Noor Foundation Book Series : 02
RAQS Book Series : 05
MNF & RAQS Book Series : 01

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
জানুয়ারি: ২০০৭
জিলহজ-মুহররম: ১৪২৭
পৌষ-মাঘ: ১৪১৩

পরিবেশক
আহসান পাবলিকেশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৬৬০

প্রচ্ছদ : এম জি এ আলমগীর

কম্পোজ : ফরিদ উদ্দীন আহমদ

মুদ্রণ
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য ঃ ১৩০ (একশত ত্রিশ টাকা) মাত্র

Sheikh Mujib-Jiban O Rajniti: Sadinata Parabarti Bangladesh [Sheikh Mujib-Life and Politics: Post-Libaration Bangladesh], Edited by: Dr. Mahfuz Parvez, Published by: Mazharun-Noor Foundation and RAQS, Dhaka, Bangladesh.
<mazharun_noor_foundation_bd@yahoo.com> First Edition January 2007, Price Tk-130.00 only. ($-2.00)

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের
প্রফেসর ড. এম. আজিজুল হক
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের
আলহাজ প্রফেসর ড. মো. সানাউল্লাহ
বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের জিএম একাউন্স
জনাব সহিদউদ্দিন আহমেদ

স্মৃতির উদ্দেশে-

মাজহারুন-নূর ফাউন্ডেশন

শিক্ষা, গবেষণা, চিকিৎসা, মানবকল্যাণ, উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, মানবাধিকার বিষয়ক অরাজনৈতিক ও অলাভজনক উদ্যোগ

৫/৬ (৩য় তলা), ব্লক-এ, লালমাটিয়া
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ
০১৭১৩০৬২৫৯২, ০১৮১৮১১৬৪১৮, ৮১১৭২৪৭
<mazharun_noor_foundation_bd@yahoo.com>

Mazharun-Noor Foundation

A non-political & non-profit initiative for eduaction, research, health, welfare, development, poverty alleviation & human rights

5/6 (2nd Floor), Block-A, Lalmatia
Dhaka-1207, Bangladesh.
Phone : 01713062592, 01818116418. 8117247
<mazharun_noor_foundation_bd@yahoo.com>

সূচিপত্র

মুখবন্ধ

বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৩৬ বছর পর সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির নানা প্রসঙ্গ ও প্রপঞ্চকে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছে। বিশেষ করে, সাংবিধানিকতা, গণতন্ত্র, নির্বাচন, আমলাতন্ত্র, বিরোধী দল, বিদেশ নীতি ইত্যাদি সুশাসন ও রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া, প্রতিষ্ঠান ও বিষয়াবলী এ যাবতকালেও ধারাবাহিক-প্রাতিষ্ঠানিক-আইনানুগ দৃঢ়ভিত্তি না পেয়ে বার বার বিভ্রান্তি ও বিতর্কে জড়িয়ে যাচ্ছে। স্বচ্ছতা, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা, নির্বাচন ও শাসনের গ্রহণযোগ্যতা, ক্ষমতার ভারসাম্য, পৃথকীকরণ, মৌলিক প্রতিষ্ঠানের স্বায়ত্তশাসন ইত্যাদির মাধ্যমে গণতন্ত্রের সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলা যাচ্ছে না। তদুপরি, একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের যুগে আন্তর্জাতিক রাজনীতির গুণগত পরিবর্তনের ধারায় আমাদের সংঘাতময় সমাজ ও রাজনীতিকে ভেতরে-বাইরে থেকে সামাল দিতে হচ্ছে পরিবর্তন ও পালাবদলের তীব্র গতিবেগকেও। ফলতঃ এমন সঙ্কুল ও ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ পরিস্থিতি থেকে স্থায়ী ও শান্তিপূর্ণ সমাধানস্থলে উত্তরণের পথ-সন্ধান আমাদের চিন্তাশীল ও ভাবুক সমাজের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। এ চ্যালেঞ্জ মুকাবিলার জন্যে আমাদের যেমন হতে হবে ভবিষ্যতমুখী, তেমনি হতে হবে অতীত-অনুসন্ধানী। বর্তমান গ্রন্থে 'শেখ মুজিব: জীবন ও রাজনীতি'র আলোকে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের মূল্যায়ন প্রয়াস বস্তুতপক্ষে আমাদের ভবিষ্যত বিনির্মাণের পথে অতীতের পর্যালোচনা। এক্ষেত্রে যে সকল লেখক-গবেষক তাদের মননশীলতার মাধ্যমে স্ব স্ব আলোচ্য বিষয়কে গভীরতর মাত্রায় বিশ্লেষণ করেছেন, তারা সকলেই স্বকীয় পাণ্ডিত্য ও যোগ্যতায় উজ্জ্বল বাংলাদেশের একেকজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। আমাদের প্রত্যাশা, এ গ্রন্থ উচ্চতর সমাজ বিজ্ঞানের নানা শাখার পাঠকদের, বিশেষ করে, 'বাংলাদেশ অধ্যয়নে' আগ্রহী মানুষের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। এ বিবেচনা থেকেই মাজহারুন-নূর ফাউন্ডেশন গ্রন্থটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছে। এর আগে ২০০১ সালে আমরা জেন্ডার বা নারী বিষয়ক একটি গ্রন্থ প্রকাশ করি, যা ব্যাপক পাঠক আকৃষ্ট করেছিল; এ গ্রন্থটিও পাঠক-ধন্য হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। আমরা এ গ্রন্থের সম্পাদক, লেখক, প্রকাশনা সহযোগীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

আলহাজ ডা. এ.এ. মাজহারুল হক
প্রতিষ্ঠাতা-চেয়ারম্যান, মাজহারুন-নূর ফাউন্ডেশন

লেখক পরিচিতি

ড. এম. নজরুল ইসলাম
প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম
প্রফেসর, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. দিলারা চৌধুরী
প্রফেসর, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. মাহফুজ পারভেজ
এসোসিয়েট প্রফেসর, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. মোহাম্মদ সোলায়মান
প্রফেসর, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. তারেক শামসুর রেহমান
প্রফেসর, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. জোহোরা খানম
প্রফেসর, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. হাসান মোহাম্মদ
প্রফেসর, রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ড. ইউ.এ.বি. রাজিয়া আখতার বানু
প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মুহাম্মদ জহিরুল আলম
গবেষক ও শিক্ষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট।

শরীফ মামুনুর রহমান হামীদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখক-গবেষক, লামপুর, কুমিল্লা।

ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার তিন যুগ এবং শেখ মুজিবের (১৯২০-১৯৭৫) করুণ মৃত্যুর তিরিশ বছর পরের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে 'শেখ মুজিব-জীবন ও রাজনীতিঃ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ' গ্রন্থের আত্মপ্রকাশ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অবিসম্বাদিত ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিবর রহমানকে নিয়ে ইতিমধ্যে অসংখ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তবে সেসব গ্রন্থের কোনো একটিকেও পূর্ণাঙ্গ-স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ বলা যায় না। প্রকাশিত মুজিব-সংক্রান্ত গ্রন্থের কোনোটিতে এ মহান নেতার একচেটিয়া প্রশংসা, কোনোটিতে প্রতিহিংসামূলক সমালোচনা করা হয়েছে। পক্ষপাত-আক্রান্ত মুজিব চর্চার গতানুগতিক পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে সম্পাদিত এ গ্রন্থ মুজিব-বীক্ষণের নবতর পর্যায়ের সূচনা করবে। উন্মোচন করবে মুজিব-মূল্যায়নের বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ নতুন দৃষ্টিকোণ। একই সঙ্গে একাডেমিক গবেষণার ধারাবাহিক পদ্ধতিতে শেখ মুজিব ও তাঁর শাসনকালকে, যাকে আমরা সাধারণভাবে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ নামে চিহ্নিত করতে পারি, সেটাকে নিরীক্ষণের ভারসাম্যপূর্ণ উদ্যোগের উদ্বোধনও ঘটাবে বলে আশা করা যায়। কেননা, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালসমূহের প্রাজ্ঞ-পণ্ডিত, দল-নিরপেক্ষ গবেষকবৃন্দ এই প্রথমবারের মতো সামগ্রিক মুজিব ও তাঁর শাসনকালের নানা প্রসঙ্গ ও প্রপঞ্চকে মূল্যায়নের ব্যাপক লক্ষ্যকে সামনে রেখে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবের জীবন, কর্ম ও রাজনীতির এক-একটি পর্যায়কে স্বতন্ত্র ও স্বাধীনভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। ফলে অন্ধ-স্তাবকতা কিংবা অজ্ঞান-বিরোধিতার ক্ষুদ্র, স্বার্থান্বেষী বা সংকীর্ণ উদ্দেশ্য না থাকায় তথ্য-উপাত্তভিত্তিক অনুসন্ধানে শেখ মুজিবের উত্থান-পতন এবং তাঁর সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনের সফলতা-ব্যর্থতা সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত নৈর্ব্যক্তিক ও প্রকৃত কার্যকারণসমূহ উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমান বাংলাদেশে গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দায়িত্বশীলতা, বিচার ও প্রশাসন বিভাগের নিরপেক্ষতা, ক্ষমতার পৃথকীকরণ ও ভারসাম্যসহ সুশাসনের সকল অনুসঙ্গের শক্তিবর্ধন একটি অবশ্যম্ভাবী কর্তব্যকর্ম বলে সকল মহলের কাছেই বিবেচিত হচ্ছে। পাশাপাশি, চলমান একবিংশ শতাব্দীর বিশ্বায়নের যুগে আর্থ-রাজনৈতিক, চিন্তা, দর্শন ও তৎপরতা জগতে আসছে নানা পালাবদল---যার জন্যে বাংলাদেশকে প্রস্তুত হতে হবে অতীতের প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়নের মাধ্যমে অর্জিত-আহরিত অভিজ্ঞতালব্ধ প্রজ্ঞার দীপ্তিতে; জ্ঞানের আলোকে । বর্তমান গ্রন্থ এক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়।

ভূমিকা ছাড়া গ্রন্থে আলাদা আলাদা ১০টি প্রবন্ধে শেখ মুজিবের জীবন ও রাজনীতির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও প্রসঙ্গ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে গভীরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে।

গ্রন্থের প্রথম প্রবন্ধে ড. এম. নজরুল ইসলাম "শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্থান" পর্যালোচনা প্রসঙ্গে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান এবং মুজিব নেতৃত্বের বিকাশের ঐতিহাসিক-ধারাবাহিকতাকে মূল্যায়ন করেছেন। লেখকের বিবেচনায়: "একজন মানুষ হিসেবে শেখ মুজিবের মধ্যে ছিল দুর্বলতা, ছিল স্ববিরোধিতা।...কারাবন্দী অবস্থায় পাকিস্তানী সামরিক জান্তার হাতে নিহত হলে তিনি বাঙালি জনমনে অমর হয়ে থাকতেন...কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের ছকে বাঁধা রাজনীতির অনুসরণে ব্যাপক জনপ্রিয়তার মোহ শেখ মুজিব এড়াতে পারেননি এবং রাষ্ট্রশাসনের কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তিনি প্রকারান্তরে নিজের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছিলেন।" শেখ মুজিবের জীবন ও রাজনীতির মূলধারাকে অনুধাবনের লক্ষ্যে এ প্রবন্ধের মৌলিক তথ্য ও বিশ্লেষণ একটি নতুন বীক্ষণ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

"আমলাতন্ত্রের সংস্কার প্রসঙ্গে শেখ মুজিব" শিরোনামের গ্রন্থের দ্বিতীয় প্রবন্ধে ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমলাতন্ত্রের সংস্কার প্রচেষ্টা, দ্বন্দ্ব-সংঘাত-দলাদলি ইত্যাদি আলোচনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক তথ্য ও ঘটনাপ্রবাহের সমাবেশ ঘটিয়েছেন---যার মাধ্যমে আমলাতন্ত্র প্রসঙ্গে মুজিব নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের অবস্থান ও অঙ্গীকার অনুধাবন করা যায়। আমলাতন্ত্রের সংস্কার প্রসঙ্গে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ এবং এর সাফল্য-ব্যর্থতার অন্তর্নিহিত কার্যকারণ বিশ্লেষণে প্রবন্ধটি বিস্তারিত আলোকপাত করেছে। সমগ্র পরিস্থিতির মূল্যায়নের পর প্রবন্ধের উপসংহারে বলা হয়েছে যে, "আমলাতন্ত্রের সংস্কার প্রসঙ্গে নেয়া রিপোর্ট ও পদক্ষেপ বাস্তবায়িত হলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্ট এবং পাকিস্তানী আমলে লালিত জনবিচ্ছিন্নতার উন্নাসিক ভাবধারাপুষ্ট আমলাতন্ত্রে এক মৌলিক ও যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুকূলে আমলাতন্ত্রের কাঠামো ও কার্যক্রম বিন্যস্ত হতে পারতো।" সন্দেহ নেই, এ গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বাংলাদেশের জনপ্রশাসনের সংস্কার ও উন্নয়নে বস্তুনিষ্ঠভাবে সাহায্য করবে।

গ্রন্থের তৃতীয় প্রবন্ধের শিরোনাম "শাসনতান্ত্রিক কার্যক্রম: প্রসঙ্গ মুজিব শাসনামল।" প্রবন্ধকার ড. দিলারা চৌধুরী সংসদীয় রাজনীতিক কার্যক্রম ও এর সাফল্য-ব্যর্থতা অনুসন্ধান করেছেন। গবেষকের বিশ্লেষণে: "সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্যে দীর্ঘ বছর রক্তাক্ত সংগ্রাম ও আন্দোলনের অতীত ইতিহাস থাকার পরেও এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা যে, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছিল। সফলভাবে কাজ করতে সমর্থ হলে আইন প্রণেতাগণ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিক গতিধারায় একটি সুদূরপ্রসারী ও ইতিবাচক অবদান রাখতে পারতেন।"

গ্রন্থের চতুর্থ প্রবন্ধে ড. মাহফুজ পারভেজ "মুজিব শাসনামলে সংসদীয় গণতন্ত্র" প্রসঙ্গে আলোচনাকালে এর সঙ্কটসমূহ এবং এর ফলে সামরিক শাসনের প্রেক্ষাপট প্রস্তুত হওয়ার বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণে: "বাংলাদেশে প্রথমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হলেও পরে একদলীয় ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠা পায়। তারপরের ঘটনা আরো নির্মম। নামে বা ছদ্মনামে যে গণতন্ত্র উপহার দেয়া হয়, তা তত্ত্বে এবং বাস্তবতায় ছিল সামরিক

শাসন, আধা-সামরিক শাসন কিংবা সামরিক-বেসামরিকতন্ত্রের শাসন। ...শেখ মুজিবের জন্য এ ঐতিহাসিক নিয়তি অত্যন্ত দুরূহ যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে তাঁকেই এ গণতন্ত্রের কবর রচনাকারীর ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল।" কিন্তু এ ব্যর্থতার জন্যে একমাত্র শেখ মুজিবই কী দায়ী ছিলেন? সম্ভবতঃ নয়। স্বাধীনতা-পরবর্তী বাস্তবতায় সংশ্লিষ্ট কার্যকারণসমূহকে অনুসন্ধান করা হয়েছে এ প্রবন্ধে।

গ্রন্থের পঞ্চম প্রবন্ধে ড. মোহাম্মদ সোলায়মান "মুজিব আমলের বাংলাদেশ ও বৃহৎ শক্তি" বিষয়ক আলোচনায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির তৎকালীন প্রবণতাসমূহ উপস্থাপন করে বাংলাদেশের সূচনাকালীন পররাষ্ট্রনীতি বিনির্মাণের প্রসঙ্গ পর্যালোচনা করেছেন। লেখকের মূল্যায়নেঃ "শেখ মুজিব জোট নিরপেক্ষতার আদর্শে বৈদেশিক নীতির মূলভিত্তি রচনা করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দ্বি পাক্ষিক নীতি গ্রহণ ছিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ কৌশল। বিশ্ব শক্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভৌগলিক আবশ্যকতা, আর্থ-সামাজিক অগ্রাধিকার ও আভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।" এ প্রবন্ধ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নানা বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৎকালীন সময়ের বৃহৎ শক্তিবর্গের রাজনীতিকেও পর্যালোচনা করেছে।

গ্রন্থের ষষ্ঠ প্রবন্ধে "শেখ মুজিবের একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা" নিয়ে আলোকপাত কালে ড. তারেক শামসুর রেহমান স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে অধুনালুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজনীতি এবং প্রভাব বিস্তারের ধারাটিকে চিহ্নিত করেছেন। লেখকের বিশ্লেষণেঃ "উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয়তাবাদী নেতারা এ ধরনের একদলীয় ব্যবস্থা চালু করেছিলেন অতীতে (ঘানা, জাম্বিয়া, তানজানিয়া)। তারা সবাই যে সোভিয়েত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদলীয় ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, তেমন নয়। তবে স্পষ্টতই বাংলাদেশে বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাত ছিল। তারা মুজিবের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তবে বাকশাল ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য করা যায় না। কেননা এই ব্যবস্থা পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। শেখ মুজিবের মৃত্যু সব প্রশ্নের কবর রচনা করলো ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট।"

গ্রন্থের সপ্তম প্রবন্ধে ড. জোহোরা খানম "মুজিব শাসনামলে বিরোধী দলঃ সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা" শীর্ষক শিরোনামে বিদ্যমান দলব্যবস্থার মেরুকরণ, আদর্শিক ও রাজনৈতিক অবস্থান এবং সীমাবদ্ধতাকে অনুসন্ধান করে এ মন্তব্য করেছেনঃ "দলগত বিভক্তির কারণে বেশির ভাগ নিয়মতান্ত্রিক ও গুপ্ত সাম্যবাদী দলগুলোর ফিনিক্স পাখির মতই জন্ম এবং এই দলগুলো প্রধানতঃ রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে দলাদলি প্রবণ গোষ্ঠী হিসাবেই থেকে যায়। সুতরাং শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শাসনামলে বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিকাশ ছিল বস্তুতঃ কতগুলো সংগঠিত দুর্বল দলের একত্রিভবন, যা অবস্থাদৃষ্টে আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, এ দলগুলো ব্যক্তি কেন্দ্রিক দল ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না।" স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের দলব্যবস্থা সম্পর্কে এ প্রবন্ধে বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে।

গ্রন্থের অষ্টম প্রবন্ধে ড. হাসান মোহাম্মদ "সাফল্য-ব্যর্থতার নিরিখে মুজিব নেতৃত্ব" আলোচনাকালে নেতৃত্বের তাত্ত্বিক দিকসমূহের আলোকে মুজিব নেতৃত্বের অর্জন ও স্খলনসমূহ পর্যালোচনা করে মুজিবের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়ন করে লিখেছেনঃ "নেতৃত্বের সাফল্য

ও ব্যর্থতা পরিমাপ করলে দেখা যায় যে, মুজিবের সাফল্যের ক্ষেত্রে কাজ করেছে ব্যক্তিগত ভূমিকা ও পরিবেশের সুবিধাজনক প্রভাব; ব্যর্থতার জন্যও ক্রিয়াশালী ছিল ব্যক্তিগত ও অবস্থানগত প্রভাব। যে প্রভাবের প্রতিক্রিয়া সব সময় উত্তরণ করা যায় না। তবে, নেতৃত্বের সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ধারণে অবস্থা বা পরিবেশের প্রভাব বিবেচনায় আনা হলেও একমাত্র পরিবেশকেই কৃতিত্ব প্রদান করা হয় না। পরিবেশের আনুকূল্য বা বৈরীতা থাকবেই। সেটা জয় করে কতটুকু সাফল্য অর্জন বা ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হতে হয়েছে- একজন নেতার মূল্যায়নে সেটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। এই বিবেচনায় শেখ মুজিব স্বকীয় সাফল্যে উজ্জ্বল, ব্যর্থতায় ম্লান একজন অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব: বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক অন্তহীন চেতনা প্রবাহ।" বাংলাদেশের সামগ্রিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের একটি মানদণ্ড এ প্রবন্ধের মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যাবে।

গ্রন্থের নবম প্রবন্ধে ড. ইউ.এ.বি. রাজিয়া আখতার বানু "মুজিব শাসনের পতন: একটি বিশ্লেষণ" শিরোনামে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে গঠিত প্রথম সরকার ব্যবস্থাটির অকাল ও অনাকাঙ্খিত পতনের নানা কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। সুদীর্ঘ এ প্রবন্ধে মুজিবের পতনকে মূল্যায়ন করতে গিয়ে তাঁর সামগ্রিক শাসনামলের একটি চমৎকার পর্যালোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। উপসংহারে লেখক এ তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত দিয়েছেন যে: "তবুও শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ সম্ভবতঃ প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশিই সম্পাদন করেছে। এ কৃতিত্ব শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের যে, তারা অত্যাচারী নিপীড়ক শাসকের হাত থেকে মুক্তি ছিনিয়ে এনে বাংলাদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ক্ষমতা আরোহণের অল্প পরে শেখ মুজিব নিজেই নিজের সমাধি গাঁথা রচনা করেছিলেন সাংবাদিকদের কাছে এই উক্তির মাধ্যমে: সম্ভবতঃ এ জাতির স্বাধীনতার জন্য একজন নেতৃত্ব দেবে আর একজন জাতির ভবিষ্যত বিনির্মাণ করবে।"

মুহাম্মদ জহিরুল আলম ও শরীফ মামুনুর রহমান হামীদ লিখিত "বাংলাদেশের রাজনীতি ও শেখ মুজিবের জীবনপঞ্জী" শীর্ষক গ্রন্থের দশম প্রবন্ধের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণে বাংলাদেশের রাজনীতির ধারাবাহিকতায় শেখ মুজিবের জীবনের ক্রমধারা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যা ঐতিহাসিক নানা তথ্যের যোগান দেবে।

বস্তুতঃ অন্ধ প্রশংসা কিংবা বিরাগপূর্ণ বিরোধিতার কবলে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা পরবর্তীকালের বাংলাদেশে তাঁর শাসনামল সম্পর্কে এ গ্রন্থের আবেগবর্জিত পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ অতীতের সঠিক ইতিহাস আর ভবিষ্যতের কঠিন বাস্তবতা অনুধাবনে সাহায্য করবে। অবসান ঘটাবে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, ইতিহাস ও ঘটনা পরম্পরা সম্পর্কে বিভ্রান্তির ঘোরতর ধুম্রজাল। প্রজন্ম থেকে প্রজন্মব্যাপী বহমান এ জনপদের লড়াকু মানবমণ্ডলীর সংগ্রাম ও বিজয়কে দৃঢ়তর করার জন্যে রাজনীতিসহ সকল বিষয়েরই সঠিক সত্যানুসন্ধান অত্যন্ত জরুরী; যা দুঃখজনকভাবে স্বাধীন বাংলাদেশে আজও অনুপস্থিত। ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের স্বার্থে আমাদেরকে ইতিহাস, জীবন ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে- সকল পর্যায়ে- বিরাজমান কল্পকথা, জোড়াতালি, বাগাড়ম্বরের কুয়াশা সরিয়ে দাঁড়াতে হবে কঠিন অথচ বাস্তব কেন্দ্রীয় সত্যের মুখোমুখি। একজন মানুষ, একটি ঘটনা বা কোনো বিষয়কে, যার ঐতিহাসিক তুল্য-মূল্য রয়েছে; শত-সহস্র বছর পরে হলেও দাঁড়াতে হয় ইতিহাসের সেই কেন্দ্রীয় সত্যের সামনে। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ

এবং শেখ মুজিবও এর ব্যতিক্রম নন। বিশেষ করে, মুজিবকে নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা-মূল্যায়ন-বিশ্লেষণ চলতে থাকবে আরো বহু বছর। কারণ তিনি ব্যক্তিক বা দলীয় হয়েও জাতির অপরিহার্য সম্পদে পরিণত হয়েছেন। মৃত্যুই তাঁর অবসান নয়। বরং এ জাতিসত্তার বিজয় ও পরাজয়ে, গৌরব ও পতনে, আনন্দ ও বিষাদে শেখ মুজিবের হিরন্ময় অবদান উচ্চারিত হতে থাকবে সাফল্য-ব্যর্থতার যুথবদ্ধ কথামালায়। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ইতিহাস অধ্যয়নের স্বার্থেই তাঁর স্মরণীয় সাফল্য অনুধাবন এবং ব্যর্থতার কারণসমূহ যথোপযুক্ত ও নৈর্ব্যক্তিকভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

একবিংশ শতাব্দীর ক্রম-অগ্রসরমান সময় থেকে শেখ মুজিবের শাসনামলে ফিরে যাবার আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই আজ আর কেউ পোষণ করবেন না; প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সূত্রও সে ইচ্ছাকে সমর্থন করবে না। বরং যে সকল কারণ শেখ মুজিব ও তাঁর শাসনকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছিল, সেগুলো অনুধাবন করে সতর্কতার সঙ্গে উত্তরণ করা গেলেই এ নেতার স্বপ্ন ও আদর্শের সঠিক বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে এ জাতিসত্তা যে সুখী-সুন্দর-সমৃদ্ধ গণতান্ত্রিক জীবনের দাবিতে সংগ্রাম করেছিল; সে সংগ্রামের আপাতঃ ব্যর্থতার পর্যায়কে অতিক্রমণের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমেই গণতান্ত্রিক আদর্শে উজ্জ্বল বাংলাদেশ গড়ে উঠছে এবং গণতন্ত্রের বিদ্যমান নানা সঙ্কট ও সমস্যাকে প্রতিনিয়ত অতিক্রমণের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক আদর্শে উজ্জ্বল বাংলাদেশ গড়ে উঠবেই। জনতার আবহমানকালের এবং সর্বসাম্প্রতিক সময়ের সংগ্রাম ('৯০) এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি, সমঝোতা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে আন্দোলন বস্তুতপক্ষে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র বিনির্মাণের অনিবার্য সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এবং বর্তমান ও অনাগতকালের প্রজন্মের জন্য জ্বলন্ত শিক্ষা হয়ে রয়েছে।

শেখ মুজিবের বা অন্য কোনো রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি কোনো প্রকার সম্পর্ক না থাকার পরেও এ গ্রন্থ সম্পাদনার পেছনে বেশ কিছু কারণ উল্লেখযোগ্য। কারণগুলোর মধ্যে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ এবং শেখ মুজিব সংক্রান্ত গবেষণার অপর্যাপ্ত ও অপূর্ণাঙ্গ উদ্যোগের প্রেক্ষাপটে একটি সমন্বিত-সামগ্রিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করার আগ্রহ অন্যতম। এ আগ্রহ আমি শৈশব-কৈশোরের বয়ঃসন্ধিতে অর্জন করেছিলাম শেখ মুজিবের সরাসরি সংস্পর্শে এসে। বিরোধী দলীয় নেতা বা সরকার প্রধান হিসেবে শেখ মুজিব আমাদের শহর কিশোরগঞ্জে এলে আমার আব্বার (তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা, বর্তমানে রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছেন) সঙ্গে খুব স্বাভাবিক কারণেই যোগাযোগ হত। এর মধ্যে শেখ মুজিব আমাদের বাড়িতেই বেশ কয়েকবার উঠেছিলেন। সেই শৈশবে আমি দেখেছিলাম শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করে কিভাবে জন-মানুষের সমুদ্র তৈরি হয়। এমনকি ১৯৭১ সালের বর্বর হানাদার বাহিনীর আক্রমণে আমাদের পরিবার যখন উপদ্রুত হয়ে বাস্তুচ্যুৎ হয়, তখনও আমার বুক পকেটে ভাঁজ করা ছিল শেখ মুজিবের পোস্টার। সে এক রোমাঞ্চকর আবেগ ও উত্তেজনা। কিন্তু পরবর্তীতে আমি বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, শেখ মুজিবের জনসমর্থন অতি দ্রুত জনবিরোধিতার পর্যায়ে চলে যাচ্ছে। সে সময় অবাক হওয়া ছাড়া জনমতের গতি-প্রকৃতিকে অনুধাবন করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আরো পরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নকালে রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে শেখ মুজিবের নেতৃত্ব ও শাসনকালের সাফল্য-ব্যর্থতা সম্পর্কে আমার পুরনো আগ্রহ মিটানোর সুযোগ আসে। শেখ মুজিবকে অধ্যয়ন করতে গিয়ে আমাকে সত্যিকার অর্থেই বিভ্রান্ত হতে হয়।

মুজিব সংক্রান্ত প্রায় সকল রচনাই ছিল অনুরাগের আতিশয্যে সিক্ত কিংবা বিরাগের তীব্রতায় বিচূর্ণ; অবশ্য হাতে-গোনা খুব সামান্য ব্যতিক্রমও ছিল, যেসব গ্রন্থে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষভাবে মুজিব-মূল্যায়ন উপস্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু সেসব বিরলপ্রজ গ্রন্থ সাধারণ পাঠক ও ছাত্রদের নাগালের বাইরেই থেকে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদানের পর পরই এ গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী সমগ্র কর্ম সম্পাদনে আমার একক প্রচেষ্টা গ্রহণ ছিল বিপুল সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। সে কারণে আমি 'বাংলাদেশ রাজনীতি ও শেখ মুজিব বিশেষজ্ঞ' গবেষকদের সঙ্গে যোগাযোগ করি এবং গবেষকরা যে যে বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, সে বিষয়টি নিয়ে লিখতে সম্মত হন এবং কোনোরূপ প্রভাবে প্রভাবিত না হয়ে উদারভাবে গবেষণালব্ধ মতামত প্রকাশ করেন। সকল প্রবন্ধের মতামতই লেখকদের নিজস্ব। সম্পাদক হিসেবে আমাকে মূলতঃ সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করতে হয়েছে। তাই, এ গ্রন্থের সকল সাফল্য লেখকদেরই সাফল্য, এ কথা বলা বাহুল্য। আর ব্যর্থতার দায়ভার যথারীতি একান্তভাবেই আমার।

গ্রন্থভুক্ত প্রবন্ধের বেশ কিছু দেশী-বিদেশী গবেষণা জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। লেখকগণ সেগুলো প্রকাশের অনুমতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে সংশোধন-পরিমার্জন করে দিয়ে সমগ্র কাজটিকে সহজসাধ্য করে দিয়েছেন। কিছু অনুবাদ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ড. মাহবুবুল হক, প্রতিশ্রুতিশীল সাংবাদিক আমিনুল এহসান সালেহ, ইংরেজি বিভাগের সহকর্মী জি.এইচ. হাবীব খোকন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতকোত্তর-ব্রাহ্মণবাড়িয়া পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের গবেষক ও শিক্ষক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) মুহাম্মদ জহিরুল আলম, পরিশ্রমী অবদান রেখেছেন। অনুজ মাসুদ জিয়াউল হক, অনুজ প্রতীম খালিদ, সৌরভ, শামীম, বায়েজীদ, শাকের, লিপো, কিরণ নানাভাবে কাজ করেছে। রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের বেশ ক'জন শিক্ষার্থী, বিশেষ করে, মাহবুব ও নাজমুল প্রকাশনার বিভিন্ন পর্যায়ে সঙ্গে থেকেছে। প্রকাশক সহযোগী মাজহারুন-নূর ফাউন্ডেশন ও রেক্স পাবলিকেশন্স এ গ্রন্থ প্রকাশকে সম্ভব করেছেন। সংশ্লিষ্ট সবাইকে ধন্যবাদ।

চট্টগ্রামের পেশাজীবনে এ গ্রন্থ সম্পাদনার কাজে ব্যস্ত থাকাকালে এখানে আমার বড় ভগ্নিপতি বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি)-এর জিএম (একাউন্স) জনাব সহিদ উদ্দিন আহমেদ পরলোক গমন করেন। পারিবারিক বিপর্যয়ের পরেও রুবী আপা ও স্নেহের ভাগ্নি রুম্পা আমার লেখালেখির কাজে অফুরন্ত সাহায্য ও উৎসাহ দিয়ে গেছে। অথচ তাদের প্রতি আমার দায়িত্ব আমি যথাযথভাবে পালন করতে পারিনি। প্রসঙ্গতঃ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের মরহুম প্রফেসর ড. এম. আজিজুল হক এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগের সাবেক সভাপতি মরহুম আলহাজ প্রফেসর ড. মো. সানাউল্লাহ'র কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়, যাঁরা এ গ্রন্থের কাজে নানা পরামর্শ ও উৎসাহ যুগিয়েছিলেন। তাঁরা কেউই এ গ্রন্থ দেখে যেতে পারেনি। আল্লাহ তাঁদের সকলের বিদেহী আত্মার চিরশান্তি ও কল্যাণ দান করুন। আমীন।

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্থান

ড. এম. নজরুল ইসলাম

শেখ মুজিবের আবির্ভাব বাংলাদেশের জাতীয় ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটি অনন্য সাধারণ ঘটনা। তাঁর মৃত্যুতেই তিনি নিঃশেষিত নন। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তিনি বিরাজ করবেন কিংবদন্তীর মতোই। বাঙালিদের ইতিহাসে হয়তো আরও প্রজ্ঞাবান, দক্ষতর, সুযোগ্য ও গতিশীল নেতা থাকতে পারেন; কিন্তু রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন এবং জাতিসত্তা নির্মাণে আর কারও অবদান শেখ মুজিবের মত এত বেশি নয়। মুজিব কেবল বাঙালিদের স্বার্থের সাথেই নয়, তাদের স্বপ্নের সাথেও নিজেকে একাত্ম করেছিলেন। তিনি ছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের মূর্ত প্রতীক, যা আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌম পরিচিতি আন্দোলনের সোপান রচনা করে দিয়েছিল।... বাংলাদেশ নামে যে একটি রাষ্ট্র রয়েছে তা' মুজিবের জন্যে আমাদের যুগের কিংবদন্তীর মর্যাদার পর্যাপ্ত সাক্ষ্য বহন করছে।[১] বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতিবিদ শেখ মুজিবর রহমানের[২] ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সাংগঠনিক শক্তি সত্যিকার অর্থেই বাঙালি জাতিকে পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে অধিকার প্রতিষ্ঠায় তাদের দীপ্ত শপথে বলীয়ান করে তুলেছিল। দলীয় ব্যক্তিত্ব থেকে তিনি পরিণত হয়েছিলেন জাতীয় ব্যক্তিত্বে; তিনি এককভাবে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের সাথে। যে ব্যক্তি চব্বিশ বছরের পাকিস্তানী আমলে নয়বার কারারুদ্ধ হয়েছেন, জড়িত হয়েছেন এগারটি ফৌজদারী মামলায়, দু'বার ফাঁসির মঞ্চ থেকে ফিরে এসেছেন, জীবনের শেষ অধ্যায়ে এসে রাজনৈতিকভাবে হয়েছেন বহুল বিতর্কিত, সে ব্যক্তি আমাদের জাতীয় ইতিহাসে একজন মহান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে বিবেচিত হবেন–এটাই স্বাভাবিক। শেখ মুজিবের রাজনীতিতে আবির্ভাব হঠাৎ করে হয়নি; দশ এগার বছর বয়স থেকেই তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। জীবনের শুরু থেকেই তাঁর

মধ্যে গড়ে গঠে ওঠে নেতৃত্বসুলভ মনোভাব। রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবে তিনি সর্বদাই বেছে নিয়েছেন শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রেখে সম্পূর্ণভাবে আইনসম্মত উপায়ে আন্দোলন চালিয়ে যাবার পথ। হত্যা ও অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মতা দখলের নীতিও তিনি কখনো সমর্থন করেননি। বহু ত্যাগ-তিতিক্ষা, সাধনা এবং নানা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার মধ্য দিয়েই যে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের এ বিশাল প্লাটফর্মটি গড়ে উঠেছিল সেটাই মূলতঃ পর্যালোচনা করা হবে।

৩.১ রাজনীতিতে শেখ মুজিবের আবির্ভাব

মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা জীবন শেষে শেখ মুজিব যখন কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজে ভর্তি হন, মূলতঃ তখন থেকেই তিনি তৎকালীন রাজনীতি ও রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। এই সময়েই তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সংস্পর্শে আসেন এবং মুসলিম লীগে যোগদান করেন। শেখ মুজিবর রহমান ১৯৪৩ সালে নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।[৩] ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুর উপর সারা দেশে অনুষ্ঠিত হয় একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন। নির্বাচনে তাঁর নিজের জেলা ফরিদপুরের (বর্তমান গোপালগঞ্জ) পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর উপর পড়লেও তিনি খুলনা, বরিশাল এবং যশোরসহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক প্রচারণা চালান। নির্বাচনী ফলাফল পক্ষে আসায় বাংলায় মুসলিম লীগ প্রাদেশিক সরকার গঠনে সমর্থ হয়েছিল এবং এর ফলেই এই অঞ্চল প্রস্তাবিত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে শুধু বৃহত্তর রাজনৈতিক লাভই নয়; এই নির্বাচনী সফরে নেমে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও বেশ সাফল্য অর্জিত হয়েছিল– যা' তার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনের উত্তরণে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল।[৪]

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান সৃষ্টির পর পরই নীতি ও আদর্শের সাথে খাপ-খাওয়াতে না পেরে শেখ মুজিব মুসলিম লীগের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন।[৫] ১৯৪৮–এর মার্চ মাস থেকে ১৯৪৯-এর জুলাই মাস পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত কর্মব্যস্ত জীবন অতিবাহিত করেন এবং তখনই তিনি তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজের পরিচিত আরো বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হন। এই সময়টাতেই তিনি পুরোপুরি বিরোধী রাজনীতির ধরন আয়ত্ত করেন এবং বৃহত্তম রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে তোলেন। মুসলিম লীগের সাথে আদর্শগত মত বিরোধের কারণে মাওলানা ভাসানী মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করেন এবং শেখ মুজিবসহ আরো কতিপয় বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতার সহযোগিতায় ১৯৪৮ সালে গঠন করেন 'আওয়ামী মুসলিম লীগ'।[৬] প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মুসলিম লীগ ছিল একটি উগ্র সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল। কিন্তু মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে এসে যখন মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' গঠিত হলো তখনও দলটি পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হতে পারলো না। এতে ভাসানীর সাথে মুজিবের দেখা দেয় আদর্শগত দ্বন্দ্ব। মাওলানা ভাসানীর সাথে মুজিবের দ্বন্দ্ব বাঁধল মূলতঃ দলের নামে 'মুসলিম' শব্দটি থাকাতে। মুজিবের যুক্তি ছিল এ দ্বারা একটি সাম্প্রদায়িক দল বুঝায় এবং এখানে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বী কর্মীর প্রবেশাধিকার নেই। তাঁর মতে, দলকে ধর্মনিরপেক্ষ ও সার্বজনীন করার জন্য দলের নাম

থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া প্রয়োজন। কিন্তু মাওলানা ভাসানী এতে রাজী না হওয়ায় শেখ মুজিব তাঁর সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে গঠন করেন 'আওয়ামী লীগ'।[৭]

পাকিস্তান সৃষ্টির বেশ কিছুদিন পর যখন মুজিব ঢাকায় এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন তখনই তাঁর সক্রিয় সহযোগিতায় ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ' প্রতিষ্ঠার পর পরই প্রভাবশালী ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সক্রিয় ও কার্যকরভাবে রুখে দাঁড়ানোর জন্য তিনি গঠন করেন 'মুসলিম ছাত্র লীগ'।[৮]

৩.২ রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ– '৫২ থেকে '৬৫

১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেননি জেলে ছিলেন বলে। কিন্তু তিনি জেলে বসেও এ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন। তিনি এবং মাওলানা ভাসানী জেলে থেকেই ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট পালন করেন।[৯] পাকিস্তানের অবহেলিত প্রদেশ পূর্ববাংলায় মুসলিম লীগকে '৫৪ সালের নির্বাচনে পরাজিত করার উদ্দেশে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি মাওলানা ভাসানী এবং কৃষক-শ্রমিক পার্টির সভাপতি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন (৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩)। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী ছিলেন এর তৃতীয় নেতা। এদিকে গণতন্ত্রী দল, নেজামে ইসলাম পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি এবং খেলাফতে রাব্বানী পার্টি এতে যোগদান করেছিল। হক-ভাসানী-সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বাধীন এই যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি হিসেবেই ঘোষিত হয়েছিল ২১ দফা।[১০] ক্ষমতা কুক্ষীগত রাখতে ব্যস্ত মুসলিম লীগের দুর্নীতি ও দুঃশাসন এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকার বঞ্চিত পূর্ববাংলার প্রতি শোষণ, বৈষম্য আর নির্যাতনের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত ২১ দফা এত অভাবনীয় জনসমর্থন পেয়েছিল যে, তা' নির্বাচনী ফলাফলের মধ্য দিয়েই বোঝা যায়।[১১] ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট আন্দোলনের সময় থেকেই মূলতঃ শেখ মুজিবর রহমান, শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মাওলানা ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দী এবং আতাউর রহমান খানের সাথে জাতীয় রাজনীতির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে পূর্ববাংলা আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। সেই বছরই তিনি পূর্ববাংলায় এ. কে. ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের সমবায় ও কৃষিঋণ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রি হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'ফজলুল হক মন্ত্রিসভা' বরখাস্ত করা হয় এবং পূর্ববাংলায় কেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শাসন জারি করা হয়।[১২] এরপর ১৯৫৬ সালে পূর্ববাংলায় আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসে এবং শেখ মুজিব এই সরকারের শিল্প-বাণিজ্য ও দুর্নীতি দপ্তরের মন্ত্রি হিসেবে যোগদান করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের ষড়যন্ত্রের কারণেই হোক কিংবা যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই হোক, তিনি অবশ্য পরে অর্থাৎ মাত্র সাত মাস পরেই মন্ত্রিসভা থেকে ইস্তফা দেন। এরপর তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে পূর্ব-পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের সংগঠন গড়ে তুলতে নিজেকে নিয়োজিত করেন।

যুক্তফ্রন্টের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং মুজিবের বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে অভাবিতভাবে আওয়ামী লীগের শক্তি বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে তৎকালীন পূর্ববাংলায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৫৫ সালে শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ হতে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণ-পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনি গণ-পরিষদে 'পূর্ববাংলা'-এর স্থলে 'পূর্ব-পাকিস্তান' নামকরণের বিরোধিতা করে 'বাংলা' (পাকিস্তান) রাখার দাবি জানান।[১৩] তিনি বলেন, 'বাংলার এক ইতিহাস ও ঐতিহ্য রয়েছে এবং বাংলার নাম পরিবর্তন করতে হলে বাংলার জনগণের মতামতের ভিত্তিতেই তা করতে হবে।'

গণ-পরিষদে শেখ মুজিবর রহমান পূর্ববাংলার মানুষের প্রতি পাঞ্জাবি শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় ও অত্যাচারের কথা তুলে ধরেন এবং পূর্ববাংলার জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবি করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে দুর্বল করার জন্য নয় বরং শক্তিশালী করার জন্যই স্বায়ত্তশাসন দাবি করা হচ্ছে। তিনি গণ-পরিষদের বিতর্কে অংশগ্রহণ করে পাকিস্তানের ১৯৫৬ সালের খসড়া সংবিধানের বিরোধিতা করেন।[১৪] তিনি এ সংবিধানকে 'অগণতান্ত্রিক ও স্বৈরতান্ত্রিক' হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানের জনগণ বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কখনও এই সংবিধান মেনে নিবে না। তিনি যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে সংবিধান প্রণয়নের দাবি জানান। শেখ মুজিব যুক্ত নির্বাচকমণ্ডলীর নীতির ভিত্তিতে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান গ্রহণেরও দাবি জানান।[১৫]

৭ অক্টোবর ১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করে জেনারেল আয়ুব খান পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করেন। জেনারেল আয়ুব খানের সামরিক শাসন জারি হবার পর তৎকালীন পূর্ববাংলার জনমনে বিক্ষোভ ধুমায়িত হতে থাকে। শেখ মুজিবসহ যুক্তফ্রন্টের সকল নেতা সামরিক শাসক চক্রের সাথে কোন প্রকার আপোষ করতে সম্মত হননি। সামরিক শাসন প্রবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে শেখ মুজিব যে আশঙ্কা করেছিলেন তা-ই সত্যে পরিণত হয় মাত্র পাঁচদিনের মধ্যে। তাঁকে কারাগারে বন্দি করা হয় এবং প্রায় দেড় বছর বন্দি দশায় থাকার পর ১৯৬০-এর জানুয়ারিতে তাঁকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তিদান করা হলেও প্রায় দু'বছর পর (১৯৬২) তাঁকে আবার জননিরাপত্তা আইনবলে আটক করা হয়। ইতোমধ্যে জেনারেল আয়ুব খান তাঁর ১৬টি আইন প্রণয়ন নীতি এবং ২১টি রাষ্ট্রীয় নীতি সম্বলিত সংবিধান ঘোষণা করেন।[১৬] এই সংবিধানে বলা হয় যে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট আশি হাজার নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক গঠিত 'ইলেকট্রোরাল কলেজ' (Electroral College) দ্বারা নির্বাচিত হবেন। সংবিধানের মূল শিরোনামে বলা হয় : ইসলাম বিরোধী কোনো আইন প্রবর্তন করা যাবে না এবং সকল নাগরিক বাক-স্বাধীনতা ও সাংগঠনিক স্বাধীনতা ভোগ করবে বটে, তবে তাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পাকিস্তানের নিরাপত্তা, শৃঙ্খলা, নৈতিকতা, শালীনতা, ন্যায়বিচারভিত্তিক শাসন এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কোনো প্রকারে বিঘ্নিত না হয়।[১৭]

স্বাভাবিক কারণেই আয়ুব প্রবর্তিত ১৯৬২ সালের এ সংবিধান শেখ মুজিবের কাছে গণতান্ত্রিক আদর্শের পরিপন্থী মনে হয়েছে। এ সংবিধান বাতিল করার দাবি এবং একটি উপযুক্ত সংবিধান প্রণয়নের জন্য জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে একটি বিশেষ পরিষদ গঠনের দাবি জানিয়ে পূর্ব-পাকিস্তানের যে নয়জন নেতা বিবৃতি দেন শেখ মুজিব ছিলেন তাঁদের অন্যতম।[১৮] আয়ুব খানের স্বৈরশাসনামলে সার্বজনীন ভোটাধিকার এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দাবিতে তিনি পূর্ববাংলার অন্যান্য নেতার সাথে একযোগে কাজ করেন। পাকিস্তানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য ১৯৬২ সালে 'জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট' (National Democratic Front-NDF) নামে আয়ুব বিরোধী যে ঐক্য জোট গঠন করা হয়, শেখ মুজিব ছিলেন এ জোটের অন্যতম নেতা। ১৯৬৩ সালে ফ্রন্টের নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুতে শেখ মুজিব কিছুটা ভেঙ্গে পড়েন। কিন্তু বিচলিত না হয়ে তিনি আওয়ামী লীগকে পুনরুজ্জীবিত ও পুনর্গঠিত করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সেই সময়েই কার্যতঃ দলের নেতৃত্ব নিজের হাতে তুলে নেন। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে শেখ মুজিব ১৯৬৪-৬৫ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে আয়ুব খানের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে প্রচার অভিযানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রাদেশিক শাখার অন্যতম প্রধান নেতা।

৩.৩ ঐতিহাসিক ৬-দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন

পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠী পূর্ববাংলার সামরিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যাপারে দেখিয়ে আসছিল চরম উদাসীনতা। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ববাংলা যেভাবে বঞ্চনা ও শোষণের শিকারে পরিণত হয়েছিল তার ফলে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এদেশের বুদ্ধিজীবী মহল। শেখ মুজিবও পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের চিত্র বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। 'সোনার বাংলা শ্মশান কেন?' –তিনি এ অভিযোগ রাখেন পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কাছে।[১৯]

এদিকে ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ববাংলার নিরাপত্তাহীনতা প্রকটভাবে ধরা পড়ে। ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর এ যুদ্ধ শুরু হয় এবং তা' ১৭ দিন চলে। যুদ্ধে পাকিস্তানের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কখনোই প্রকাশ করা হয়নি। যুদ্ধের অবসান ও দু'দেশের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষার উদ্দেশে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় দু'দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় একটি শান্তি চুক্তি। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত এই চুক্তিই হল 'তাসখন্দ চুক্তি'। এই চুক্তি বিরোধী সম্মেলন ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে শেখ মুজিবও আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। সম্মেলনে যোগদান করলেও তিনি এ চুক্তি বিরোধী কোনো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে রাজি হন নি। অতঃপর তিনি আলোচনা অসমাপ্ত রেখেই সম্মেলন ত্যাগ করেন।[২০]

শাসনতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনের জন্য শেখ মুজিবর রহমান এই সর্বদলীয় জাতীয় সম্মেলনেই পাকিস্তানের ভবিষ্যত সংবিধানের ভিত্তি তথা পূর্ববাংলার জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক

স্বায়ত্তশাসনের দাবি হিসেবে ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচি পেশ করেন। তবে সম্মেলনে এ কর্মসূচি গৃহীত হয় নি।[২১] শেখ মুজিব তাঁর ৬-দফা দাবির সমর্থনে বলেন : "পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য ক্রমাগত আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের সামগ্রিক অর্থনীতি আজ ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। এই ধ্বংসের হাত থেকে আঞ্চলিক অর্থনীতিকে বাঁচানোর জন্য আঞ্চলিক সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে কাজ করার এবং অর্থনীতি পরিচালনার ক্ষমতা দিয়ে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।"[২২]

বাস্তবিক অর্থেই ৬-দফা কর্মসূচি ঘোষিত হবার পর পূর্ববাংলার জনমনে স্বাধিকার অর্জনের আকাঙ্ক্ষা আরও প্রবল হয়ে ওঠে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ৬-দফার স্বপক্ষে ধীরে ধীরে জনমত সংগঠিত হতে থাকে এবং ব্যাপকভাবে এর প্রচার পেতে থাকে। ৬-দফা ভিত্তিক আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে আয়ুব সরকার শেখ মুজিব ও তাঁর দলের প্রতি কঠোর দমননীতি গ্রহণ করেন। কারারুদ্ধ করা হয় শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের প্রথম সারির প্রায় সকল নেতাকে। বাঙালিদের স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনকে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করার এবং শেখ মুজিবকে রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে চিরতরে সরিয়ে দেবার লক্ষ্যেই আয়ুব সরকার দেশদ্রোহিতার অভিযোগ এনে মুজিবকে প্রধান আসামী করে ১৯৬৭ সালে দায়ের করে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'।[২৩]

মামলায় শেখ মুজিব নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন : "আমি পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশে কখনো কিছু করিনি এবং পূর্ব-পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য স্থল, বিমান বা নৌবাহিনীর কোনো কর্মচারি অথবা অন্য কারো সাথে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র করিনি। আমি নির্দোষ এবং নিরাপরাধ। কথিত ষড়যন্ত্র সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না।... পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি দাবিয়ে রাখার জন্যই মূলতঃ এ মামলা। আমার উপর নির্যাতন চালানো এবং আমার দলকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্যই আমাকে এ ষড়যন্ত্রমূলক মামলায় জড়িত করা হয়েছে"।[২৪]

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার এবং তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সারা দেশ তখন বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। সরকারের নির্যাতন ও অত্যাচারের মোকাবিলা করার জন্যই এ সময় দেশের আটটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক দল Democratic Aetion Committee (DAC) নামে গঠন করে একটি রাজনৈতিক ঐক্যজোট। এদিকে জনতার আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণার জন্য ৪ জানুয়ারি ১৯৬৯ তারিখে 'সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' (All Party Students Committee of Action-SCA)-এর পক্ষ থেকে পেশ করা হয় ১১ দফা দাবি।[২৫] ১৯৬৮-৬৯ সালের ব্যাপক গণ অভ্যুত্থানের মুখে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অসমাপ্ত অবস্থায় আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করা হয় এবং শেখ মুজিব ও অন্যান্য আসামীকে মুক্তি দেয়া হয়। প্রকৃতপক্ষে এই মামলার ফলে বাঙালিদের ঐক্যচেতনা ও স্বাধিকারের দাবি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে; শেখ মুজিবর রহমান আবির্ভূত হন বাঙালিদের অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে।

মুক্তিলাভের পর ঢাকায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহ্‌রাওয়ার্দী উদ্যান) শেখ মুজিবর রহমানের সম্মানে এক বিশাল গণ-সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তাঁকে পূর্ববাংলার জনগণের পক্ষ থেকে ভূষিত করা হয় 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে।[২৬] লক্ষ লক্ষ মানুষের এই সম্বর্ধনা সভায় মুজিব ভাষণ দিতে গিয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে বলেন : "আমি সরকার পক্ষের সাথে প্রস্তাবিত রাজনৈতিক আলোচনায় অংশগ্রহণ করে দেশের উভয় অংশের পক্ষ থেকে দেশবাসীর অধিকারের দাবি উত্থাপন করবো এবং যদি উত্থাপিত দাবি গ্রাহ্য করা না হয় তবে সে বৈঠক থেকে আমি ফিরে এসে দাবি আদায়ের জন্য দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলবো... সংগ্রাম করে আমি আবার কারাগারে যাব। কিন্তু মানুষের প্রেম-ভালবাসার ডালি মাথায় নিয়ে দেশবাসীর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবো না।... কায়েমী স্বার্থবাদীদের শোষণ থেকে উভয় অংশের জনগণের মুক্তির একমাত্র পথ হলো আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও অর্থনৈতিক আজাদি। আমি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন চাই, প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সার্বভৌম পার্লামেন্ট চাই এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, চাকরি-বাকরি অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্ব পর্যায়ে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব চাই। আমি শ্রমিকদের ন্যায্য মর্যাদা চাই। কৃষকদের উৎপাদিত দ্রব্যের উপযুক্ত মূল্য চাই। সাংবাদিকদের সংবাদপত্রের স্বাধীনতা চাই। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তানের প্রচলিত সংবিধান বাতিল করা হবে নাকি, তা' সংশোধন করা হবে-ইহা পার্লামেন্টই নির্ধারণ করবে।[২৭]

১৯৬৮ সালের ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবর রহমান যোগ দেন এবং উক্ত বৈঠকে তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব এবং ৬-দফা এবং ১১ দফার ভিত্তিতে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা করে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠনের দাবি জানান।[২৮] এভাবেই পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতি ন্যায়বিচার করা সম্ভব হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান ৬-দফা ভিত্তিক আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি মেনে নিতে অস্বীকার করলে গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। গোলটেবিল বৈঠক হতে প্রত্যাবর্তন করে শেখ মুজিব বাঙালি জনগণকে তাদের ন্যায্য দাবি আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সারা পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি করে শাসনক্ষমতা সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের নিকট হস্তান্তর করেন। ক্ষমতায় আসার পর ইয়াহিয়া খান সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা ঘোষণা করেন এবং পাকিস্তানের ভবিষ্যত সংবিধান প্রণয়নের পদ্ধতি ও মূলভিত্তি নির্দেশ করে একটি 'আইনগত কাঠামো আদেশ' (Legal Framowork Order LFO) জারি করেন। শেখ মুজিব সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে জাতীয় পরিষদকে সার্বভৌম সংস্থায় পরিণত করার লক্ষ্যে এ আদেশ অবিলম্বে সংশোধনের জন্য প্রেসিডেন্টের নিকট আহ্বান জানান।[২৯] তিনি বলেন : "একমাত্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই দেশকে

একটি সংবিধান দিতে পারেন– যে সংবিধান জনগণের একত্রে বসবাসের ভিত্তি হিসেবে পরিগণিত হবে। এ কারণেই আমরা বারবার উল্লেখ করছি, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংবিধান রচনার ক্ষমতার উপর বাঁধা-নিষেধ আরোপ করা উচিত নয়।[৩০] নীতিগতভাবে আইনগত কাঠামোর বিরোধিতা করলেও শেষাবধি শেখ মুজিব ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন যে, আগামী নির্বাচনই হবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে বাংলার মানুষের অধিকার অর্জন করার সর্বশেষ সংগ্রাম। স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনের স্বার্থে ৬ দফা এবং ১১ দফা আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগের প্রতিটি প্রার্থীকে ভোট দিয়ে প্রতিটি আসনে জয়যুক্ত করার জন্য তিনি সবার প্রতি আহ্বান জানান।

৩.৪ সত্তর সালের নির্বাচন ও স্বাধীনতা আন্দোলন

১৯৭০ সালের জাতীয় পরিষদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।[৩১] জাতীয় পরিষদে নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আওয়ামী লীগের বিজয়কে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এক অশুভ পরিণতির লক্ষণ মনে করে। জাতীয় পরিষদে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আওয়ামী লীগের তথা শেখ মুজিবের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হোক, এটা পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তাসহ পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাম্য ছিল না। ভুট্টো ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবের সাথে আলোচনায় বসে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার ভাগ দাবি করেন; কিন্তু শেখ মুজিব ভুট্টোর সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে নিতে অস্বীকার করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যদিও ঘোষণা করেছিলেন যে সাধারণ নির্বাচনের পর ৩ মার্চ (১৯৭১) জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হবে, কিন্তু ইয়াহিয়ার অনীহার কারণেই হোক কিংবা সামরিক জান্তা ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর ক্ষমতা লিপ্সা ও গোপন ষড়যন্ত্রের কারণেই হোক, ইয়াহিয়া খান অকস্মাৎ এক বেতার ভাষণের মাধ্যমে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন।[৩২] এই ঘোষণার পর পরই পূর্ববাংলার সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ শুরু হয়। শেখ মুজিবর রহমান জনগণের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস–অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য আহ্বান জানান।[৩৩] ৭ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভায় তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন : "...আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়–তারা বাঁচতে চায়। তারা অধিকার পেতে চায়। নির্বাচনে আপনারা ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে জয়ী করেছিলেন শাসনতন্ত্র রচনা করার জন্য। আশা ছিল জাতীয় পরিষদ বসবে– আমরা শাসনতন্ত্র তৈরি করবো এবং এই শাসনতন্ত্রে মানুষ তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তিলাভ করবে। কিন্তু ২৩ বছরের ইতিহাস বাংলার মানুষের মুমূর্ষু আর্তনাদের ইতিহাস, রক্তদানের করুণ ইতিহাস, নির্যাতিত মানুষের কান্নার ইতিহাস। ...আমি বলতে চাই, আজ থেকে কোর্ট–কাচারি, হাইকোর্ট, সুপ্রিম কোর্ট, অফিস, আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। কোনো কর্মচারি অফিসে যাবেন না–এ আমার নির্দেশ। ...আমার অনুরোধ, প্রত্যেক গ্রামে,

মহল্লায়, ইউনিয়নে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম কমিটি গড়ে তুলুন। হাতে যা আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকুন। মনে রাখবেন রক্ত যখন দিয়েছি, আরও দেব, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ। এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম...”।[৩৪]

ইয়াহিয়া খান একদিকে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের ব্যাপারে শেখ মুজিবসহ অন্যান্য নেতাদের সাথে আলোচনা চালাতে থাকেন–অপরদিকে পূর্ববাংলায় পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকেন। শেখ মুজিবের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা না ভেঙ্গে ২৫ মার্চ তিনি গোপনে ঢাকা ত্যাগ করেন এবং এর পূর্বে পাকিস্তানী সৈন্যবাহিনীকে পূর্ববাংলার অপ্রস্তুত ও নিরস্ত্র জনগণের উপর লেলিয়ে দিয়ে যান। মুজিবকে গ্রেফতার করে নিয়ে যাওয়া হয় পাকিস্তানে।[৩৫] ২৬ মার্চ শেখ মুজিবর রহমানের নামে চট্টগ্রামের কালুরঘাট ‘স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র’ হতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় এবং পাক-সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য সকল বাঙালির প্রতি আহ্বান জানানো হয়। পরবর্তী দিন মেজর জিয়াউর রহমান (পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতি) কর্তৃক আরও আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।[৩৬] ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে জারিকৃত বাংলাদেশের ‘স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র’ আদেশ বলে শেখ মুজিবর রহমানকে বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি করা হয়। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে উপ-রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন। মুজিবনগর সরকার শেখ মুজিবের নামেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করে।[৩৭] একটানা দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সম্মিলিত আক্রমণের মুখে অবশেষে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনী বিপর্যস্ত অবস্থায় ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পরাজয় বরণ করে নিতে বাধ্য হয়। পৃথিবীর বুকে জন্ম নেয় স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি দেশ–বাংলাদেশ।

৩.৫ উপসংহার : শেখ মুজিবের গৌরবময় উত্থান

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, একজন মানুষ হিসেবে শেখ মুজিবের মধ্যে ছিল দুর্বলতা, ছিল স্ববিরোধিতা। স্বাধীনতা–উত্তর শেখ মুজিব অব্যাহতভাবে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের প্রত্যয় সামনে রেখে একের পর এক কর্মসূচি ও প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন। কিন্তু কাজ করেছেন একজন বুর্জোয়া উদারপন্থী গণতন্ত্রী হিসেবে এবং তাঁর ধারণা সর্বদাই গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। অবশ্য পরবর্তীকালে গণ-জোয়ারের বেগ বাড়ার সাথে সাথে তিনি সমাজতান্ত্রিক দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন এবং একজন সোস্যাল ডেমোক্র্যাট হিসেবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছেন। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চূড়ান্ত মুহূর্তগুলোতে তিনি নবীন যুবকদের প্রভাবে অধিকাংশ সময়ে প্রভাবিত হয়েছেন। সংস্কারমুখী এই সমস্ত জাতীয়তাবাদী যুবশক্তির ধারণার সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে তাঁকে পদে পদে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তাঁর আচরণে ও অভ্যাসে পরিলক্ষিত হয় যে, তিনি সংঘাতের পরিবর্তে আলোচনার টেবিলে বসে সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়াকে অধিকতর শ্রেয় বলে মনে করতেন। যাহোক, শেখ মুজিবের

জীবন-কর্মের প্রথম পর্যায়ের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল বিজয় গৌরবে উদ্ভাসিত। ক্ষেত্র বিশেষে পথবিচ্যুত হয়ে তিনি প্রচলিত ধারার পরিপন্থী কাজ করলেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপোষ করেননি এবং উপর্যুপরি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের নায়কের ভূমিকাই পালন করেছেন। কিন্তু তাঁর শাসনামলের দ্বিতীয় অংশ পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করার অব্যবহিত পরমুহূর্ত থেকেই তাঁর পতনের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। যাহোক, দেশে সংস্কারমুখী পরিবর্তন সাধনের সর্বশেষ প্রচেষ্টায় গোটা জাতির বিরোধিতার মুখে ব্যর্থতা এবং ভ্রান্তির পরিচয় দিলেও একথা নিঃসন্দেহে সত্য যে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ভগ্নদশা থেকে জাতিকে সফলতার শীর্ষে নিয়ে যেতে শেখ মুজিবের প্রচেষ্টার কোনো অন্ত ছিল না।[৩৮]

কারাবন্দি অবস্থায় পাকিস্তানী সামরিক জান্তার হাতে নিহত হলে তিনি বাঙালি জনমনে অমর হয়ে থাকতেন এবং বাঙালির হৃদয়ে তাঁর ভাবমূর্তি থেকে যেত অবিনশ্বর। তিনি বিবেচিত হতেন ইতিহাসের অন্যতম শহীদ হিসেবে। তবে সেক্ষেত্রে বোধ হয় বাংলাদেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা আরও সকরুণ পরিণতির শিকার হতো, হয়তো বাংলাদেশে অনেকগুলো সরকার এক সাথে বিরাজ করতো। ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত সরকারের আরও ঘন ঘন পরিবর্তন ঘটতো, বয়ে যেত আরও অনেক রক্তগঙ্গা, হয়তো ভারতীয় সেনাবাহিনী চিরদিনের জন্য আসন পেতে বসতো বাংলাদেশের মাটিতে। কিন্তু মুজিবের প্রত্যাবর্তন এবং তাঁর পরবর্তী ভূমিকা সম্ভাব্য এই ধ্বংসের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করেছে। বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করে আশু দুর্যোগের ঘনঘটা অপসারণের পর যদি তিনি অবসর নিতেন, তাহলে হয়তো মুজিব তাঁর ভাবমূর্তি অনেক উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারতেন। কিন্তু উন্নয়নশীল বিশ্বের ছকে বাঁধা রাজনীতির অনুসরণে ব্যাপক জনপ্রিয়তার মোহ শেখ মুজিব এড়াতে পারেননি এবং রাষ্ট্রশাসনে কঠোর বাস্তবতার মুখোমুখি হয়ে তিনি প্রকারান্তরে নিজের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করেছিলেন। অমরতার দ্বারপ্রান্তে এসেও তিনি তাঁর আস্বাদ গ্রহণ করতে পারেননি।[৩৯] তবে একথা সত্য যে তাঁর মৃত্যু ছিল মহিমান্বিত। অত্যন্ত দুঃখবহ ও করুণ মৃত্যু বরণ করতে হলেও তিনি উপহার দিয়ে গেছেন স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ।

সূত্র ও পাদটীকা

১. Moudud Ahmed, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman*, Dhaka: University Press Limited, 1983, p. 263

২. ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ শেখ মুজিবর রহমান ফরিদপুর জেলার (বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামের এক মধ্যবিত্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সিভিল কোর্টের একজন সেরেস্তাদার।

৩. শেখ মুজিব কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৪৬ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি এ কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

৪. ভবেশ রায়, *বঙ্গবন্ধুর জীবনকথা*, ঢাকাঃ এশিয়া পাবলিকেশন্স, ১৯৯৪, পৃ. ৩৩; মযহারুল ইসলাম, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা : বাংলা একাডেমী, ১৯৭৪

৫. পাকিস্তানের স্বাধীনতার কথা প্রথম ঘোষিত হয় ১৯৪৭ সালের ৩ জুন। এর কিছুদিন পরেই শেখ

মুজিব ইসলামিয়া কলেজের সিরাজদ্দৌলা হলে ছাত্র, যুবক ও রাজনৈতিক কর্মীদের এক গোপন বৈঠক ডাকেন। এ বৈঠকে তিনি মুসলিম লীগ বিরোধী ও প্রগতিবাদী ছাত্র-যুব ও রাজনৈতিক সংগঠনের সদস্যদের শুধু ডেকেছিলেন। বলতে গেলে এটাই ছিল পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ গঠনের প্রথম বীজ বপন। দেখুন, ফজলুর রহমান, *রক্তাক্ত বাংলা*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭১. পৃ. ৯

৬. ১৯৪৯ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকেই শেখ মুজিব এ দলের সাথে জড়িত হন। তিনি ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৪৮ সালের ১৯ এপ্রিল থেকে ২৭ জুলাই-এ পুরো সময়টাই মুজিব ছিলেন জেলে। কারারুদ্ধ অবস্থাতেই তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, আবু আল সাঈদ, *আওয়ামী লীগের ইতিহাস (১৯৪৯-১৯৭১)*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৩, পৃ. ২৪-২৫, আরও দেখুন, Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971*, Dhaka: Academic Publishers, 1990; এম. আর. আকতার মুকুল, *পাকিস্তানের চব্বিশ বছর: ভাসানী মুজিবের রাজনীতি*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৮৬

৭. বর্তমান আওয়ামী লীগের জন্মের মূল ইতিহাস এটাই। ভবেশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০-৪১। সংগঠন থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া প্রসঙ্গে সৃষ্ট দ্বন্দ্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখুন, Kamruddin Ahmed, *A Socio-Political History of Bengal and the Birth of Bangladesh*, Dhaka : Zahiruddin Mahmud, Inside Library, 1975, pp. 43-86; আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, তৃতীয় বর্ধিত সংস্করণ, ১৯৬৮, পৃ.২১০-২১১; আরও দেখুন, Leonard Gordon, *Bengal and the Indian National Movement*, Unpublished Ph. D. Dissertation, Cambridge, Mass: Harvard University, 1969

৮. তিনি ছিলেন যুব লীগের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং টাঙ্গাইলের জনাব শামসুল হক ছিলেন এ পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিগণ তাদের কতিপয় ন্যায়সঙ্গত দাবিতে ধর্মঘট ডাকলে মুজিব তাতে সমর্থন দেন বলে অভিযোগ করা হয়। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে মাত্র কয়েক মাসের জন্য তাঁর জেল হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে দেখেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগে বহিষ্কার করেছে। ভবেশ রায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭; Kazi Kamal Ahmed, *Sheikh Mujibur Rahman: Man and Politician*, Dhaka : Shainpukur Art Press, 1970

৯. পূর্ববঙ্গে খাদ্য সঙ্কট দেখা দিলে এর প্রতিবাদ প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খানের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গিয়ে তাঁকে এবং মাওলানা ভাসানীকে প্রায় দু'বছর জেলে খাটতে হয়। শেখ মুজিব দাবি করেন যে, তিনি হাসপাতালের বিছানায় থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছিলেন। বিস্তারিত দেখুন, মযহারুল ইসলাম, *ভাষা আন্দোলন ও শেখ মুজিব*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, (প্রথম প্রকাশ) ১৯৯৪

১০. আবদুর রহিম আজাদ ও শাহ আহমদ রেজা, *বাংলাদেশের রাজনীতি : প্রকৃতি ও প্রবণতা-২১ দফা থেকে ৫ দফা*, ঢাকা : সমাজ বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৭, যুক্তফ্রন্টের ২১-দফা কর্মসূচির বিস্তারিত দেখুন, Appendix 1, in Talukder Maniruzzaman, *The Politics of Development : The Case of Pakistan, 1947-1958*, Dhaka : Green Book House, 1971, pp. 139-140; আরও দেখুন, Nazma Chowdhury, *The Legislative Process in Bangladesh Politics and Functioning of the East Bengal Legislature 1947-58*, Dhaka : The University of Dhaka, 1980, pp. 157-164

১১. এ নির্বাচনে মোট ৩০৯ আসনের প্রাদেশিক আইন পরিষদে ২৯৯ টিতেই জিতেছিলেন যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীরা। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের ভাগ্যে জুটেছিল মাত্র ১০টি আসন। দ্রষ্টব্য, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন, সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের *বার্ষিক রিপোর্ট*, ঢাকা : ১৯৯৫

১২. এ সময়ে শেখ মুজিবকে কারারুদ্ধ করা হয়।

১৩. পাকিস্তান গণ-পরিষদে এক ইউনিট বিল প্রশ্নে শেখ মুজিবর রহমানের প্রদত্ত ভাষণ, ২৫ আগস্ট, ১৯৫৫, বিস্তারিত, হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, প্রথম খণ্ড, ঢাকা : তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, পৃ. ৪৩১

১৪. উক্ত গণ-পরিষদে ১৯৫৬ সালের সংবিধান বিল প্রসঙ্গে শেখ মুজিবের ভাষণ, জানুয়ারি, ১৯৫৬, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৩

১৫. M. Mahfuzul Huq, *Electoral Problems is Pakistan*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1966, p. 102

১৬. *The Constitution: A Summary*, Islamabad: Government of Pakistan, 1960 p. 3

১৭. *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩

১৮. আয়ুবের সংবিধান-বিরোধী বক্তব্য প্রদানকারী এই নয়জন নেতা হলেনঃ নুরুল আমিন, আতাউর রহমান খান, হামিদুল হক চৌধুরী, আবু হোসেন সরকার, শেখ মুজিবর রহমান, ইউসুফ আলী চৌধুরী, মাহমুদ আলী, সৈয়দ আজিজুল হক ও মাওলানা পীর মোহসীন উদ্দীন আহমেদ।

১৯. পাকিস্তানের উভয় অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের যথেষ্ট তথ্য ও প্রামাণ্য দলিল রয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, নীলিমা ইব্রাহিম প্রমুখ (সম্পাদিত), *মুক্তি সংগ্রাম*; আবুল কাসেম ফজলুল হক রচিত, *প্রথম পর্ব*, ঢাকা: বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭২, পৃ. ২৯-৩০; রাজনৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বঞ্চনার ইতিহাস সম্পর্কে আরও দেখুন, Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and Its Aftermath*, Dhaka: University Press Limited, 1988 pp. 5-18; Raunaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration*, New York: Columbia University Press, 1972, pp. 1-47; *আরও দেখুন*, আতাউর রহমান খান, *স্বৈরাচারের দশ বছর, ঢাকা : নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭০;* M. Rashiduzzaman, "The Awami League in the Political Development in Pakistan", *Asian Survey*, Vol.10, No. 7. pp. 574-587

২০. '৬৫-এর পাক-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, M. Nazrul Islam, *Pakistan and Malaysia : A Comparative Study in National Integration*, New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1989, pp. 146-147

২১. ৬-দফা কর্মসূচির মধ্যে ছিলঃ ১. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা, পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, সংসদীয় সরকার ও প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকার প্রবর্তন; ২. দেশরক্ষা ও বৈদেশিক বিষয়াদি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রেখে অবশিষ্ট বিষয় যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে অর্পণ; ৩. পাকিস্তানের দু'টি প্রদেশের জন্য দু'টি পৃথক অথচ অবাধে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা প্রবর্তন অথবা সমগ্র দেশের জন্য একটি মুদ্রাই বজায় রেখে পূর্ব-পাকিস্তান হতে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধন পাচার বন্ধ করার সাংবিধানিক ব্যবস্থা গ্রহণ ও পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থা; ৪. কর ধার্যের ক্ষমতা অঙ্গরাজ্যগুলোর হাতে অর্পণ এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে অঙ্গরাজ্যের রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদান; ৫. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈদেশিক আয়ের দু'টি পৃথক হিসাব রাখা, বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত পূর্ব-পাকিস্তানের আয় পূর্ব-পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণাধীনে ন্যস্ত করা এবং এই দু'টি অঙ্গরাজ্য কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান বা সর্বসম্মত হারে মিটানো; ৬. সংবিধান ও আঞ্চলিক সংহতি রক্ষার জন্য অঙ্গরাজ্যগুলোকে আধা-সামরিক বা আঞ্চলিক বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দান। বিস্তারিত দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-২৬৯

২২. শেখ মুজিবর রহমান, *আমাদের বাঁচার দাবি-৬ দফা কর্মসূচি*, ঢাকা : পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, ২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৬, পৃ. ২

২৩. এই মামলায় তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতের সঙ্গে যোগসাজশে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার এবং এভাবে পূর্ব-পাকিস্তানকে পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ আনা হয়। অভিযোগে আরও বলা হয়, ভারত থেকে অস্ত্রশস্ত্র আনার উদ্দেশে তাঁরা আগরতলা গিয়ে ভারত সরকারের সামরিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন। এ কারণেই উক্ত মামলা 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' হিসেবে জনসাধারণের কাছে পরিচিত লাভ করে, যদিও সরকারীভাবে একে 'রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবর রহমান গং', মামলা বলা হয়। বিস্তারিত দেখুন, আব্দুর রউফ, *আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও আমার নাবিক জীবন*, ঢাকা: প্যাপিরাস প্রকাশনী, ১৯৯২

২৪. আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সমক্ষে শেখ মুজিবের জবানবন্দী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ : দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৯-৩৬৩

২৫. পূর্ববাংলার ছাত্র আন্দোলন ও গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Talukder Maniruzzaman, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath*, Dhaka: University Press Limited, 1988, pp. 53-69

২৬. সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের অন্যতম অঙ্গ সংগঠন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এবং পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি তোফায়েল আহমেদের সভাপতিত্বে এ উপাধি দেয়া হয়। দেখুন, মোস্তফা সরোয়ার, *পঁচিশ বছরের সংগ্রামে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু*, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন, ১৯৭৪, স্মরণিকা, ঢাকা, তারিখবিহীন; *Yatindra Mujib: The Architect of Bangladesh*, New Delhi: Indian School Supply Depot, 1971

২৭. ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আয়োজিত জনসভায় শেখ মুজিবের ভাষণ, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৫-৪৩৭: আরও দেখুন, Remendu Majumder (ed.), *Bangladesh My Bangladesh –Selected Speeches and Statements of Sheikh Mujibur Rahman*, New Delhi: Orient Longman Limited, 1972, reprinted by Muktadhara, Dhaka, 1972

২৮. গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবের ভাষণ, ১০ মার্চ, ১৯৬৯, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩৯-৪৪৪

২৯. ৩০ মার্চ, ১৯৭০-এ আদেশ জারি করা হয়। এ আদেশে ভবিষ্যত নির্বাচিতব্য জাতীয় পরিষদের মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে ১৬৯টি আসন বরাদ্দ করা হয়। আর অবশিষ্ট ১৪৪টি আসন পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশের মধ্যে ভাগ করে দেয়া হয়। কিন্তু উক্ত আদেশে জাতীয় পরিষদকে সংবিধান প্রণয়নের জন্য ১২০ দিনের সময় দেয়া হয় এবং এ সংবিধানকে প্রেসিডেন্ট কর্তৃক অবশ্যই অনুমেদিত হতে হবে বলে বিধান রাখা হয়। আইনগত কাঠামো আদেশ এভাবে সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের ক্ষমতার উপর বাঁধা-নিষেধ আরোপ করে। Provisions of the LFO-সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, *White Paper on the Crisis in East Pakistan*, Islamabad: Government of Pakistan Press, August, 1971, Appendix-B, pp. 18-35

৩০. জাতির উদ্দেশে শেখ মুজিবের প্রদত্ত নির্বাচনী ভাষণ, ২৮ অক্টোবর, ১৯৭০, নীলিমা ইব্রাহিম প্রমুখ (সম্পাদিত), *মুক্তিসংগ্রাম*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫

৩১. ৩১৩ আসন বিশিষ্ট পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ১৩টি আসন ছিল মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত। ১৯৭০-এর জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে মোট ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ লাভ করে ১৬৭টি আসন, পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) ৮৮টি ও অন্যান্য দল ৫৮টি আসন লাভ করে। প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩১০টি আসনের মধ্যে ২৯৮টিতেই জয়লাভ করে। শেখ মুজিব একাই ৪টি আসনে থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সব ক'টিতেই বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করেন।

নির্বাচনের ফলাফল সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Craig Baxter, "Pakistan Votes-1970", *Asian Survey*, Vol.11, No.3 (March, 1971), pp. 197-218

৩২. ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণ, ১ মার্চ, ১৯৭১, পরবর্তীতে আরেক বেতার ভাষণে তিনি বলেন, "ঐ ব্যক্তি (মুজিব) ও তাঁর দল পাকিস্তানের দুশমন। তাঁরা পূর্ব-পাকিস্তানকে সার্বিকভাবে পাকিস্তান থেকে পৃথক করতে চায়। এবার তাঁকে শাস্তি পেতেই হবে।" ইয়াহিয়ার বেতার ভাষণের বাংলা অনুবাদ, ২৬ মার্চ ১৯৭১

৩৩. মুজিবের অসহযোগ আন্দোলন রাষ্ট্রদ্রোহিতা হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩৪. রেসকোর্স ময়দানে শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণ, ৭ মার্চ, ১৯৭১, লাখো জনতার ভিড়ে রেসকোর্স ময়দান জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছিল। 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধর, বাংলাদেশ স্বাধীন কর, তোমার দেশ আমার দেশ বাংলাদেশ, তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা', -এসব শ্লোগানে সারা ময়দান মুখরিত হয়ে উঠেছিল। ভাষণের বিস্তারিত দেখুন, *বজ্রকণ্ঠ*, ঢাকা : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তথ্য দফতর, ৭১/৭২, পৃ. ৩-৬

৩৫. আমাকে সবাই চেনে। আমাকে গ্রেফতার করা হলে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলো বিষয়টি গ্রহণ করবে। কিন্তু তোমাদের কেউ চেনে না। কাজেই তোমাদের অবশ্যই পালাতে হবে। শেখ মুজিব তোফায়েল আহমেদ ও অন্যান্যদেরকে ঢাকা ত্যাগের নির্দেশ দানকালে একথা বলেন।

৩৬. মেজর জিয়াউর রহমান কর্তৃক ইংরেজিতে রচিত স্বাধীনতা ঘোষণার সংক্ষিপ্তসারটি ছিল: I Major Zia, on behalf of our great leader Bangabandu Sheikh Mujibur Rahman, do hereby declare the independence of Bangladesh...khoda hafez, Joy Bangla, ২৫ মার্চ, ১৯৭১-এর মধ্য রাতের কিছু পরে, অর্থাৎ ২৬ মার্চ ভোররাতে গোটা বাংলাদেশে প্রচারের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণার যে বার্তাটি সাবেক ই. পি. আর. ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে দেশব্যাপী প্রচারিত হয়-তার মূল ইংরেজি ভার্সনটি হলো: "This may be my last message. From today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved." *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১

৩৭. A.M.A Muhith, *Bangladesh: Emergence of a Nation*, Dhaka: University Press Limited, 1978, pp. 165-262. Mizanur Rahman Shelly, *Emergence of a New Nation in a Multi-Polar World: Bangladesh*, Dhaka: University Press Limited 1979

৩৮. Moudud Ahmed, প্রাগুক্ত, pp. 263-264

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬-২৬৮

আমলাতন্ত্রের সংস্কার প্রসঙ্গে শেখ মুজিব

ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

স্বাধীনতা সংগ্রামের সফলতার মাধ্যমে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হলে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ের মতো আমলাতন্ত্রেও সংস্কার ও পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বস্তুতঃ বাংলাদেশের আমলাতন্ত্র উত্তরাধিকারের দিক থেকে ব্রিটিশ-পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। কাঠামো ও কার্যক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের এই উন্নাসিক মানসিকতা সুস্পষ্ট। স্বাধীনতার প্রাক্কালে আন্দোলনের নেতা শেখ মুজিব ও তাঁর দল ঔপনিবেশিক ধাঁচে আমলাতন্ত্র ও প্রশাসন যন্ত্রের তীব্র সমালোচনায় মুখর ছিল। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের সরকার ক্ষমতায় এসে আমলাতন্ত্রকে আগাগোড়া সংস্কার করবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে নেয়।

ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের সংস্কারের লক্ষ্যে মুজিব সরকার বিস্তারিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। প্রশাসনিক সংস্কার ও মজুরি কমিশন গতানুগতিক আমলাতন্ত্রে এক যুগান্তকারি সংস্কারের পথ-নির্দেশনা দিয়েছিল। কিন্তু মুজিবের শাসনামলের মাঝামাঝি সময়ে দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এতই নাজুক হয়ে পড়েছিল যে, সরকার ক্রমান্বয়ে প্রশাসন-নির্ভর হয়ে পড়ে। বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরিবর্তন না করে বরং এর সহযোগিতা নেয়ার তাগিদ অনুভব করে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার। ফলে আমলা-প্রশাসকদের নাখোশ করতে পারে, এই ভয়ে সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়িত হয়নি। ঔপনিবেশিক ধারার আমলাতন্ত্রের সংস্কার প্রসঙ্গে শেখ মুজিব গ্রহণ করেন এক সিদ্ধান্তহীন অবস্থান– যা ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের ঐতিহ্যকে বাঁধাহীনভাবে অব্যাহত রাখে।

কেন এবং কী পরিস্থিতিতে শেখ মুজিব প্রশাসনিক সংস্কার উদ্যোগ গ্রহণ করেন, কিন্তু সেটা বাস্তবায়িত করেননি– এই প্রবন্ধে সেই জিজ্ঞাসার উত্তর খোঁজা হয়েছে।

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে শেখ মুজিবের অবিস্মরণীয় উত্থান এবং গণমুখী ভূমিকার আলোকে প্রশাসনিক সংস্কার পরিকল্পনা ও এর খুঁটিনাটি নানা দিক পর্যালোচনার ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়েছে সেই সকল অন্তর্নিহিত কার্যকারণ, যা শেখ মুজিবকে সংস্কারের পথে বেশি দূর এগুতে দেয়নি। রাষ্ট্রের সামগ্রিক ক্যানভাসে কার্যরত তৎকালীন বিভিন্ন উপাদান অনুসন্ধান করে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর সংস্কারের প্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের অবস্থান পরীক্ষা-নিরীক্ষার চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে।

৪.১ আওয়ামী লীগ ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ

অবিভক্ত ব্রিটিশ-ভারতের মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের উদ্ভবের পরেই পূর্বাঞ্চলীয় (বর্তমান বাংলাদেশ) জনগণ উপলব্ধি করতে শুরু করল যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি অর্জন করলেও তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানী নব্য-ঔপনিবেশবাদের শোষণে বন্দি হয়েছে। পাকিস্তানের স্বাধীনতার পর পরই যখন পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী অগ্রগণ্য ভাষার নাম করে উর্দুকে সফল রাষ্ট্রের জন্যে একমাত্র রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালালো-ঠিক তখন থেকেই বাঙালি জনগণের মধ্যে এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতাবোধ জাগ্রত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানীদের ভাষা-কেন্দ্রীক আগ্রাসনের ফলেই বস্তুতঃ পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক জাতীয়তাবাদের প্রথম স্ফুলিঙ্গের উদ্ভব ঘটে, যা প্রদেশের পরবর্তী রাজনৈতিক ধারায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলে।[১]

শাসক মুসলিম লীগের বাঙালি-বিরোধী এবং অগর্লবদ্ধ নীতির রক্ষণশীলতার প্রেক্ষাপটে নেতৃস্থানীয় বাঙালি রাজনীতিকদের একাংশের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। ফলে তাঁরা ১৯৪৯ সালের জুন মাসে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নামে একটি সংগঠন গঠন করে মুসলিম লীগ থেকে বেরিয়ে আসেন এবং ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে বিকল্প রাজনৈতিক ধারার উদ্বোধন ঘটান।[২] ভাষা আন্দোলনের (১৯৫২) ফলে সংক্ষুব্ধ বাঙালি জনগোষ্ঠীর মধ্যে যে বিপুল-বিশাল ভাবাবেগের জন্ম হয়, সেটাকে মূলধন করে অচিরেই পূর্ববাংলা প্রদেশের সবচেয়ে শক্তিশালী রাজনৈতিক দল হিসেবে আওয়ামী লীগের আত্মপ্রতিষ্ঠা ঘটে। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাঙালি জনগণের মধ্যে নির্বাচনী জনপ্রিয়তা পরীক্ষার করার প্রথম সুযোগ পায়। এদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় দলের সুস্পষ্ট লক্ষণ থাকার পরেও আওয়ামী লীগ, শাসক মুসলিম লীগের ধ্বস নামানো পরাজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অন্যান্য বিরোধী দলের সঙ্গে নির্বাচনী মোর্চা 'যুক্তফ্রন্ট' গঠন করেছিল। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মোর্চার নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে বাঙালি জনগোষ্ঠীর কতগুলো জনপ্রিয় দাবি, যেমন– আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রভৃতি সন্নিবেশিত করেছিল। আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের পক্ষে জনসমর্থন লাভের জন্যে পূর্ববাংলার জনগণের স্বার্থরক্ষায় শাসক গোষ্ঠীর ব্যর্থতা, বিশেষ করে-ভাষার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতাসুলভ মনোভাবের সমালোচনা করার নীতিগত অবস্থান নিয়ে দেশব্যাপী ব্যাপক জনসংযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট শাসকগোষ্ঠীর ধ্বস নামিয়ে ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে, যা কেন্দ্রে মুসলিম লীগ সরকারকে বেকায়দায় ফেলে দেয়।[৩] কিন্তু ক্ষমতায় আরোহণের মাত্র দু'মাসের মাথায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রধানমন্ত্রি একে ফজলুল হকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগ এনে তার সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত এবং পূর্ববাংলায় কেন্দ্রীয় শাসন জারি করা হয়। ১৯৫৮ সালের রক্তপাতহীন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আয়ুব খান ক্ষমতা দখল করেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত আধা-স্বৈরতান্ত্রিক শাসনকালে পূর্ববাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের উত্তাল গণদাবি ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হয়ে পড়ে। অবশ্য ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণার ফলে বাঙালি আঞ্চলিকতা আন্দোলনের পুনরুজ্জীবন ঘটে। ৬-দফা কর্মসূচির মূল কথা ছিল– সংসদীয় গণতন্ত্রের পুনঃপ্রবর্তন; যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা চালু; যেখানে কেলমাত্র প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি থাকবে কেন্দ্রের অধীনে; দেশের দুই অংশের জন্য দুই ধরনের আলাদা অথচ সহজ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা প্রচলন; করারোপ ও রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে প্রদেশগুলোকে প্রদান; দুই প্রদেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার দু'টি আলাদা হিসাব এবং পূর্ব-পাকিস্তানের জন্যে একটি মিলিশিয়া বাহিনী গঠন।[৪]

শেখ মুজিব উত্থাপিত ৬-দফা কর্মসূচি ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক, বুদ্ধিজীবী ও বঞ্চিত বাঙালি বুর্জোয়াদের ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পায়। ১৯৬৬ সালের শুরুর দিককার মাসগুলোতে শেখ মুজিব ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোদ্ধারা সমগ্র প্রদেশে জনসংযোগ করে ৬-দফা আন্দোলনের যৌক্তিকতা ও বিভিন্ন জটিল বিষয় ব্যাখ্যা করেন। সমগ্র প্রদেশ জাতীয়তাবাদী বিস্ফোরণের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। বাঙালি জনগোষ্ঠীর সমর্থন লাভের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের সাফল্যের পিছনে মূলতঃ কাজ করেছিল পূর্ববাংলার বিরুদ্ধে পশ্চিম পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনৈতিক বৈষম্যের নীতি।[৫] আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ-ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে পূর্ব-পাকিস্তান ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে এবং ১৯৬৯ সালের প্রথম দিকে সর্বাত্মক জাতীয়তাবাদী বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ করে। গণআন্দোলনের বিপক্ষে সরকারের দমনমূলক নীতি ও প্রতিরোধ সামগ্রিক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। প্রশাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি অচল হওয়ার পর্যায়ে চলে যায়। আর কোনো উপায়ান্তর না দেখে ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে লৌহপুরুষ বলে পরিচিত জেনারেল আয়ুব খান পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সরে পড়েন। এ প্রেক্ষাপটে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রধান হোতা হিসেবে আওয়ামী লীগ এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের উত্থান ঘটে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কিছু নগণ্য সুবিধা আদায়ের জন্য যে আন্দোলনের শুরু হয়েছিল, সেটি, ৬০ দশকের শেষ দিকে এসে পুরোমাত্রায় জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানে রূপান্তরিত হয়।

বাঙালি জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের কাছ থেকে অভূতপূর্ব জনসমর্থন লাভ করার প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগ নীতি–আদর্শ পরিবর্তন করে। দলীয় ঘোষণাপত্রে কতিপয় সমাজতন্ত্রমুখী কর্মসূচি সংযোজনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বস্তুতঃ

অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ শ্রেণীকে সংগঠনের পেছনে দৃঢ়ভাবে সমবেত করার জন্য এ নীতিগত পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল- যে রাজনৈতিক কৌশল দারুণভাবে ফলপ্রসূ হয়েছিল। ফলে ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের ইতিহাসের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসনেই জয়ী হয় এবং পাকিস্তানের জাতীয় সংসদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।[৬] পরবর্তী ঘটনা ধারায় স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী শক্তির ব্যাপক-বিশাল নির্বাচনী সাফল্য মানসিকভাবে গ্রহণ করতে পাকিস্তানের অভিজাত শাসক শ্রেণী মোটেই প্রস্তুত ছিল না। ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদের অধিবেশন মার্চ মাসের প্রথম দিনেই ইয়াহিয়া খান স্থগিত ঘোষণা করেন। সংসদ অধিবেশনের স্থগিতাদেশ তাৎক্ষণিকভাবে পূর্ব-পাকিস্তানে স্বতঃস্ফূর্ত ও সহিংস প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে– যা প্রদেশে সর্বাত্মক জাতীয়তাবাদী স্ফূলিঙ্গের জন্ম দিয়েছিল। অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিবের নির্দেশে বাঙালি জনগোষ্ঠী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক নেটওয়ার্ক ও কর্তৃত্ব অচল করে দেয়। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে কার্যত শেখ মুজিবই ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের শাসনকর্তা। সেই সঙ্গে ঐ সময়টি ছিল সামরিক শাসক ইয়াহিয়া, শেখ মুজিব এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা ভুট্টোর মধ্যে ত্রিপক্ষীয় ব্যাপক আলোচনার কাল।[৭]

২৫ মার্চ গভীর রাতে ইয়াহিয়া খান পূর্ব-পাকিস্তানে সামরিক হামলার আদেশ দেন এবং এভাবেই পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট উত্তরণে সামরিক সমাধানের পথ বেছে নেয়া হয়। পশ্চিম পাকিস্তানী সশস্ত্র সৈন্যরা পূর্ব-পাকিস্তানে নৃশংস গণহত্যার সুপরিকল্পিত সেন–অভিযান চালিয়ে ঐক্যবদ্ধ দেশ হিসেবে পাকিস্তানের অস্তিত্ব রক্ষার সকল সম্ভাবনা ভেঙে চুরমার করে দেয়। শেখ মুজিবর রহমানের নামে ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের চরম পরিণতিমূলক শেষ ধাপ; শেখ মুজিবের অনুপস্থিতিতেই ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগিরা যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। সুতরাং এটা বলা যায় যে, বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ও জাগরণে এবং সফল সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে আওয়ামী লীগ সবচেয়ে অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছিল। জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন গণআন্দোলনের নেতৃত্বের ভূমিকায় থেকে সেসব গণআন্দোলনের ভেতর দিয়ে আওয়ামী লীগ ছাত্র, যুবক, শ্রমিক, কৃষকদের মধ্যে সংগঠন-অনুসারী চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সংগঠিত করতে সক্ষম হয়েছিল; ফলে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, একটি স্বাধীন দেশকে নেতৃত্ব দানের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ যথেষ্ট প্রস্তুত।

৪.২ আওয়ামী লীগ সরকারের গণমুখী ভূমিকা

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের বিপুল জনপ্রিয়তা স্বাধীনতার পর আওয়ামী লীগ সরকারকে আর্থ-সামাজিক নীতি গ্রহণে গণমুখী অবস্থান নিতে প্রণোদিত করে।

যথাযথভাবে মুজিব শাসন ব্যবস্থার চারিত্রিক প্রকৃতি উপলব্ধি করার ক্ষেত্রে সরকার গৃহীত নীতিমালাসমূহ মূল্যায়ন করে দেখা প্রয়োজন।

১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ মৌলিক নীতি সংক্রান্ত এক ঘোষণায় শেখ মজিব সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি তাঁর সরকারের অঙ্গীকারের কথা ব্যক্ত করে বলেন: আমার সরকার অভ্যন্তরীণ সামাজিক বিপ্লবে বিশ্বাস করে। নতুন সমাজ গড়ার জন্যে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা পরিত্যাগ করতে হবে। এটা কোনো নিরর্থক তত্ত্ব কথা নয়। আমার সরকার ও দল বৈজ্ঞানিক সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েমে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।[৮] ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলীয় ঘোষণাপত্র অনুসারে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় চার মূলনীতির (গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা) অন্যতম আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল: জাতীয়তাবাদ সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার মহান আদর্শ– যা আমাদের বীর জনগণকে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে আত্মনিয়োগ ও বীর শহীদদের প্রাণ উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল– সংবিধান মূলনীতি হবে।[৯] সংবিধানে আরো উল্লেখ করা হয় যে:

"A Socialist economic system shall be established with a view to ensuring the allainment of a just and egalitarian society, free from the exploitation of man by man... It shall be a fundamental responsibility of the state to emancipate the toiling masses.... the peasants and workers...and backward section of the people from all forms of exploitation.[১০]

অবশ্য, এখানে একথা উল্লেখ করা জরুরি যে, আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বলতে কী বুঝায় তা কখনোই স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করেনি।[১১] আওয়ামী লীগের মতাদর্শগত ঘোষণাকে সমালোচকরা 'মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রোমান্টিক মানসিকতা'র[১২] চেয়ে বেশি কিছু নয় বলে অভিহিত করেছেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার আগে পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন কৌশল ছিল ব্যক্তি মালিকানা নীতিকে উৎসাহ প্রদান। এই কৌশল যদিও দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি সঞ্চার করেছিল, তবুও সে কৌশলে অর্থনীতিক বণ্টন ব্যবস্থার যথাযথ লক্ষ্য রাখা হয়নি। এর ফলে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যকার অর্থনৈতিক বৈষম্য লাগামহীনভাবে ঘটেছিল। স্বাধীনতার আগে আওয়ামী লীগ পাকিস্তান সরকারের এই শিল্প বিকাশ কৌশলকে অগ্রহণযোগ্য বলে সমালোচনা করেছিল। সেই কারণে বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক-বীমার মতো আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জাতীয়করণ করার প্রসঙ্গ ছিল ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদায়। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের আর্থ–সামাজিক নীতি প্রণয়নের প্রভাবশালী সংস্থা হিসেবে মন্ত্রি পরিষদের কাছে ১৯৭২ সালে 'শিল্প জাতীয়করণের জন্য বিকল্প প্রস্তাব ও সুপারিশমালা' শীর্ষক একটি কর্মপ্রস্তাব পেশ করে।[১৩]

পরিকল্পনা কমিশনের কর্মপ্রস্তাবে দেড় মিলিয়ন টাকার বেশি সম্পদ বিশিষ্ট ব্যক্তি মালিকানাধীন বেসরকারি, পাট, কাপড় ও চিনিকল শিল্পকে জাতীয়করণ করার পরামর্শ দেয়া হয়। এ প্রস্তাবের তাৎপর্য খতিয়ে দেখার জন্য সরকার একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠন করে। যথেষ্ট তর্ক-বিতর্কের পর সরকার পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশকৃত প্রস্তাবগুলো অনুমোদন করে। ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার এক বছর পূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে শেখ মুজিব ঘোষণা করেন যে, দেড় মিলিয়নের বেশি স্থায়ী সম্পদবিশিষ্ট শিল্প ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখন থেকে জাতীয়করণকৃত বলে বিবেচিত এবং সরকারের মালিকানা ও কর্তৃত্বে নিয়ন্ত্রিত হয়ে পরিচালিত হবে।[১৪] জাতীয়করণের এই নীতির ফলে শিল্পে রাষ্ট্রীয় মালিকানার অংশ হঠাৎ করে ১৯৬৯-'৭০ সালে শতকরা ৩৪ ভাগ থেকে লাফিয়ে ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে শতকরা ৯২ ভাগে এসে পৌঁছে।[১৫] জাতীয়করণকৃত শিল্প-কারখানার অধিকাংশই ছিল সেসব অবাঙালি মালিকদের, যারা স্বাধীনতার আগে স্থানীয় অর্থনীতিতে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার করেছিল।[১৬]

শেখ মুজিবের শাসনব্যবস্থা বাংলাদেশের বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে উচ্চতর বুর্জোয়া শ্রেণীর অবস্থান স্থায়ীভাবে সুদৃঢ় করার উদ্যোগ মেনে না নিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। প্রশাসন তাই শিল্পখাতে ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ ২.৫ মিলিয়ন টাকা বিনিয়োগের সিলিং নির্ধারণ করে দেয়। ব্যক্তিগত বিনিয়োগের উপর সর্বোচ্চ সীমা ধার্য করার সিদ্ধান্ত খোদ আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বিতর্কের সৃষ্টি করে এবং অনেক প্রভাবশালী দলীয় নেতা সিলিং ব্যবস্থা রহিত করার জন্য এই বলে চাপ সৃষ্টি করেন যে, এর ফলে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাঙালি উদ্যোক্তাদের উৎসাহ দেয়া সম্ভব হবে না। আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামী লীগ সরকারের মধ্যে বর্ধিত বিতর্কের পর ১৯৭৪ সালে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক কাঠামোর মধ্যে দেশের শিল্পায়নে বেসরকারি শিল্প উদ্যোক্তাদের ভূমিকা সম্প্রসারণে সহায়তা করার লক্ষ্যে ব্যক্তিগতভাবে বিনিয়োগের সর্বোচ্চ সীমা ৩০ মিলিয়ন টাকায় উন্নীত করা হয়।

আর্থ-সামাজিক সংস্কার কর্মসূচির অংশ হিসেবে শেখ মুজিবের শাসনামলে কৃষি সংস্কারের প্রচেষ্টাও নেয়া হয়। ক্ষুদ্র কৃষকদের সন্তুষ্ট করার জন্য সরকার ১৯৭২ সালের আগষ্ট মাসে ভূমি দখল ও মালিকানা আদেশ জারি করে। উক্ত আইন অনুযায়ী পরিবার প্রতি ২৫ বিঘা (প্রায় ৮.৩ একর) পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়। ফলে ক্ষুদ্র কৃষকরা ভূমি রাজস্বের বোঝা থেকে রেহাই পাওয়ায় মুজিব শাসনের গণমুখী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। ভূমিহীন ও ক্ষুদ্র কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের জন্য সরকার জোতদার ও ধনী কৃষকদের উদ্বৃত্ত ভূমি অধিগ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৭২ সালের আগস্ট মাসে 'Landholdings (Limitation) Order' ঘোষণা করা হয়। যে আইনে পরিবার প্রতি সর্বোচ্চ একশ বিঘা (প্রায় ৩৩.৩ একর) পর্যন্ত জমির সিলিং নির্ধারণ করে দেয়া হয়। এবং যেসব পরিবারের একশ বিঘার অধিক জমি রয়েছে, তাদেরকে অতিরিক্ত জমির বিবরণ পেশ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সরকার অবশ্য অতিরিক্ত জমি সমর্পণ বাবদ খুবই সামান্য ক্ষতি পূরণ প্রদান করে।

সরকার গৃহীত আর্থ-সামাজিক নীতি ক্রমশঃ আওয়ামী লীগকে ব্যাপকভিত্তিক মানুষের রাজনৈতিক দলে পরিণত করে; যদিও এ দলের কার্যক্রমের সূচনা হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানী পুঁজিপতিদের কাছ থেকে বঞ্চিত বাঙালি বুর্জোয়াদের সমান অংশভাগ আদায়ে সংগ্রামকারী সংগঠন হিসেবে।[১৭] উৎপাদন ব্যবস্থায় বুর্জোয়াদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কমাতে এবং শ্রেণী শোষণ হ্রাসেও মুজিব সরকার দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। সরকারের আর্থ-সামাজিক নীতিমালা সে লক্ষ্যেই নিয়োজিত ছিল। সমালোচকদের মতে, আওয়ামী লীগ ছিল 'মধ্যবিত্তের সরকার' (Intermediate regime)। উচ্চবিত্তের বুর্জোয়া ও শোষিত জনগোষ্ঠীর মাঝামাঝি অবস্থিত মধ্যবিত্তের প্রতি সরকারের নীতিমালাগুলো ব্যাপক পক্ষপাতিত্ব করেছিল।[১৮]

৪.৩ প্রশাসনের অন্তঃকোন্দল

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর পরই শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, যেখানে আইন পরিষদের প্রতি দায়বদ্ধ মন্ত্রিসভার কাছে প্রকৃত শাসন ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল।[১৯] মনে করা হয় যে, সাংগঠনিক কাঠামো, নৈপুণ্য ও বিশেষজ্ঞতায় আওয়ামী লীগ সংসদীয় কার্যক্রমের প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি রচনা করেছে। ছাত্র, যুবক, কৃষক, শ্রমিকদের মধ্যে দলকেন্দ্রীক স্বার্থগোষ্ঠী স্বাধীনতার পূর্বেই গড়ে উঠেছিল- যাদের ছিল জনমতকে প্রভাবিত ও বাস্তবায়িত করার যোগ্যতা। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, স্বাধীনতার পূর্বে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের উচ্চ মর্যাদাভোগী আমলা-এলিট গোষ্ঠী ও রক্ষণশীলদের প্রতি বিরূপ ছিল। ফলে স্বাধীন দেশে সেই দল নীতিমালা প্রণয়নে আমলাতন্ত্রকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভূমিকায় নামিয়ে দেয়। এটা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ ছিল। কেননা, পাকিস্তানের আমলাতন্ত্রের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন ধারায় কর্তৃত্ব প্রদর্শনের শতাব্দীকালব্যাপী প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল, যা তারা ইংরেজ শাসন আমল থেকেই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে এসেছিল।

সমাজের একটি সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমলাতন্ত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর বেশ কিছু অন্তঃকোন্দলের কারণে শক্তিহীন হয়ে পড়ে। আমলাতন্ত্রের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও সংঘাত ছিল বিভিন্ন মাত্রা ও প্রকৃতির। প্রধান সংঘাত লক্ষ্য করা যায়, স্বাধীনতার সময় ভারতে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারে যারা যোগ দিয়েছিল, আর যারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর পক্ষে কাজ করেছিল, তাদের মধ্যে। প্রবাসী সরকারে যোগদানকারী বেসামরিক সরকারি কর্মচারীর সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০০ জন, যাদের অধিকাংশই ছিল নিম্নস্তরের। মাত্র ১৩ জন ছিল পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের (সিএসপি), ২ জন ছিল পাকিস্তান পুলিশ সার্ভিসের (পিএসপি) আর সামান্য কিছু সংখ্যক ছিল পূর্ব-পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের (ইপিসিএস) অন্তর্গত।[২০] যে ব্যাপক সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তা প্রবাসী সরকারে যোগ দেয়নি তাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে দালালির অভিযোগ এনে 'এক ঘরে' করা হয়। আর যে সকল কর্মকর্তা প্রবাসী সরকারে যোগ দিয়েছিল তাদেরকে আওয়ামী লীগ সরকার পুরস্কৃত করে। এমনকি, আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে যাদের সামাজিক যোগাযোগ ছিল তাদেরকে প্রচলিত চাকরির

নীতিমালা ভেঙে দ্রুত পদোন্নতি দেয়া হয়। কতিপয় আমলার প্রতি শাসক দলের পক্ষপাত এবং সামগ্রিক আমলাতন্ত্রের প্রতি সরকারের একচক্ষু নীতির ফলে অবশিষ্ট বিপুল সংখ্যক সরকারি কর্মকর্তাদের দারুণভাবে বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তোলে। বঞ্চিত কর্মকর্তারা যুক্তি দেখান যে, স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রতি পূর্ণ সমর্থন থাকার পরও তারা বন্দুকের মুখে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর সঙ্গে কাজ করতে বাধ্য হয়েছিল। "The distinction between those who submitted themselves to authority because of lack of choice and those who were active 'colaborators' with the military regime was often blurred".[২১] আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ আমলাতন্ত্রকে দুর্বল করে নীতি প্রণয়ন ধারায় দৃঢ় অবস্থান নেয়। কৌশলগত কারণে আওয়ামী লীগ সরকারি কর্মকর্তাদের 'দালাল' এবং 'দালাল-নয়' এই দুই ভাগে বিভক্ত করে।

আমলাতন্ত্রে অন্তঃদ্বন্দ্বের আরেকটি দিক ছিল প্রাক্তন সিএসপি সদস্য ও ইপিসিএস সদস্যদের মধ্যকার বৈরিতা। ইপিসিএসদের যুক্তি ছিল যে, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে সাবেক প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিস বা ইপিসিএস সদস্যগণ সঙ্গত কারণেই বাংলাদেশের জাতীয় সিভিল সার্ভিসে পরিণত হওয়ার দাবি রাখে। তারা আরো যুক্তি দেখায় যে, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কর্মসম্পাদনের ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য না থাকায় সিএসপি ও ইপিসিএস ক্যাডার দু'টি এক করে একক ক্যাডার সার্ভিস করতে হবে– যেখানে পদমর্যাদা ও পদোন্নতি নির্ধারিত হবে জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে। অন্যদিকে, সিএসপিদের বক্তব্য ছিল যে, ইপিসিএসরা প্রাদেশিক সিভিল সার্ভিসে যোগ দিয়েছিলেন কারণ তারা প্রতিযোগিতায় টিকে সিএসপিদের মতো এলিট ক্যাডারে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। সিএসপিরা পদোন্নতির ক্ষেত্রে জৈষ্ঠ্যতার বদলে যোগ্যতার পক্ষে জোরালো অবস্থান গ্রহণ করে। এবং এই দাবি জানায় যে, সচিবালয়ের নীতি প্রণয়ন পদের দুই-তৃতীয়াংশ সাবেক সিএসপি সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত থাকতে হবে।[২২] উল্লেখিত সংঘাত আমলাতন্ত্রের সংহতিকে দুর্বল করে; যে আমলাতন্ত্র একদা সরকারের সামগ্রিক কার্যক্রমে একচ্ছত্রভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন ও মর্যাদা ভোগ করেছিল। এলিট শ্রেণীর আমলাদের সংঘাতকে কাজে লাগিয়ে মুজিব সরকার বিদ্যমান আমলাতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন সাধনের প্রত্যয় ঘোষণা করে।

বিশেষজ্ঞ প্রশাসক ও সাধারণজ্ঞ প্রশাসকদের মধ্যকার শত্রুতা ও বিদ্বেষ ছিল আমলাতন্ত্রের আরো একটি প্রধান অন্তঃসংঘাতের কারণ। অবিভক্ত পাকিস্তানের ২৪ বছরব্যাপী শাসনে বিশেষজ্ঞ প্রশাসকরা নীতি–প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে 'অল রাউন্ডার' সাধারণজ্ঞ প্রশাসকদের বিরূপ সমালোচনা করেছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে এই সংঘাত নবরূপে দেখা দেয়। বিশেষজ্ঞ প্রশাসকরা যুক্তি দেখায় যে, স্বাধীন দেশের উন্নতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সাধারণজ্ঞদের গুরুত্ব দেয়ার ঔপনিবেশিক রীতি বাদ দিয়ে বিশেষজ্ঞদের মেধা ও জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। আমলাতন্ত্রের বহুমাত্রিক অন্তঃদ্বন্দ্ব ক্ষমতাসীন রাজনীতিকদের জন্য আশীর্বাদ হয়ে দেখা দেয়, ফলে আমলাদের চেয়ে রাজনীতিকদের শক্তি বৃদ্ধি পায়।

৪.৪ আওয়ামী লীগ ও কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তা

আমলাতন্ত্রের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য আওয়ামী লীগ সরকারি কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তার ক্ষেত্রে পরিকল্পিত হামলা চালানোর সুচিন্তিত পদক্ষেপ গ্রহণ করে। স্বাধীনতার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে টাঙ্গাইলে আয়োজিত এক জনসভায় শেখ মুজিব বলেন :

"আমি চাই সরকারি কর্মকর্তারা বাংলার মাটি থেকে দুর্নীতি ও অনিয়ম দূর করবে। আপনার চাকরির কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদি কাউকে দোষী পাওয়া যায় তবে তাকে একটি নোটিশ দিয়ে বলা হবে, আপনার চাকরির আর কোন প্রয়োজন নেই।"[২৩] এই প্রেক্ষাপটে কর্মচারীদের মধ্যে চাকরির নিরাপত্তাহীনতা তীব্র ভীতির সৃষ্টি করে। রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯-এর অধীনে সরকারি চাকরিজীবীদের বরখাস্ত বা চাকরিচ্যুত করার আইনগত ভিত্তি তৈরি করা হয়; যে আদেশ 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বার্থে', কোনো কারণ না দর্শিয়ে কিংবা আইনের আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ না দিয়ে চাকরিচ্যুতির ব্যবস্থা গৃহীত হয়। স্বাভাবিক কারণে এই আদেশ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মনে ভীতিকর প্রভাব বিস্তার করে। অনেকে অনিশ্চিত সরকারি চাকরি থেকে বেসরকারি সেক্টরে চাকরি নেয়ার কথা সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে। চাকরির নিরাপত্তাহীনতার কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কর্মস্থলে কোনো উদ্যোগ বা ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের বদলে প্রাত্যহিক রুটিন কর্তব্য সম্পাদনে ব্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯-এর আওতায় ১৯৭৪ সালের ১৪ জুলাই থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত তিন শতাধিক সরকারি কর্মচারীকে চাকরিচ্যুত করা হয়; যাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক ছিল উচ্চতর ক্যাডার সার্ভিসের সদস্য।[২৪]

১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধানে সরকারি কর্মচারীদের চাকরির নিরাপত্তার বিধান সম্পূর্ণরূপে রহিত করা হয়। পূর্বতন ১৯৫৬ এবং ১৯৬২ সালের পাকিস্তান সংবিধানে সরকারি কর্মচারীদের পূর্ণ মেয়াদকাল চাকরি করার নিশ্চয়তা লিপিবদ্ধ ছিল। উভয় সংবিধানের আওতায় কোনো সরকারি কর্মকর্তা রাষ্ট্রপতির সম্মতির ভিত্তিতে কর্মে নিয়োজিত থাকবেন।[২৫] ফলে একজন কর্মকর্তার চাকরিচ্যুতি বা পদাবনতি তার নিয়োগকর্তার (রাষ্ট্রপতি) নিম্নস্তরের কোনো কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে সম্ভব ছিল না[২৬] এবং কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আনীত কোনো অভিযোগের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো গ্রহণযোগ্য সুযোগ না দিয়ে কিংবা কোনো ফৌজদারি দণ্ড বা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কারণ ছাড়া চাকরিচ্যুতি সম্ভব ছিল না।[২৭] যদিও চাকরি সংক্রান্ত উল্লেখিত বিধি ১৯৭২-এর সংবিধানে সংযুক্ত ছিল[২৮] তবু তা চাকরির নিরাপত্তার ব্যাপারে ১৯৫৬ এবং ১৯৬২-এর সাংবিধানিক বিধানের সঙ্গে সুস্পষ্টভাবে পার্থক্যপূর্ণ ছিল। ১৯৫৬ এবং ১৯৬২-এর সংবিধানে চাকরিচ্যুতকরণ সংক্রান্ত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে কোনো উল্লেখ ছিল না। কিন্তু ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে পরিষ্কারভাবে বলা হয় যে, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ কাউকে চাকরিচ্যুত বা পদাবনতি করলে সেটাই হবে চূড়ান্ত।[২৯] সাংবিধানিক বিধির মূল লক্ষ্য ছিল, চাকরির নিরাপত্তাহীনতার ভীতি জাগ্রত করে আমলাতন্ত্রের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বহাল রাখা।

৪.৫ আমলাতন্ত্রে বিশেষজ্ঞদের একতরফা অন্তর্ভুক্তি

সরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর পদে সাধারণজ্ঞ এলিট প্রশাসকদের সংখ্যা পাকিস্তান আমলে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।[৩০] কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার অনুভব করে যে, সরকারি প্রতিষ্ঠানের উচ্চতর ব্যবস্থাপনা পদে সাধারণজ্ঞ প্রশাসকদের নিয়োগ উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের গতিশীল নেতৃত্ব ও ধারাবাহিকতার প্রয়োজন মেটাতে পারবে না। ফলে সরকারি প্রতিষ্ঠানে পেশাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের মূখ্য নির্বাহী পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বস্তুতঃ স্বাধীনতার পর জাতীয়করণ নীতি গৃহীত হলে এই প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পায়। সরকারি কর্পোরেশনে প্রাথমিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ৪৪ জন মূখ্য নির্বাহীর অতীত পেশাগত প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, এদের ৩৫ জনই পেশাজীবী বা ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞ আর বাকী ৯ জন সাধারণজ্ঞ প্রশাসক।[৩১] তবে, বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ প্রদানের সরকারি নীতি বেশি দিন টিকে থাকেনি। প্রাথমিকভাবে নিয়োগকৃত ৩৫ জন পেশাজীবী বিশেষজ্ঞের মধ্যে ১৬ জনকে তাৎক্ষিণকভাবে সরিয়ে দেয়া হয় এবং ১৬ জন সাধারণজ্ঞ প্রশাসককে তাদের পদে ফিরিয়ে আনা হয়।[৩২] এই প্রশাসনিক প্রতিস্থাপন থেকে 'অল রাউণ্ডার' সাধারণজ্ঞ প্রশাসকদের ঐতিহ্যগতভাবে উচ্চতর পদে আরোহণ রীতির পুনরাবির্ভাব লক্ষ্য করা যায়।

পাকিস্তান আমলে পরিকল্পনা কমিশন সরকারের অর্থনৈতিক নীতিমালা প্রণয়নের ক্ষেত্রে সম্মানজনক অবস্থান অর্জন করেছিল। পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনের নেতৃস্থানীয় পদগুলো ছিল প্রায় একচেটিয়াভাবে সাধারণজ্ঞ সিএসপি সদস্যদের দখলে। স্বাধীনতার পর নতুন সরকারের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনৈতিক নীতির প্রেক্ষিতে পরিকল্পনা কমিশনের গুরুত্ব আরো বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনা কমিশনের উপর যেসব দায়িত্ব ন্যস্ত হয় তার প্রধান কয়েকটি ছিল :

১। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা তৈরি;

২। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের প্রশাসনিক কর্তৃত্বাধীন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সম্পদ বণ্টন করা;

৩। পরিকল্পনার মূল্যায়ন ও বাস্তবায়ন ধারা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করে প্রশাসনিক সংস্থাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া;

৪। কার্যকর নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রয়োজনে অর্থনৈতিক জরিপ ও সমীক্ষা পরিচালনা করা; এবং

৫। পরিকল্পনা ও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ নির্ধারণ করা।[৩৩]

পরিকল্পনা কমিশনের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদপর্যাদা যথাক্রমে মন্ত্রি ও প্রতিমন্ত্রির সমপর্যায়ে উন্নীত করা হয়। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রি নিজে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকায় এবং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নীতি প্রসঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রাখার প্রেক্ষাপটে নীতিমালা প্রণয়ন পদ্ধতিতে পরিকল্পনা কমিশন আরো ক্ষমতাশালী ও নেতৃস্থানীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

পরিকল্পনা কমিশন থেকে সাধারণজ্ঞদের কর্তৃত্ব উচ্ছেদের লক্ষ্যে শেখ মুজিব ৪ জন একাডেমিক অর্থনীতিবিদকে কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে নিয়োগ দান করেন। পরিকল্পনা কমিশনের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ পদেও পেশাজীবীদের বহাল করা হয়। পেশাজীবীদের নিয়োগকে সাবেক সিএসপি সদস্যরা সরকারের উচ্চতর নীতি প্রণয়ন ক্ষেত্র থেকে সাধারণজ্ঞদের সরানোর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক ঐতিহ্যের অনাকাঙ্খিত পরিবর্তন বলে মনে করেন। সাধারণজ্ঞরা নীতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ পদে বিশেষজ্ঞদের নিয়োগকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেননি। তাদের ভাষায়, 'এইসব বহিরাগত' দীর্ঘকাল যাবত বাঙালি সিএসপি সদস্যরা অবাঙালিদের সঙ্গে উচ্চতর নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় যে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ভোগ করতো তা নষ্ট করেছে।[৩৪] পরিকল্পনা কমিশনের সম্মানজনক অবস্থা ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মপরিধিতে সাধারণজ্ঞদের হটিয়ে শীর্ষ পদে বিশেষজ্ঞ ও পেশাজীবীদের নিয়োগ দেওয়ার ফলে পরিকল্পনা কমিশন ও আমলাতন্ত্রে হিংসা ও বৈরিতার সৃষ্টি হয়। আমলাতন্ত্রের কাছে পরিকল্পনা কমিশন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে অভিহিত হয় এবং কমিশনের নীতি ও বিশ্লেষণকে বাস্তবতা বর্জিত বিদ্যায়নিক কার্যক্রম হিসেবে বিবেচনা করা হয়।[৩৫] একই সময়ে ও একই সঙ্গে নানা রকম পরিবর্তনের সুপারিশ উত্থাপনের জন্য আমলাতন্ত্র পরিকল্পনা কমিশনকে দোষারোপ করে। আমলাতন্ত্রের মতে, উক্ত কার্যক্রম ছিল পরিকল্পনা কমিশনের বাস্তবতা সম্পর্কিত জ্ঞান ও ব্যবহারিক প্রাজ্ঞতার অভাব প্রসূত।[৩৬] অন্যদিকে, আমলাতন্ত্রকে সামাজিক পরিবর্তনে বাহন বা উদ্যোক্তা করার ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিশনের ঘোরতর আপত্তি লক্ষ্য করা যায়।[৩৭] পরিকল্পনা কমিশন আমলাতন্ত্রের উচ্চমার্গীয় মনোভাবেরও কঠোর সমালোচনা করে। পরিকল্পনা কমিশন প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বলা হয় : The Government functionaries in Bangladesh are as much the product to socio-ecoovmic environment as any one else. They are eqully exposed to and affected by the social climate in the country. Indeed the heritage of the colonial structure and the past method of operations tend to influence him(sic) more than those who work outside the system. In independent Bangladesh, such alienation of the government functionary and people must be replaced by their positive identification with the common man.[৩৮]

পরিকল্পনা কমিশন ও আমলাতন্ত্রের মধ্যকার শত্রুতা ও হিংসার কারণে পরিকল্পনা কমিশনের উন্নয়ন কর্মসূচিতে আমলারা আন্তরিক সহযোগিতা প্রদান করেনি।[৩৯] এই দুই সংস্থার মধ্যে সম্পর্ক ভালো করার লক্ষ্যে ১৯৭৩ সালের শেষ দিকে সরকার একজন প্রবীণ সাধারণজ্ঞ প্রশাসককে পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য পদে নিয়োগ প্রদান করে। আশা করা হয়েছিল যে, সাধারণজ্ঞের অন্তর্ভুক্তির ফলে উত্তেজনা প্রশমিত হবে এবং সাধারণ প্রশাসকরা পরিকল্পনা কমিশনের উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কার্যকর সহযোগিতা দেবে। কিন্তু অবস্থার তেমন উন্নয়ন ঘটেনি। সাধারণজ্ঞ বনাম বিশেষজ্ঞ দ্বন্দ্ব নতুন রূপ লাভ করে। পরিকল্পনা কমিশনের ভেতরে একাডেমিক অর্থনীতিবিদ, যারা মূলতঃ বিশেষজ্ঞ, তাদের সঙ্গে সাধারণজ্ঞ বা আমলাতন্ত্রের সদস্যদের সংঘাত বহাল থাকে।[৪০]

৪.৬ প্রশাসনিক সংস্কার কর্মসূচি

স্বাধীনতার আগে ও পরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব বিদ্যমান আমলাতন্ত্রের ঔপনিবেশিক বৈশিষ্ট্যের সমালোচনা করেছিল। তাদের মতে, স্বাধীন দেশের সামগ্রিক গতিশীলতায় ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্র যথাযথ ভূমিকা পালন করতে পারবে না। নতুন দেশের উন্নয়ন ও গণমুখী কার্যক্রমের জন্য আওয়ামী লীগ পুরনো আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তনের প্রত্যয় ঘোষণা করে ।

৪.৭ প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি (এএসআরসি)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর পরই আওয়ামী লীগ সরকার প্রশাসনকে নতুনভাবে সাজিয়ে রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে সহায়ক আমলাতন্ত্র গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়। এবং ১৯৭২ সালের ১৫ মার্চ প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি (এএসআরসি) গঠন করে। খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীকে (এএসআরসি)-এর চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ দেয়া হয়। এ ছাড়া এই কমিটির সদস্য ছিলেন, পরিকল্পনা কমিশনের একজন প্রতিনিধি, একজন গণপরিষদ সদস্য (এমসিএ) ও একজন ঊর্ধ্বতন সরকারি আমলা (সাবেক সিএসপি)। এএসআরসি-এর কর্মক্ষেত্রের মধ্যে ছিল :

১. বিভিন্ন সংস্থা ও প্রশাসনে বিদ্যমান কাঠামো পরীক্ষা এবং সরকারের আনুষ্ঠানিক চাহিদাকে সামনে রেখে ভবিষ্যত কাঠামো নির্ধারণ করা;

২. বিভিন্ন ক্যাডার সার্ভিসকে ঐক্যবদ্ধ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় একীভূত করার বিষয় বিবেচনা;

৩. বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি কর্মচারীদের নিয়োগ পদ্ধতি নির্ধারণ করা;

৪. প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য লাগসই পরিকল্পনা প্রণয়ণ ও সুপারিশ প্রদান করা।[৪১]

প্রতিবেদন তৈরির জন্য এএসআরসি ১৮৩টি প্রশাসনিক সংস্থার প্রতিনিধিদের বক্তব্য গ্রহণ করে, ১৩ জন মন্ত্রির এবং ৫৫ জন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তা যেমন, সচিব, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান, সেক্টর কর্পোরেশন, ব্যাংক, বীমা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক–অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। প্রশাসন ও কর্ম কাঠামো সম্পর্কে সরাসরি জ্ঞান আহরণের জন্য এএসআরসি সদস্যরা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নে সরেজমিন সফরে গমন করেন। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে কমিটি প্রতিবেদনের একটি অংশ দাখিল করে। এএসআরসি প্রতিবেদনে, যা সাধারণভাবে চৌধুরী প্রতিবেদন নামে পরিচিত, বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামোর কঠোর সমালোচনা করে আমূল পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়। প্রতিবেদনে চাকরি প্রসঙ্গে বলা হয় : ... The existing services divided into too many distinct entities with artificial walls built around them with varying career prospects, lacking in professionalism and too much class and rank-oriented with very little opportunities to rise to the top for those who started their career in the lower

ranks. The service structure designed to serve a colonial, federal form of government within a capitalist framework was found unsuitable for the independent, socialist, democratic and unitary government and inadequete the meet the challenge of quick development and socialist reconstruction of the country.[৪২]

এআরএসসি প্রতিবেদনে প্রশাসন সম্পর্কে বলা হয় : ... The committee found the structure outmoded, the system sluggish and irresponsive to the people and the procedure complicated, confusing and ponderous... This implies shedding off the traditional class and status consciousness that has characterized civil service trained and brought up in the colonial traditions. With the new social philosophy of the state, it is now the responsibilty of the civil servants to demonstrate and assure the nation that their interest lies in serving the people and not in status and privileges for themselves.[৪৩]

এএসআরসি প্রতিবেদনে যুক্তরাজ্যের ফুলটন প্রতিবেদনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফুলটন প্রতিবেদনের মতো চৌধুরী প্রণীত এএসআরসি প্রতিবেদনে বাংলাদেশের আমলাতন্ত্রে মজ্জাগত শ্রেণী বিভক্ত চরিত্রের চরম সমালোচনা করা হয়।[৪৪] প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় : The civil servants are arranged in too many firm classes and too many special services with barriers between classes and services too high. Consequently, there is too much and too constant consciousness of ranks, class, title and service membership, too little consciousness of membership in the public service, and too little consciousness turning on particular job responsibilities. Rank has no significance except that it identifies responsibilities; here responsibility tends to become diluted and diffused, and rank exaggerated.[৪৫]

প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটির (এএসআরসি) প্রতিবেদনে প্রশাসনে কর্মরত সাবেক সিএসপি, ইপিসিএস ও অন্যান্য সার্ভিসের মধ্যে আরোপিত কৃত্রিম বিভক্তি মুছে ফেলার জোরালো সুপারিশ করা হয়। এএসআরসি সরকারি প্রশাসনে বিভিন্ন গ্রুপকে একক সম্মিলিত প্রশাসনিক সার্ভিসে পরিণত করার প্রস্তাব করে। বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মচারীদের দক্ষতা ও কাজের দায়িত্বের নিরিখে যথাযথ বেতন কাঠামোর কথাও প্রতিবেদনে বলা হয়।[৪৬] সমন্বিত প্রশাসনের বিকাশের স্বার্থে এএসআরসি গুরুত্বপূর্ণ পদ সাবেক সিএসপি সদস্যদের জন্য সংরক্ষিত রাখার বিধানকেও নাকচ করে দিয়ে যোগ্যতা অনুসারে গুরুত্বপূর্ণ পদ বন্টনের প্রতি বিশেষ জোর দেয়।[৪৭] মুজিব শাসনামলে প্রযুক্তিক বিকাশের কারণে কমিটি উচ্চতর প্রশাসনিক পর্যায়ে বিভিন্ন যোগ্যতা ও দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে। বলা হয় : Unalloyed generalism, with which we have been familiar, is losing its validity in several fields and is

progressively declining in importance.[৪৮] প্রতিবেদনে সুপারিশ করা হয় : That the preference for the generalist, pure and simple, should yield palce to a preference for those who have acquired competence in the concerned area.[৪৯] সরকারি কর্মকর্তাদের পদ প্রদানের নীতিমালা প্রসঙ্গে এএসআরসি প্রতিবেদনের মতামত ছিল : নীতিমালা হবে সঠিক পদে সঠিক লোক।[৫০] প্রতিবেদনে সুস্পষ্ট সুপারিশ ছিল : to provide opportunities for exceptionally talented persons to quickly move into upper levels, in fact from the lowest positions to the higher positions.[৫১] বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে যোগ্য, দক্ষ ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্তির পক্ষে মত দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকারি প্রশাসনে যোগ্যতাসম্পন্ন লোক পাওয়া না গেলে বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্র থেকে আমলাতন্ত্রের উচ্চতর পদে নিয়োগ দেয়া হবে।[৫২]

অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটির প্রতিবেদন বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে ছিল বৈপ্লবিক এবং এর লক্ষ্য ছিল বিদ্যমান আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন। প্রতিবেদনটি সাবেক সিএসপি সদস্যদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার বিপক্ষে মূল আঘাত হানে। ফলে সিএসপিদের পক্ষে এই প্রতিবেদন মেনে নেয়া সহজ ছিল না। কারণ এতে তাদের বিশেষ পরিচিতি লুপ্ত হয় এবং ঐতিহ্যগতভাবে উচ্চতর নীতি-প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক পদের কর্তৃত্ব থেকে তাদের হটিয়ে দেয়া হয়। অন্যদিকে, প্রতিবেদনটি বিশেষজ্ঞদের কাছে সাদরে গৃহীত হয়– যারা স্বাধীনতার পূর্বেকার সাধারণজ্ঞদের একচ্ছত্র দাপটের বিরোধী ছিল। ঔপনিবেশিক ধাঁচের আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সোচ্চার অবস্থানের প্রেক্ষাপটে আশা করা হয়েছিল যে, এএসআরসি প্রতিবেদন সরকার আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবে এবং যথাযথভাবে সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করবে।

সরকারের বিবেচনার জন্য এএসআরসি প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশ ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে হস্তান্তর করা হয়। প্রতিবেদনের এই অংশে সচিবালয় ব্যবস্থা ও এর কাজের পদ্ধতি, মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সংগঠন এবং জেলা ও স্থানীয় সরকার প্রশাসন সম্পর্কে সুপারিশ ছিল। এএসআরসি অনুধাবন করে যে : the secretarial system, as it has been operating in Bangladesh, is based on the premise that policy and execution are divisible and the secretariat is concerned only with the former and the programme departments exclusively with the latter.[৫৩] এই প্রসঙ্গে এএসআরসি সদস্যরা ভারতের হানুমানথিয়া কমিশনের সঙ্গে একমত পোষণ করেন : The secretariat system of work has lent balance, consistence and continuity to the administration and served as a nucleus for the total machinery of a ministry. It has facilitated inter-ministry co-ordinaion and accountability to parliament at the ministerial level. As an institutionalised system, it is indispensable for the proper functioning of government.[৫৪]

সে যাই হোক, সচিবালয় ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য ত্রুটি সম্পর্কে এএসআরসি অবগত ছিল। যে সকল ত্রুটি রিচার্ড টটেনহাম কর্তৃক বহু আগেই চিহ্নিত হয়েছিল এই বলে যে : "অতিরিক্ত নোটগ্রহণ ও ফাইল চালনা, যার সার্বিক ফলশ্রুতি অদক্ষতা ও বিলম্ব।"[৫৫] চৌধুরী রিপোর্টে তাই এই সুপারিশ করা হয় যে, উন্নয়নের আওতাভুক্ত দফতর বা নির্বাহী বিভাগ যেমন কৃষি, পশুপালন, মৎস্য, সমবায়, পল্লী উন্নয়ন, সেচ ও শক্তি, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সমাজসেবা প্রভৃতি সচিবালয়ের সঙ্গে একীভূত হওয়া উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে, যেখানে সরকারি কাজকর্ম মূলতঃ নিয়ামক প্রকৃতির কিংবা প্রশিক্ষণ, জরিপ অথবা গবেষণাকেন্দ্রীক-সেসব ক্ষেত্রে বর্তমান ব্যবস্থা অব্যাহত থাকতে পারে।[৫৬] দ্রুত ও দক্ষ সেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিটি রিপোর্টে দাফতরিক প্রতিষ্ঠান ও এর কাজকর্মের পুনর্গঠনের সুপারিশ করা হয়।[৫৭] কমিটি তাদের রিপোর্টে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের পুনর্গঠনেরও সুপারিশ করে। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদের (১) ধারা অনুযায়ী কমিটি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রচলনের সুপারিশ জানিয়ে জেলা, থানা (মহকুমা), ইউনিয়ন ও জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব করে।[৫৮] জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান প্রচলনের উদ্দেশ্য ছিল প্রশাসনিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং নিজস্ব সামাজিক কার্যক্রমের ব্যবস্থাপনায় স্ব স্ব অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ।

৪.৮ বাস্তবায়নবিহীন (এএসআরসি) রিপোর্ট

এএসআরসি রিপোর্ট দেশের বুদ্ধিজীবী মহলের ভূয়সী প্রশংসা অর্জন করে। আশা করা হয়েছিল যে, এ রিপোর্টের সুপারিশমালা গৃহীত ও বাস্তবায়িত হবে। যদিও বাস্তবতার অবস্থান ছিল আকাঙ্ক্ষার ঠিক বিপরীতে। এএসআরসি রিপোর্টকে ফাইল বন্দি ও গোপনীয় বিষয়ে পরিণত করে রাখা হয়।

অধ্যাপক চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রণীত এএসআরসি রিপোর্ট কেন বাস্তবায়িত হয়নি তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে। অথবা অন্য কথায়, কেন মুজিব সরকার ঔপনিবেশিক আমলের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তা তলিয়ে দেখা যেতে পারে। স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যের পর এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, জনগণের মধ্যে আওয়ামী লীগের ভবিষ্যত জনপ্রিয়তা ব্যাপক মাত্রায় নির্ভর করবে অর্থনৈতিক খাতে দলের কৃতিত্ব এবং জাতীয় গুরুত্বের মৌলিক বিষয়গুলোতে বৃহত্তর ঐকমত্য অর্জনের ওপর। শেখ মুজিবের নেতৃত্বে নতুন শাসকগোষ্ঠী প্রাথমিক বছরগুলোতে সাফল্যের সঙ্গে কিছু অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় মূলতঃ জাতিসংঘ, বন্ধুপ্রতীম রাষ্ট্র ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার ব্যাপক ত্রাণ সাহায্যের কারণে। কিন্তু সামগ্রিক অর্থনৈতিক সংকট স্থায়ীভাবে মোকাবিলা করা সম্ভব হয়নি। নিত্য ব্যবহার্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রীর মূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিল্প—কারখানা ও কৃষি ক্ষেত্রের উৎপাদন স্বাধীনতার পূর্বেকার (১৯৬৯-৭০) পর্যায়ে উত্তরণ করা সম্ভব হয়নি। মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ১৯৭২-৭৩ সালে এসে ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানের শেষ

স্বাভাবিক বছরের (১৯৬৯-৭০) তুলনায় প্রকৃত অর্থে ১২-১৪% ভাগ কমে যায়। অনুরূপভাবে, মাথাপিছু জিডিপি ১৯৭২-৭৩ সালে ১৯৬৯-৭০ সালের চেয়ে এক-পঞ্চমাংশ কম ছিল।[৫৯] দেশের মানুষের প্রধান খাদ্য ধানের উৎপাদন ১৯৭২-৭৩ সালে ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় ১৫% ভাগ কম ছিল।[৬০] ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় শিল্প উৎপাদন ১৯৭২-৭৩ সালে প্রায় ৩০% ভাগ হ্রাস পায়। ১৯৬৯-৭০ সালের সামগ্রিক শিল্প-উৎপাদনের নিরিখে ১৯৭২-৭৩ সালে অবনতিশীল পরিস্থিতিতে দেখা যায় : পাট শিল্পে উৎপাদন শতকরা ২৮ ভাগ, বস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রে সূতা উৎপাদন ২৩% ভাগ ও কাপড়ে ৩% ভাগ কম ছিল। এবং চিনি উৎপাদন হয়েছিল মাত্র পঞ্চমাংশ।[৬১] ১৯৭২-৭৩ সালে দেশের রফতানী ১৯৬৯-৭০ সালের তুলনায় প্রায় শতকরা ৩০ ভাগ কমে গিয়েছিল।[৬২]

শেখ মুজিবের শাসনাধীন বাংলাদেশের সূচনা-পর্বে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে চরম হতাশাজনক পরিস্থিতির পেছনে বহু কারণ ছিল। প্রথমত, মুজিব সরকারের রাষ্ট্রীয়করণ নীতির কারণে সকল বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ ও মালিকানা সরাসরি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে চলে আসে। কিন্তু রাষ্ট্র এসবের যথাযথ ব্যবস্থাপনা করতে পারেনি। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে, কোন ব্যবস্থাপনা জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা না থাকার পরেও আওয়ামী লীগের উঁচু মহলে ভালো সম্পর্ক ও যোগাযোগ থাকার কারণে একদল লোক রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ লাভ করে। এ সকল লোকজন সরকার দলের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পাঞ্চল দখল করে সম্ভাব্য সকল উপায়ে পদ-পদবীর জোরে নিজেদের ভবিষ্যত অর্থনৈতিক ভাগ্য গড়ে তুলতে চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালায়। অযোগ্য প্রশাসনের সঙ্গে খুচরা যন্ত্রাংশের অপর্যাপ্ততা, কাঁচামালের অভাব ও ব্যাপক শ্রমিক অসন্তোষ রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় হ্রাস করে। দ্বিতীয়ত, দেশের নাজুক অর্থনৈতিক সম্পদের এক বড়ো অংশ মুনাফালোভী ব্যবসায়ীরা ভারতে পাচার করতে থাকে। দেশের প্রধান রফতানী আয়ের উৎস পাট এবং খাদ্যশস্য পাচার করা একটি প্রাতিষ্ঠানিক বাণিজ্যে পরিণত হয়। চোরাচালান নির্ভর এসব অবৈধ ব্যবসা বন্ধের জন্য মুজিব সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়ে পড়ে। ১৯৭৩-৭৪ অর্থবছরে পনের লক্ষ টন ধান ও আট লক্ষ টন চাল ভারতে পাচার হয়ে যায়।[৬৩] চোরাচালানের ফলে দেশের বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনে ব্যাপক অবনতি ঘটে এবং খাদ্য ঘাটতি দেখা যায়। এসব কারণ ছাড়াও, অপর্যাপ্ত মুদ্রা সরবরাহ ও অর্থের ঘাটতি দেশের দুর্বল অর্থনৈতিক অবস্থার পেছনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে। ১৯৭৩-৭৪ সালের বার্ষিক পরিকল্পনা রিপোর্টে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন স্বীকার করে যে :

"দেশের কঠিন অর্থনৈতিক পরিস্থিতি জনগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত করছে। বিশেষভাবে ভূমিহীন গ্রামীণ শ্রমজীবী এবং ব্যাপকভাবে শহুরে জনগণ এই পরিস্থিতির শিকার। নিত্য ব্যবহার্য মৌলিক সামগ্রীর অপর্যাপ্ততা ও উচ্চমূল্য সামগ্রিক সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছে।"[৬৪]

১৯৭৪ সালের জুন মাসে শেখ মুজিবের অর্থমন্ত্রি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন যে : অর্থনীতি বিধ্বস্ত হওয়ায় ১৯৭৩-৭৪ সালের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।[৬৫]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুজিব শাসনের দুর্বলতা অচিরেই শাসকদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিক্ষোভ ও বিরোধিতা দানা বেঁধে তোলে। প্রথম রাজনৈতিক বিরোধিতা আসে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল 'জাসদ'-এর পক্ষ থেকে। স্বাধীনতার পর পরই জাসদ গঠিত হয় আওয়ামী লীগের বিক্ষুব্ধ-ভিন্ন মতাবলম্বী ছাত্র ও শ্রমিক ফ্রন্টের উদ্যোগে। নবগঠিত রাজনৈতিক দল জাসদ-এর প্রধান মতাদর্শ ছিল 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র'-যা দলের নেতা ও কর্মীদের মতে দেশের বিরাজমান জটিল সমস্যা উত্তরণের একমাত্র সমাধান। জাসদ ব্যাপক সাফল্যের সঙ্গে গ্রাম ও শহরের জনতার গণসমর্থন আদায় করতে সক্ষম হয়। দলের ছাত্রফ্রন্ট দেশের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করে। মুজিব শাসনের বিরুদ্ধে আরেকটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বিরোধিতা গড়ে তোলে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি–ন্যাপ, যার নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা ভাসানীর মতো অশীতিপর নেতা–যিনি স্বাধীনতার পূর্বে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করেছিলেন। ন্যাপ-ভাসানী চীনপন্থী দল হিসেবে পরিচিত ছিল এবং দলটি শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকারকে 'রুশ-ভারতীয় সামাজিক-সম্প্রসারণবাদের হাতের পুতুল' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল।

মুজিব শাসনামলে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার প্রতি সবচে' মারাত্মক আঘাত এসেছিল বিদ্যমান সমাজ কাঠামোর আমূল পরিবর্তনে বিশ্বাসী সশস্ত্র বৈপ্লবিক শক্তিগুলো থেকে। আত্মগোপনকারী এসব দল নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিল না। বরং বাঙালি বুর্জোয়া শ্রেণীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম করে শ্রেণীহীন সমাজ গঠনে তারা দৃঢ়ভাবে আস্থাশীল ছিল। এসব বৈপ্লবিক দলগুলো মনে করতো যে, স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব' সম্পন্ন হতে এবং শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্বে শোষণমুক্ত শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় বাঁধা সৃষ্টি করা। গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে মুজিব সরকারকে উচ্ছেদ করে অসমাপ্ত বিপ্লবকে সম্পন্ন করতে বৈপ্লবিক দলগুলো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল।[৬৬] আত্মগোপনকারী বৈপ্লবিক দলগুলোর সশস্ত্র কর্মীরা আওয়ামী লীগ কর্মীদের হত্যা, ব্যাংক–বাজার, ধনী গৃহস্থ গৃহে লুটতরাজ এবং থানা ও পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ শুরু করে।[৬৭] ১৯৭৩ সালের প্রায় প্রতিদিনই এ ধরনের সহিংসতার খবর সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে থাকে। আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী, ধনী কৃষক ও ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য শ্রেণীর যারা 'বিপ্লবের শত্রু' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল, তারা চরমপন্থীদের আক্রমণের মুখে জান ও মালের চূড়ান্ত নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হয়। বৈপ্লবিক দলের কর্মকাণ্ড ঠেকাতে মুজিব সরকারের পক্ষে বেশ কিছু কঠোর ব্যবস্থা গৃহীত হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইন জারি করা হয়। বিশেষ আদালত স্থাপন, আধা–সামরিক জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠন ও সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু চরমপন্থীদের তৎপরতা বন্ধ করতে সরকারের সকল উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

মুজিব সরকারের মাথা ব্যথার প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি। স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালে মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে অবাধে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করা হয়। স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবের সরকার হুমকি ও পুরস্কারের মিশ্রনীতি গ্রহণ করে বহু মুক্তিযোদ্ধার অস্ত্র ও গোলাবারুদ জমা নেয়। কিন্তু ব্যাপকভাবে বিশ্বাস জন্মে যে, উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরকারের কাছে জমা না দিয়ে লুকিয়ে ফেলা হয়। এ সকল অস্ত্র অব্যাহতভাবে ব্যবহার করে দুষ্কৃতকারীরা দেশব্যাপী হত্যা-রাহাজানি-লুটতরাজ চালায়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে পরিস্থিতির এতোই অবনতি ঘটে যে, সেখানে জনগণ ডাকাত ও দুষ্কৃতকারীদের ভয়ে বিনিদ্র রজনী কাটাতে থাকে।[৬৮] জীবন বাঁচাতে বহু ধনী গৃহস্থ গ্রামবাসী শহরের কেন্দ্রস্থলে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে। ক্রমবর্ধমান অরাজকতা জনগণের মধ্যে মুজিব শাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা দুর্বল করে ফেলে। অথচ এই জনগণই জাতীয়তাবাদী স্বাধীকার আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগের পেছনে সুসংহতভাবে অবস্থান নিয়েছিল। দেশের বিরোধী দলসমূহ জাতিকে আসন্ন প্রলয় থেকে বাঁচানোর লক্ষ্যে 'অকার্যকর ও দুর্নীতিগ্রস্ত, মুজিব সরকারের পদত্যাগ এবং 'জাতীয় সরকার' গঠনের দাবি জানাতে থাকে।

এএসআরসি গঠন করা হয়েছিল মুজিব সরকারের আনন্দমুখর সময়ে যখন বিদ্যমান আমলাতন্ত্রের কাঠামো ও কার্যকারিতায় সারগর্ভ পরিবর্তন আনয়নে আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না। কিন্তু সরকারের কাছে এএসআরসি রিপোর্ট জমা দেয়ার সময় দেশের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি তীব্রভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। যদিও সে সময় পর্যন্ত মুজিবের সম্মোহনী ক্যারিশমা বজায় ছিল, তবুও সেটা ছিল সামান্য নিষ্প্রভ। দেশের অর্থনীতি ছিল অত্যাসন্ন পতনের দ্বার প্রান্তে, র‍্যাডিক্যাল বৈপ্লবিক সশস্ত্র শক্তির পক্ষ হতে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামোর প্রতি কার্যকর চ্যালেঞ্জ জানানো হচ্ছিল এবং অসামাজিক বেআইনী গোষ্ঠীকে দমনে আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অযোগ্যতা প্রমাণিত হয়েছিল। মুজিব সরকার সে অবস্থায় দেশের দুর্বল অর্থনীতিকে বাঁচাতে, আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুনর্রুদ্ধারে এবং সামাজিক অস্থিতিশীলতা কমিয়ে আনতে ক্রমান্বয়ে আমলাতন্ত্রের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। শেখ মুজিব নিজে এবং তার সরকারের মধ্যকার কাছের লোকজন বুঝেছিলেন যে, আমলাতন্ত্রের কার্যকরী সহযোগিতা ছাড়া আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অসম্ভব। ইতোমধ্যে ক্ষুব্ধ আমলাতন্ত্রকে আরো বিরক্ত করা হবে সরকারের জন্য আত্মহত্যার শামিল। ফলে মুজিব সরকার এএসআরসি রিপোর্ট বাস্তবায়ন না করবার সিদ্ধান্ত নেয়।

৪.৯ জাতীয় মজুরি কমিশন (এনপিসি)

এএসআরসি'কে নিয়োগ করবার পরপরই আওয়ামী লীগ সরকারি কর্মচারীদের বেতন কাঠামো পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৯৭২ সালের ২১ জুলাই শেখ মুজিবের সরকার জাতীয় মজুরি কমিশন (এনপিসি) গঠন করে, যার প্রধান ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত আমলা আবদুর রব, যিনি ১৯৪৭ সালের পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের 'বেঙ্গল সিভিল সার্ভিস'-এর সদস্য ছিলেন।[৬৯] এনপিসির পূর্ণকালীন সদস্য হিসেবে ছিলেন

একজন ব্যাঙ্কার, একজন অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা ও একজন একাডেমিক প্রকৌশলী এবং খণ্ডকালীন সদস্যের মধ্যে ছিলেন একজন অর্থনীতিবিদ, একজন প্রবীণ আমলা, একজন উচ্চ পদস্থ সেনা কর্মকর্তা ও একজন চার্টার্ড একাউন্টেন্ট। জাতীয় মজুরি কমিশনকে সরকারি খাতের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল কর্মচারীর বিদ্যমান বেতন কাঠামো সমন্বিতভাবে পর্যালোচনা এবং সকল সরকারি খাতকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি জাতীয় মজুরি/বেতন কাঠামোর সুপারিশ করতে বলা হয়।[৭০] প্রতিবেদন তৈরির সময় কতিপয় বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার জন্য এনপিসি'কে পরামর্শ দেয়া হয়। এগুলো হলো জীবন যাত্রার মান, সরকারের সম্পদ, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন বেতনপ্রাপ্তদের মধ্যে বৈষম্য কমানোর প্রয়োজনীয়তা, সরকারি খাতে মেধাবী, কারিগরি ও পেশাগতভাবে যোগ্য লোকদের আকৃষ্ট করা ও ধরে রাখার উদ্যোগ, যোগ্যতার শর্তাবলী প্রণয়ন, কাজের জন্য উৎসাহ প্রদান এবং বিভিন্ন পেশা ও বৃত্তির মধ্যে চাহিদা ও সরবরাহ বজায় রাখা।[৭১] এএসআরসি'র ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করার জন্য এনপিসি'কে বিশেষভাবে পরামর্শ দেয়া হয়। কারণ এতে সমগ্র পুনর্গঠন পরিকল্পনা ভালোভাবে ছন্দবদ্ধ হবে। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক দেশের পরিস্থিতি ও মজুরি পরিকল্পনা নিবিড়ভাবে অনুধাবনের জন্যে এনপিসি'র তিনজন সদস্যকে বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও পূর্ব জার্মানিতে পাঠানো হয়।

এনপিসি'র উপর অর্পিত দায়–দায়িত্ব ছিল প্রচুর। কারণ 'প্রায় ২২০০ বেতন স্কেলের, যার প্রতি স্তরে কর্মচারী ছিল কয়েক শত–নৈরাজ্যপূর্ণ বিশৃঙ্খলার মধ্যে একটি যৌক্তিক মজুরি কাঠামোর সুপারিশ করার মতো হতবুদ্ধিকর কাজের মুখোমুখি হয়েছিল কমিশন।'[৭২] এনপিসি'র সবচে' কঠিন কাজ ছিল, পাকিস্তানী শাসকদের সৃষ্ট ও চক্রান্ত মূলকভাবে অনুসৃত উচ্চতর ও নিম্নতর বেতনপ্রাপ্ত কর্মচারীদের মধ্যে বিরাট ব্যবধান কমিয়ে আনা। প্রাসঙ্গিক সামাজিক, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, নৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবেচনার পর এনপিসি মজুরি পরিকল্পনার নীতিমালা নির্ধারণ করে– যা চাকরিদাতা এবং চাকরিজীবীর জন্য নিরপেক্ষ ছিল। ১৯৭৩ সালে ১৮ মে কমিশন সরকারের কাছে রিপোর্ট দাখিল করে।

বিদ্যমান পদগুলোকে দশটি জাতীয় গ্রেডে সংগঠিত করার এএসআরসি সুপারিশের অনুগামী হয়ে এনপিসি তার রিপোর্টে দশটি গ্রেডের জন্য মজুরি/বেতন ও অনান্য সুবিধাদির প্রস্তাব করে। উচ্চতর ও নিম্নতরদের মধ্যকার অন্যায্য বিরাট ব্যবধান কমিয়ে আনার লক্ষ্যে এনপিসি রিপোর্ট এই নীতিমালা অনুসরণ করে যে, 'সর্বনিম্ন বেতন নির্ধারিত হবে বাঁচার জন্য যা প্রয়োজন, তা দ্বারা', এবং 'সর্বোচ্চ বেতন হবে সর্বোচ্চ বেতনের গ্রহণযোগ্য গুনিতক।'[৭৩] এভাবে এনপিসি রিপোর্ট তলদেশ বা প্রারম্ভিক মাসিক মজুরি ধার্য করে ১৩০-১৪০ টাকা; এবং সর্বোচ্চ স্তরে প্রতিমাসে নির্ধারিত ২০০০ টাকা।[৭৪] সর্বোচ্চ স্তর (সাবেক সিএসপি সচিব) ও সর্বনিম্ন স্তরের (পিয়ন) বেতন বৈষম্য এভাবে ১ : ২৮.১ অনুপাত থেকে কমিয়ে ১ : ১১.৫ অনুপাতে নিয়ে আসা হয়।[৭৫] কমিশন আরো সুপারিশ করে যে, নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর উচ্চমূল্যের কারণে কর্মচারীদের মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়া উচিত।

অতীতের বহু প্রশাসনিক ও বেতন/মজুরি সংস্কার প্রস্তাবের মতো না হয়ে এনপিসি রিপোর্ট সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। কিন্তু সিনিয়র আমলাদের প্রতিরোধের মুখে এনপিসি সুপারিশমালা বাস্তবায়ন করা অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। তারা মনে করেন যে, এনপিসি রিপোর্ট তাদের স্বার্থের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। মুজিব সরকারকে এর ফলে বাধ্য হয়ে আংশিকভাবে সুপারিশ বাস্তবায়িত করতে হয়। দশম থেকে পঞ্চম গ্রেডের কর্মচারীদের বেতন স্কেল কার্যকর করা হয়। এবং উচ্চতর চার গ্রেডের বেতন স্কেল বাস্তবায়নহীন অবস্থায় থাকে। এটা অনুধাবন করা যায় যে :

"উচ্চতর বেতন গ্রেড সফল বাস্তবায়ন না হওয়ার পেছনে সিনিয়র আমলাদের (বিশেষ করে প্রাক্তন সিএসপি ও ইপিসিএস) নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের লক্ষ্যে পরিচালিত তদ্বির কাজ করেছিল। তারা আকর্ষণীয় হারে নিজেদের বেতন ও আনুষঙ্গিক প্রান্তিক সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির দাবি করেছিলেন এবং তাদের জন্য কম বেতন সুপারিশ করার জন্য এনপিসির ওপর ক্ষুব্ধ ছিলেন। দেশে বড়ো ধরনের কর্মচারী নীতি বাস্তবায়নে ঐসব সিনিয়র আমলাদের অপ্রতিহত নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি এ ঘটনা থেকে বুঝা যায়।"[৭৬]

১৯৭৩ সালের মে মাসে এনপিসি রিপোর্ট জমা দেয়ার সময় দেশের বিদ্যমান আর্থ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যথেষ্ট অনুকূলে না থাকায় মুজিব সরকার এটা বাস্তবায়নে খুব একটা অনমনীয় ভূমিকা নিতে পারেনি। এ পরিস্থিতিতে সিনিয়র আমলারা উচ্চতর গ্রেডের জন্য এনপিসি প্রস্তাবিত বেতন স্কেল বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে নিজস্ব স্বার্থ হাসিলের কৌশল কাজে লাগিয়েছিল।

৪.১০ দ্বিতীয় বিপ্লব: বাকশাল

আওয়ামী লীগ শাসনের 'অযোগ্য ও দুর্নীতিগ্রস্ত' কার্যক্রমের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক ও সশস্ত্র বিরোধিতার প্রেক্ষিতে মুজিব প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করতে থাকেন। সরকারের তরফ থেকে সংবাদপত্রের স্বাধীন মতামত প্রকাশে বাঁধা দেয়া হয়। বিপুল সংখ্যক বিরোধী দলীয় সংবাদপত্রের অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেয়া হয়। বিরোধী দলের অসংখ্য নেতা ও কর্মীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। বিরোধী পক্ষকে সমূলে উৎপাটন করার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বর মাসে মুজিব সরকার সারা দেশে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণা করে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বর্ণিত নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ রহিত করা হয়। আত্মগোপনকারী বৈপ্লবিক দলগুলোর বিরুদ্ধে দমনমূলক কঠোর কার্যক্রম নেয়া হয়। জরুরি অবস্থার ফলে আমলাতন্ত্রের ঊর্ধ্বতন সদস্যরা–যারা স্বাধীনতার সময় থেকে নিম্ন অবস্থানে বহাল ছিল–হঠাৎ পাদপ্রদীপের উজ্জ্বল আলোয় ওঠে আসলেন। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত উদ্যোগে দেশের সংবিধান আমূলে সংশোধন করা হলো এবং এ ব্যাপারে বহু ঘনিষ্ঠ সহযোগীর ব্যক্তিগত বিরূপ মনোভাবকেও কোনোরূপ তোয়াক্কা করা হয়নি। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে বাংলাদেশেও বহু আফ্রো-এশিয় দেশের মতো একদলীয় রাষ্ট্রপতির শাসন ব্যবস্থা জারি হলো। সংবিধানের সংশোধন মুজিবের ভাষায় চিহ্নিত হয় 'দ্বিতীয় বিপ্লব'-এর সূচনা হিসেবে; যার মূল লক্ষ্য হিসেবে বলা হলো 'শোষিতের জন্য গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা।[৭৭]

শেখ মুজিব সে সময় বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হলেন এবং ১৯৭৫ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে তিনি বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ, 'বাকশাল'–এর গঠনতন্ত্র ঘোষণা করলেন; বাকশাল ছিল সংশোধিত রাষ্ট্রীয় সংবিধানের আওতায় বৈধভাবে কাজ করার যোগ্য একমাত্র রাজনৈতিক দল। শেখ মুজিব নিজেই 'বাকশাল'-এর কেন্দ্রীয় কমিটি ও কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যদের মনোনয়ন দিলেন।[৭৮] বাকশাল-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের পেশাগত প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে এই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সংবিধান সংশোধনের পর শেখ মুজিব 'বুর্জোয়া এলিট' দের ওপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। 'বাকশাল' কেন্দ্রীয় কমিটির ১১৫ জন সদস্যের মধ্যে ২১ জনের ছিল সামরিক–বেসামরিক আমলাতান্ত্রিক অতীত প্রেক্ষাপট। উল্লেখিত ২১ জন সদস্যের মধ্যে ৯ জন ছিলেন প্রাক্তন সিএসপি, ৪ জন ছিলেন উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা, একজন ছিলেন সিনিয়র পুলিশ কর্মকর্তা এবং অপর ৭ জন ছিলেন অন্যান্য সার্ভিসের সদস্য।[৭৯]

শেখ মুজিবের 'দ্বিতীয় বিপ্লব'–এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল এমন পরিকল্পনা, যার মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত 'জেলা গভর্নর'দের দ্বারা জেলা পর্যায়ের আমলাতন্ত্রকে দলীয় কর্তৃত্বে দাসভাবাপন্ন রাখা যায়। মুজিব বলেছিলেন যে :

ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক ঐতিহ্যের অবসানের লক্ষ্যে প্রশাসনিক পরিবর্তনের পরিকল্পনা, যা প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতার উদ্ভব ঘটাবে এবং ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করবে।[৮০] মুজিবের পরিকল্পনাকে মনে করা হয় ক্যারিয়ার সিভিল সার্ভেন্টদের বিরুদ্ধে মারাত্মক আঘাত, যারা অবিভক্ত ভারতে ইংরেজ শাসনের সূচনালগ্ন থেকে জেলা পর্যায়ের প্রশাসনের ওপর নিরংকুশ নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছিল। ইংরেজ ও পাকিস্তানী শাসনামলে জেলা প্রশাসনের প্রধান ছিলেন একজন 'ক্যারিয়ার সিভিল সার্ভেন্ট' এবং সমগ্র জেলা প্রশাসন তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হতো। তাঁকে চিহ্নিত করা হতো জেলা প্রশাসনের 'কেন্দ্রীয় চরিত্র', 'মূল কেন্দ্র', 'চাবিকাঠি', 'প্রধান স্তম্ভ', 'মেরুদণ্ড', 'স্নায়ুকেন্দ্র' হিসেবে।[৮১]

শেখ মুজিবের নতুন পরিকল্পনায় ক্যারিয়ার সিভিল সার্ভেন্টদের ভূমিকা কঠোরভাবে হ্রাস করে রাজনীতিবিদদেরকে জেলা প্রশাসনের সম্মুখভাগে নিয়ে আসার প্রস্তাব করা হয়। রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত জেলা গভর্নরদের সপক্ষে নেয়া পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ হিসেবে মুজিব ১৯৭৫ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিদ্যমান ১৯টি প্রশাসনিক জেলার স্থলে ৬১টি জেলা সৃষ্টি করেন। পরবর্তী মাসে তিনি ৬১ জন হবু গভর্নরের নাম ঘোষণা করেন, যারা সেপ্টেম্বর মাস থেকে জেলা প্রশাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে নির্ধারিত হয়। তবে মজার ব্যাপার হলো যে, গভর্নদের মধ্যে ১৪ জন ছিলেন আমলাতান্ত্রিক অতীত প্রেক্ষাপটের অধিকারী, রাজনীতিবিদ নন। বরং এদের ৯ জন ছিলেন সাবেক সিএসপি, একজন সামরিক কর্মকর্তা ও চারজন ছিলেন অন্যান্য সরকারি সার্ভিসের।[৮২] এই পরিস্থিতি প্রমাণ করে, ঔপনিবেশিক প্রশাসনিক কাঠামো ধ্বংসের জন্য মুজিবের জাঁকজমকপূর্ণ উদ্যোগ সত্ত্বেও তিনি যথার্থই বুঝতে পেরেছিলেন যে, ঊর্ধ্বতন আমলাদের বিগড়ে দিয়ে তিনি কোনো কিছু অর্জনের চেয়ে হারিয়েছেন বেশি।

৪.১১ উপসংহার: অপ্রাপ্তির যন্ত্রণাদগ্ধ প্রত্যাশা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এটা প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে, মজ্জাগত ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর আগাগোড়া পরিবর্তন আনয়নে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার সফল হবে। জনগণের মধ্যে এই প্রত্যাশা জন্ম নিয়েছিল আওয়ামী লীগ নেতাদের ঔপনিবেশিক শাসক-প্রশাসন বিরোধী লাগাতার সমালোচনার প্রেক্ষিতে। নেতৃবৃন্দ পুরনো আমলাতন্ত্রকে স্বাধীন দেশের প্রয়োজনীয়তার সামনে অচল এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অর্জনের ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে বিবেচনা করেন। শেখ মুজিবের সরকার গগনস্পর্শী জনপ্রিয়তার শুভ সময়ে দেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থার বড়ো ধরনের পরিবর্তন আনতে শক্তিশালী ও দৃঢ় সংকল্পের নমুনা দেখিয়ে ছিল। চাকরিজীবীদের চাকরির নিরাপত্তার ওপর হামলা, প্রশাসনে পেশাজীবীদের অবাধ অনুপ্রবেশ, এএসআরসি ও এনপিসি গঠন প্রভৃতি প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠনে শেখ মুজিব সরকারের সুদৃঢ় অঙ্গীকারের প্রমাণ বহন করে। কিন্তু ১৯৭৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে দেশের আর্থ–সামাজিক–রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণভাবে বদলে গেলে আওয়ামী লীগ সরকার বিপাকে পড়ে। দেশের অর্থনীতি ছিল ভয়াবহভাবে খারাপ অবস্থায়। সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিরোধিতা বিশাল অগ্নিগিরির মতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি যে কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ও গ্রহণযোগ্য সীমার নিচে চলে গিয়েছিল। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুজিব সরকার প্রশাসন সম্পর্কে মনোভাব বদলে ফেলেছিল এবং আমলাতন্ত্রের প্রতি কোমলতা প্রদর্শন করেছিল। শুধু তাই নয়, বিধ্বস্ত আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি পুনরুদ্ধার এবং মৃত-প্রায় অর্থনীতিতে প্রাণসঞ্চার করতে মুজিব সরকার আমলাতন্ত্রের মতো একটি সুশৃঙ্খল প্রতিষ্ঠানের প্রতি ক্রমান্বয়ে নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল। এই নির্ভরশীলতা সরকারের প্রশাসনিক নীতিমালায় সরাসরি প্রভাব ফেলেছিল। যার ফলে ঔপনিবেশিক প্রশাসন পুনর্গঠনে মৌলিক ও গুণগত পরিবর্তনের সুপারিশ সম্বলিত এএসআরসি রিপোর্ট বাস্তবায়িত হয়নি। এই রিপোর্ট বাস্তবায়িত হলে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে সৃষ্ট এবং পাকিস্তানী আমলে লালিত জনবিচ্ছিন্নতার উন্নাসিক ভাবধারাপুষ্ট আমলাতন্ত্রে এক মৌলিক ও যুগান্তকারী পরিবর্তন সূচিত এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার অনুকূলে আমলাতন্ত্রের কাঠামো ও কার্যক্রম বিন্যস্ত হতে পারতো। কিন্তু দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে মুজিব সরকার সংস্কারের কঠিন পথে পা বাড়াতে সাহসী হয়নি। এএসআরসি রিপোর্টের পুরোটা এবং এনসিপি'র রিপোর্টের আংশিক বাস্তবায়ন না হওয়া এর প্রমাণ। মুজিব সরকার বুঝতে পেরেছিল সংস্কার রিপোর্ট বাস্তবায়িত হলে ইতোমধ্যে বিরাগভাজন আমলাতন্ত্র আরো বেশি বিরাগভাজন হয়ে পড়বে। বিক্ষুব্ধ আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক নাজুক অবস্থায় আমলাতন্ত্রে নতুন করে সংক্ষোভ তৈরি করা শেখ মুজিব সমীচীন মনে করেননি। ফলে সংস্কারের উদ্যোগ হিমাগারে বন্দি হয়ে পড়ে। আর মজ্জাগত ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের ধারা অব্যাহত থাকে।

বস্তুতঃ দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর জনগণের রাজনৈতিক চেতনা ও বিশ্বাস রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা আশা করেছিল। গণতন্ত্রের আকাঙ্খার মতো জনতা চেয়েছিল ঔপনিবেশিক আমলাতন্ত্রের কঠিন বলয় থেকে মুক্তি। সে লক্ষ্যে মুজিব সরকার এগিয়েও গিয়েছিল। কিন্তু শেখ মুজিবের রাজনীতি সামগ্রিক সামাজিক-

অর্থনৈতিক সঙ্কটের সঙ্গে একাকার হয়ে আবর্তিত হতে থাকে। সেই সঙ্কট-বলয় থেকে মুক্ত হবার প্রাণপণ প্রচেষ্টায় মুজিব অন্যসব দিক থেকে উদ্যোগ প্রত্যাহার করেন। বিশেষ করে আমলাতন্ত্রের মতো স্পর্শকাতর ও অপরিহার্য সরকারি প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক অচলায়তন ভাঙার বদলে তাঁকে বিদ্যমান আমলাতন্ত্রের সহযোগিতা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিতে হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শেখ মুজিব যে কঠোর বাস্তবতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেটাকে তিনি এড়িয়ে যেতে পারেননি। পারেননি বলেই তিনি সংস্কার-পুনর্গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করেও সেটা যথাযথভাবে বাস্তবায়নে সমর্থ হননি–গতানুগতিক আমলাতন্ত্রকেই অব্যাহত থাকার সুযোগ দিয়েছিলেন।

সূত্র ও পাদটীকা

১. পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আত্ম-পরিচয়ের চেতনা গড়ে তুলতে ভাষা আন্দোলনের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত বিশ্লেষণের জন্য দেখুন, বদরুদ্দীন উমর, *সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা*; ঢাকা : গ্রন্থনা, ১৯৬৯

২. আতাউর রহমান খান, *ওজারতির দুই বছর*, ঢাকা : অভিযান প্রিন্টিং হাউস, ১৯৬৪, পৃ.২৪

৩. মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি মুসলিম আসনে বিজয়ী হয়, অন্যদিকে যুক্তফ্রন্ট ২২৩টি আসনে ব্যাপক বিজয় অর্জন করে। বিস্তারিত দেখুন, Keith Callard, *Pakistan : A Political Study,* London: George Allen and Unwin, ১৯৫৭, পৃ. ৫৭

৪. ৬ দফা কর্মসূচি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, শেখ মুজিবর রহমান, ৬ দফা কর্মসূচি : *আমাদের বাঁচার দাবি*, ঢাকা : পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগ, মার্চ ১৯৬৬

৫. পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে তুলনামূলক বৈষম্য সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, "Why Bangladesh" by a group of Scholars in Veinna, in *Bangladesh Document*, New Delhi; Ministry of External Affairs, Government of India, 1971. pp. 15-22; Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration*, New York: Columbia University Press, 1972; Md. Abdul Wadud Bhuiyan, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*, New Delhi: Vikas Publishing Houses, 1982, pp. ৪৩-১১০

৬. নির্বাচনের ফলাফল বিস্তারিত জানতে দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা: ২৩ জানুয়ারি, ১৯৭১; *The Pakistan Observer*, ঢাকা: January ২০, ১৯৭০

৭. ত্রিপক্ষীয় সংলাপ সম্পর্কে সরকারি ভাষ্য দেখুন, *White Paper on the Crisis of East Pakistan*, Islamabad: Government of Pakistan Press, ১৯৭১; সংলাপ সম্পর্কে জুলফিকার আলী ভুট্টোর ভাষ্য দেখুন, *The Great Tragedy,* Karachi: Pakistan People's Party, ১৯৭১; সংলাপ সম্পর্কে আওয়ামী লীগের কোনো ভাষ্য প্রকাশিত হয়নি। পাকিস্তানের ভৌগলিক সংহতিতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, একদা ইয়াহিয়া মন্ত্রিসভার সদস্য ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর ভাষ্য, G. W. Choudhury, *The Last Days of United Pakistan,* Bloomington: Indiana University Press, 1974

৮. বাংলাদেশের প্রথম স্বাধীনতা বার্ষিকীতে শেখ মুজিবর রহমানের ভাষণ, *Bangladesh Documents*, Vol.1, Dacca: Ministry of External Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh, n.d. p. ১১

৯. Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of the People's Republic of Bangladesh; *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh,* Dacca: Bangladesh Government Press, 1972, p. ১

১০. *The Constitution of the Poeple's Republic of Bangladesh (1972)*, Part ii, Articles 10 and 13, pp. ৫-৬

১১. Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issess*, Dacca: University Press Ltd., 1980, p. ৯৯

১২. বিস্তারিত দেখুন, Syed Serajul Islam, "The Role of the State in the Economic Development of Bangladesh During the Mujib Regime (1972-75)", *Jounral of Developing Areas*, 19, No.2, January 1985, p. ১৯৬

১৩. Bangladesh Planning Commission, *"Policy Options and Recommendations for the Nationalisation of Industries"*, Memeographed, Dacca: February ১৯৭২

১৪. শেখ মুজিবের ভাষণের বিস্তারিত দেখুন, *Bangladesh Document*, Vol.1,op.cit. pp. ৯-১২

১৫. Rehman Sobhan and Muzaffer Ahmed, *Public Enterprises and Intermediate Regime: A Study in the Political Economy of Bangladesh*, Dacca: Bangladesh Institute of Development Studis, 1980, p. ১৯

১৬. ঐ, পৃ. ৯২

১৭. Tariq Ali, *Pakistan: Military Rule or People's Power*, London: Jonathan Cape, 1970, p. ১২০

১৮. বিস্তারিত দেখুন, Rehman Sobhan and Muzaffer Ahmed *প্রাগুক্ত*; আরো দেখুন, Syed Serajul Islam, *প্রাগুক্ত*, pp. ১৮৫-২০৮

১৯. প্রাদেশিক সাংবিধানিক আদেশ, ১৯৭২-এর আওতায় সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। আদেশের বিস্তারিত দেখুন, *Bangladesh Observer*, Dacca: Junuary ১২, ১৯৭২

২০. এই সংখ্যা নেয়া হয়েছে, Talukder Maniruzzaman, "Administrative Reforms and Politics Within the Bureaucracy in Bangladesh", *Journal of Commonwealth and Comparative Politics 17*; No.1, March 1979, p. ৪৭

২১. Nurul Islam, *Development Planning in Bangladesh: A Study in Political Economy*, London: C. Hurst and Company, 1977, p. ৫৩

২২. এই অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুর ভিত্তি হলো, Talukder Maniruzzaman, "Administrative Reforms and Politics Within the Bureaucracy in Bangladesh", *প্রাগুক্ত*, P.P. ৪৮-৯

২৩. উল্লেখ পাওয়া যাবে, Emajuddin Ahamed, "Dominant Bureaucratic Elites in Bangladesh", *Indian Political Science Review* 13, No.1, January 1979, p. ৩৪

২৪. Talukder Maniruzzaman, "Bangladesh in 1974: Economic Crisis and Political Polarization", *Asian Survey* 15, No.2, February 1975, p. 125, fn. ১৪

২৫. Ministry of Law, Government of Pakistan, *The Constitution of Islamic Republic of Pakistan*, March 1956, Article 180, p. 120; *The Constitution of the Republic of Pakistan*, Karachi: Government of Pakistan Press, 1962, Article 176, p. ৮৬

২৬. *Ibid*, Article 181 of *1956 Constitution*, p. 120; Article 177 of 1962 Constitution, pp. ৮৬-৭

২৭. *Ibid.*, Article 181 of *1956 Constitution*, pp.120-1; Article 177 of the *1962 Constitution*, p. ৮৭

২৮. Ministry of Law and Parliamentary Affairs, Government of the People's Bangladesh, *The Constitution of the People's Republic of Bangladesh, Dacca: Bangladesh* Government Press, 1972, Articles 134,135 (1),135(2), pp. ৫৪-৫

২৯. ঐ, Article 135(3), p. 55 দেখুন, A.T.R. Rahman, "Administration and its Political Environment in Bangladesh", *Pacific Affairs* 47, No.2, Summer 1974, pp. ১৭১-৯১

৩০. Ralph Braibanti, "The Higher Bureaucracy of Pakistan", in Ralph Braibanti (ed.), *Asian Bureaucratic Systems Emergent from the British Imperial Tradition*, Durham, N.C.: Duke University Press, 1966, table 23, p. ৩০৪.

১৯৬৬ সালে ৪৮২ জন সিএসপি সদস্যের মধ্যে ৩৭ জনকে সরকারি কর্পোরেশনের কাজে নিয়োগ করা হয়।

৩১. Rehman Sobhan and Muzaffer Ahmed, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩২

৩২. ঐ. পৃ. ৫৩৩-৪

৩৩. পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রমের বিস্তারিত দেখুন, Ministry of Cabinet Affairs, Cabinet Division, Government of the People's Republic of Bangladesh, *Organisation of the Bangladesh Planning Commission*, Dacca: January ৩১, ১৯৭২

৩৪. Nurul Islam, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

৩৫. ঐ. পৃ. ৫৫

৩৬. ঐ. পৃ. ৫৯

৩৭. Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, *The First Five Year Plan: 1973-78*, Dacca: Bangladesh Government Press, November 1973, p. 8

৩৮. ঐ. পৃ. ৫

৩৯. আমলাতন্ত্রের বিরূপ মনোভাব সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Nurul Islam, *প্রাগুক্ত*

৪০. ঐ. পৃ. ৫৯

৪১. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Report of the Administrative and Services Reorganisation Committee, Part I*, The Services, Dacca: April 1973, Preface, pp. iii-iv

৪২. ঐ. পৃ. ৪

৪৩. ঐ. পৃ. ৫

৪৪. আমলাদের শ্রেণী-বিভক্ত চরিত্র সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, ঐ. পৃ. ৭-১৭

৪৫. ঐ. পৃ. ১৬-৭

৪৬. ঐ. পৃ. ৩৬

৪৭. ঐ. পৃ. ১৬

৪৮. ঐ. পৃ. ১৮-৯

৪৯. ঐ. পৃ. ১৯

৫০. ঐ. পৃ. ২৫

৫১. ঐ. পৃ. ৬৩

৫২. ঐ. পৃ. ৬৫

৫৩. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Report of the Administrative and Services Reorganisation Committee, part II*, The Administration, Dacca: October 1973, p. ১৮৭

৫৪. ঐ. p.194; *Administrative Reforms Commission Report on the Machinery of the Government of India and its Procedure of Work*, New Delhi: September 1968, p. ৩০

৫৫. ঐ. p. 194; *Tottenham Roport*, NIPA reprint series No, 1, Karachi: National Institute of Public Administration, 1963, p. ৫১

৫৬. ঐ. পৃ. ১৯৩

৫৭. ঐ. Chapter viii, pp. ২১৩-৫০

৫৮. ঐ. Chapters ix and x

৫৯. Planning Commission, Government of the People's Republic of Bangladesh, *Annual Plan 1973-74*, Dacca: Bangladesh Government Press, June 1973, p.১

৬০. ঐ. পৃ. ৯

৬১. ঐ.

৬২. ঐ. পৃ. ৫

৬৩. *বাংলার বাণী*, ঢাকা: ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

৬৪. *Annual Plan 1973-74*, *প্রাগুক্ত*. পৃ. ১

৬৫. *The Holiday*, Dacca: June 9, ১৯৭৪

৬৬. বিভিন্ন বৈপ্লবিক দলের নেতৃত্ব, সংগঠন ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Talukder Maniruzzaman, "Bangladesh: An Unfnished Revolution?", *Journal of Asian Studies 34*, No.4 August 1975, pp. ৮৯১-৯১১

৬৭. স্বাধীনতার সময় থেকে সশস্ত্র গেরিলারা ৩৩টি থানা ও পুলিশ ফাঁড়িতে আক্রমণ ও লুট করে, দেখুন, A.T.R. Rahman, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩

৬৮. *The Morning News*, Dacca: November ১৪, ১৯৭৩

৬৯. The National Pay Commission was appointed under the ministry of Finance Resolution NO. MF (Admn.) 2E-1 (300)/72/1081, July 21, ১৯৭২

৭০. Government of the People's Republic of Bangladesh, *Report of the National Pay Commission, Vol. 1, Main Tex*, Dacca: May 18, 7973, p. ১

৭১. ঐ. পৃ. ১

৭২. ঐ. পৃ. ৫

৭৩. ঐ. পৃ. ৭৩

৭৪. ঐ. পৃ. ৮৮

৭৫. ঐ. পৃ. ৮৭

৭৬. Mohammad Mohabbat Khan and Habib Mohammad Zafarulhah, "Public Bureaucracy in Bangladesh", in Krishna K. Tummala (ed.), *Administrative Systems Abroad*, Lanham, Md.: University Press of America, 1982, p. ১৬৭

৭৭. মুজিবের পতন প্রত্যক্ষভাবে 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। কারণ বিপ্লব বহু সামাজিক গোষ্ঠীর জন্য ছিল হুমকির কারণ। দেখুন, Rounaq Jahan, "Bangabandhu and After: Conflict and Change in Bangladesh", *Round Table 66*, No. 261, January 1976, p.৭৯

৭৮. নবগঠিত জাতীয় দলের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Zillur R. Kahn, "Leadership, Parties and Politics in Bangladesh", *Western Political Quarterly 29*, No. 1, March 1976, p. ১২২

৭৯. উদ্ধৃত, Emajuddin Ahamed, *প্রাগুক্ত*, p. ৪৩

৮০. শেখ মুজিবের সঙ্গে লেখকের সাক্ষাৎকার দেখুন, Zillur R. Khan, *প্রাগুক্ত*, p. ১২২

৮১. Najmul Abedin, *Local Administration and Politics in Modernising Societies: Bangladesh and Pakistan*, Dacca: National Institute of Public Administration, 1973, p. ১১৫

৮২. এই সংখ্যা সংগ্রহ করা হয়েছে সরকার কর্তৃক প্রকাশিত জীবনালেখ্য থেকে। বিস্তারিত দেখুন, *দৈনিক ইত্তেফাক*, ঢাকা: ১৮ এবং ২৫ জুলাই, ১৯৭৫

শাসনতান্ত্রিক কার্যক্রম : প্রসঙ্গ মুজিব শাসনামল

ড. দিলারা চৌধুরী

স্বাধীনতার পর পরই কোনো বিবাদ-বিসংবাদ ছাড়া সর্বাত্মক ঐকমত্যের ভিত্তিতে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন আওয়ামী লীগের দীর্ঘদিনের দায়বদ্ধতা, বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের সম্পৃক্ততা এবং অবিভক্ত পাকিস্তান শাসনকালে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির কঠোর শাসন সম্পর্কে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মোহভঙ্গ অতি দ্রুত সংবিধান রচয়িতাদের সংসদীয় শাসন কাঠামোর উজ্জ্বল উদাহরণ বৃটেনের 'ওয়েস্ট মিনস্টার' ধাঁচের সংবিধান প্রণয়নে উৎসাহি করে তোলে।

আইন পরিষদের কাছে প্রশাসনের দায়িত্বশীলতাই হলো সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার বিশেষ বৈশিষ্ট্য; যেখানে সার্বভৌম আইন পরিষদই (জাতীয় সংসদ) হলো সকল রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। অবিভক্ত পাকিস্তানে (১৯৪৭-'৭১) আইন পরিষদের অচলাবস্থাকেই সদ্য অংকুরিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অবক্ষয়ের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়; যা পূর্ব পাকিস্তানকে কেবলমাত্র বৈধ পাওনা থেকেই বঞ্চিত করেনি বরং পাকিস্তানের বিভক্তি ত্বরান্বিত করেছিল। এবং সূচনা করেছিল অনিয়ন্ত্রিত ও বল্গাহীন শাসন ব্যবস্থা।

স্পষ্টতই, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সৃষ্টির পর, সংবিধান প্রণেতাগণ একটি সার্বভৌম আইন পরিষদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে ওঠেন। কিন্তু সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার পক্ষে একটি আদর্শ সাংবিধানিক সনদ এবং আওয়ামী লীগের আপাতঃ 'দায়বদ্ধতা' থাকা সত্ত্বেও ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি অতি প্রশংসিত সার্বভৌম জাতীয় সংসদের অপমৃত্যু ঘটে। যথাযথ বিচার-বিশ্লেষণ ও

অনুসন্ধানী পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, ১৯৭২-এর সংবিধানের আওতায় আইন পরিষদ কার্যক্রম শুরুর পর থেকেই বিগড়াতে আরম্ভ করেছিল। এই সীমাবদ্ধতার পেছনে কী কার্যকারণ কাজ করেছিল; সংবিধানে কী এমন কোনো 'গুপ্ত ফাঁক' ছিল যা বাধাগ্রস্ত করেছিল এর কার্যক্রমকে; জাতীয় সংসদ তথা আইন পরিষদকে অকেজো করার জন্য কী দায়ী ছিল দেশের বিরাজমান সামাজিক-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট; নাকি ও জন্য দায়ী ছিল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়সমূহ আর দুর্বল রাজনৈতিক নেতৃত্বের সম্মিলন? প্রবন্ধে মুজিব শাসনামলের শাসনতান্ত্রিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে উল্লেখিত প্রশ্নসমূহ পরীক্ষা করে উত্তর খোঁজার প্রয়াস নেয়া হয়েছে।

৫.১ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন পরিষদ

প্রেসিডেন্ট শাসিত কিংবা প্রধানমন্ত্রি শাসিত সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোধীন আইন পরিষদের যথাযথ কার্যকারিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক নির্বাহী কর্তৃপক্ষের বিকাশ আর বিশ শতকে রাষ্ট্রের পরিবর্তনশীল ভূমিকার প্রেক্ষাপটে সমকালীন নির্বাহী কর্তৃপক্ষ ও আইন পরিষদের মধ্যকার সম্পর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে মিশ্রানুভূতিসম্পন্ন। ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীক কর্মকাণ্ডে অধিকতর কর্মোদ্যোগ ও বহুমাত্রিক গতিশীল চাহিদা মিটাতে নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে মাঝে মাঝে আইন পরিষদের ওপর হস্তক্ষেপ করতে হয়। এর ফলে আইন পরিষদের নির্ধারিত কার্যক্রম ভিন্নতর মাত্রা পেয়েছে। বেশ কিছু খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ আইন পরিষদের এই পরিবর্তিত ভূমিকাকে বলেছেন, 'আইন পরিষদের অবক্ষয়'।[১] এমনকি, সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থাতেও- যেখানে আইন পরিষদই সকল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু, 'সেখানে সংসদে চরম ও সার্বভৌম ক্ষমতা বর্তমানে চলে গেছে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের হাতে আর নির্বাহী কর্তৃপক্ষের উপর চূড়ান্ত নিয়ন্ত্রণ রয়েছে নির্বাচকমণ্ডলী বা জনমতের।'[২]

এই অগ্রগতি সত্ত্বে, 'প্রত্যক্ষ জনপ্রিয় সরকারের ধারণা অব্যবহারিক বলে বর্জিত হওয়ায় প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদই ছিল একমাত্র পরিচিত অস্ত্র, যার মাধ্যমে নির্বাহী শাসক কর্তৃপক্ষকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতো এবং যে নিয়ন্ত্রণ ছিল জনগণের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।'[৩] আজকাল ডাইসি বর্ণিত আইন পরিষদের ধারণা, যার মাধ্যমে জনগণ নিজেদেরকে শাসন করে, তা প্রায় পরিত্যক্ত হলেও আইন পরিষদ নবতর ভূমিকায় জনপ্রতিনিধিত্বশীলতা ও সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের যৌথ উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত। আইন পরিষদ জনপ্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী স্বার্থসমূহ তুলে ধরে সেগুলোর দরকষাকষি ও আপসরফা করে এবং অন্যদিকে একটি ফোরাম উপহার দিয়ে সেখানে সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিত ও এর কার্যকলাপের মূল্যায়ন করে।

আইন পরিষদ একটি আধুনিক দেশে এভাবেই, যত না আইন প্রণয়নের কাজে নিয়োজিত থাকে তার চেয়ে বেশি ব্যস্ত থাকে অপরাপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডে, যেমন : অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণ, নির্বাহী কর্তৃপক্ষের কার্যকলাপ সম্পর্কে তথ্যাদি আহরণ ও জনগণের অভাব-অভিযোগ দুঃখ-কষ্ট উপস্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ। আইন পরিষদ এসব কাজে বিভিন্ন কৌশল ও Modus operandi ব্যবহার করে, যেমন : আইন প্রণয়ন

বহির্ভূত কার্যক্রম সম্পাদন, উত্তর প্রদান ও বিভিন্ন কমিটির দ্বারা অনুসন্ধানের জন্য মুলতবী প্রস্তাব গ্রহণ। সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, সুস্থ ও কার্যকর সংসদের উপস্থিতি একটি সাংবিধানিক সরকারের সঙ্গে Sine que non. আইন পরিষদের ভূমিকা সংক্রান্ত সুসংহত গবেষণায় কে.সি. হোয়ার, সংসদীয় গণতন্ত্রে এর ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্যকে চিহ্নিত করেছেন এভাবে : এর অন্যতম প্রধান কাজ হল নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সমালোচনা করা। আইন পরিষদ সরকার গঠন করে বা পতন ডেকে আনে। জনগুরুত্বপূর্ণ বড় বড় বিষয় ও ঘটনা সম্পর্কে বিতর্ক করে। জাতির অপূর্ণ প্রত্যাশাসমূহ সংগঠিত করে এবং বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্তদের পর্ষদ হিসেবে কাজ করে।[৪] বস্তুত এ কথা স্বচ্ছ স্ফটিকের মতো পরিষ্কার যে, আধুনিক কালের কার্যকর আইন পরিষদের জন্য অত্যাবশ্যক বিষয় হলো এর বিভিন্ন পরিকল্পনা–কৌশল ও কার্যসাধন পদ্ধতিকে স্বাভাবিকভাবে বিকশিত করা।

৫.২ ১৯৭২-এর সংবিধানে আইন পরিষদ

১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের আদি সংবিধানকে সার্বভৌমরূপে তৈরি করার জন্য এর প্রণেতাগণ পরিচিত যাবতীয় বন্দোবস্তই করেছিলেন। প্রথমতঃ রাখা হয় সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি। অযোগ্যতামূলক ধারাগুলো ছিল সাধারণ; আর সবচেয়ে অসাধারণ অযোগ্যতা ছিল ধারা ৬৬ (২-এর গ)– যা বাংলাদেশ দালাল (স্পেশাল ট্রাইব্যুনালস) আদেশ ১৯৭২–এর অধীনে অভিযুক্ত যে কোনো ব্যক্তিকে ভোটাধিকার লাভের অযোগ্য বলে ঘোষণা করে। এমন করা হয়েছিল ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে। নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত করার বিধানের আওতায় মহিলাদের জন্য সংসদে সংরক্ষিত ছিল অতিরিক্ত পনেরটি আসন। বাংলাদেশের গণপরিষদকে অবশ্য সংখ্যালঘু প্রতিনিধিত্বের বিব্রতকর প্রসঙ্গ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়।

যে সকল পরিস্থিতিতে একজন সংসদ সদস্যকে অবশ্যই তার আসন পরিত্যাগ করতে হবে সে সম্পর্কীয় সাধারণ বন্দোবস্তও রাখা হয়। এতে সবচেয়ে অভিনব ছিল ধারা ৭০। এই ধারা মতে, যদি কোনো সদস্য পদত্যাগ করেন কিংবা নির্বাচনে তাকে মনোনয়নদানকারী দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন, সেক্ষেত্রে তার আসনটি শূন্য বলে ঘোষিত হবে। এই ধারাটি যে একজন সংসদ সদস্যের স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা বিনষ্ট করেছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ধারাটি সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল দলীয় কোন্দল ও দলীয় আনুগত্য পরিবর্তন সম্পর্কে আওয়ামী লীগের অতীত অভিজ্ঞতার কারণে– যেমন রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির মাধ্যমে রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি করে দেয়া হয়েছিল পাকিস্তানের স্বল্পকালীন সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার আমলে (১৯৫৬-'৫৮)[৫] ফলে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে, শেখ মুজিবের শাসনকালে আইন পরিষদ সদস্যদের স্বাধীনতার মূল্যে একটি স্থায়ী নির্বাহী কর্তৃপক্ষ গড়ে তোলার চেষ্টা করা হলো; কিন্তু শাসক দল আওয়ামী লীগ ও সদস্যদের মধ্যকার এহেন সম্পর্ক খোদ জাতীয় সংসদের কর্মকাণ্ডের ওপর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল।

এছাড়াও যে সকল প্রধান সূচকসমূহ সংসদকে সম্মানজনক করে সেগুলো ধারা ৭০-এ অনুপস্থিত ছিল। এবং ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধান মূলতঃ 'উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন প্রতীক' মঞ্জুর করেছিল। নিজস্ব কার্যবিধি প্রণয়ন ও সংস্থাপন করার অধিকার জাতীয় সংসদের ছিল, যাতে সংসদ তার উপর অর্পিত দায়িত্ব, যেমন, নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে নজরে রাখার কাজ কমিটি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যথাযথভাবে পালন করতে পারে। ক্ষমতাসীনদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণে রাখার অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে ছিল ন্যায়পাল (Ombudsman) এবং মহা হিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করা, যা যথাক্রমে সংবিধানের ৭৭ এবং ১২৭ নং ধারায় বর্ণিত ছিল। সংবিধানের ৭৯ নং ধারায় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যকারিতা চালু ও শক্তিশালী করার জন্যে একটি সংসদ সচিবালয় চালুর বিধান রাখা হয়।

জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নির্বাহী কর্তৃপক্ষের উপর আইন পরিষদের সীমাহীন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দেয়া হয়। এছাড়াও ২৪ জুলাই ১৯৭৪ সালে কার্যপ্রণালী বিধি প্রণয়ন করে নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে সংসদের নিয়ন্ত্রণে রাখার আরো উদ্যোগ নেয়া হয়।

বস্তুতঃ পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, ১৯৭২ সালের সংবিধানের অধীনে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম আইন পরিষদ গড়ে তোলার সব ধরনের প্রচেষ্টাই নেয়া হয়েছিল এবং প্রকৃতপক্ষে আইনগতভাবেই সেটা সম্পন্ন করা হয়েছিল। তবে সত্যিকার অর্থে তা কীভাবে কাজ করেছিল সেটা ভিন্ন বিষয়। প্রবন্ধের এ পর্যায়ে মুজিব আমলের স্বাধীন আইন পরিষদটি প্রকৃত প্রস্তাবে কীভাবে কাজ করেছিল সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করা যেতে পারে।

৫.৩ মুজিব শাসনামলে জাতীয় সংসদের কার্যক্রম (১৯৭৩-'৭৫)

বস্তুতঃ বাংলাদেশে সার্বভৌম জাতীয় সংসদের প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে ও ১৯৭১-এর জানুয়ারিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে বিজয়ী তৎকালীন অবিভক্ত পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বানের মধ্য দিয়ে। গণ-পরিষদকে, যার ওপর ন্যস্ত ছিল নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করার দায়িত্ব– একই সঙ্গে দেশের আইন পরিষদ হিসেবেও কাজ করতে হয়। অবশ্য প্রধানমন্ত্রি শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশের মাধ্যমে দেশ শাসন শুরু করলে গণপরিষদের আইন প্রণয়নের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান কার্যকর হয় এবং শেখ মুজিবের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ দেশব্যাপী সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে বিজয়ী শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ পরবর্তী ৫ বছরের জন্য দেশ শাসনের ম্যান্ডেট লাভ করে

শেখ মুজিবের শাসনামলের প্রথম দিকে মনে হয়েছিল একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া এবং জাতীয় সংসদকে একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে শক্তিশালী করার কাজ সঠিক পথেই এগিয়ে চলছে। কিন্তু দু'টি বিষয় জাতীয় সংসদের নির্বিঘ্ন যাত্রা

সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ ঘটালো : প্রথমতঃ আগেই উল্লেখিত হয়েছে যে সংবিধানের ৭০ ধারা সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতা ও স্বতঃস্ফূর্ত তাকে খর্ব করে। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সংবিধানে এ ধরনের একটি ধারার অন্তর্ভুক্তি বেশ যথোচিত মনে হলেও এটা ছিল গতানুগতিক সংসদীয় প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ ১৯৭৩-এর মার্চে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল। সর্বমোট ৩০০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় ২৯৩টি আসন। আর বাকী ৭টি আসনের মধ্যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ২টি, জাতীয় লীগ ১টি, ভাসানী-ন্যাপ ১টি এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা ৩টি আসন লাভ করে। পরবর্তীতে রাষ্ট্রপতির আদেশ-৫০-এর মাধ্যমে মহিলাদের জন্য জাতীয় সংসদে ১০ বছর মেয়াদি ১৫টি সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়। যেগুলো সম্ভবতঃ কার্যকর বলে গণ্য করা হয় ১৯৭২-এর ১৬ ডিসেম্বর থেকে।[৬] শাসক দল আওয়ামী লীগ মহিলাদের আসনগুলো দখল করে নেয়। এর ফলে শেষ পর্যন্ত জাতীয় সংসদের সর্বমোট ৩১৫টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০৮টি আর সকল বিরোধী দল ও স্বতন্ত্র সদস্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৭টি। ফলতঃ ১৯৭৩ সালে জাতীয় সংসদে কোনো প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক বিরোধী দল রইল না। কারণ, সেজন্য অন্ততঃপক্ষে ২০ জন সদস্যের দরকার ছিল।

সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় যেহেতু বিরোধী দলের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ সেহেতু শেখ মুজিবের শাসনাধীন প্রথম জাতীয় সংসদের এটি ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি। সে সময় দায়িত্বশীল বিরোধী দলের অভাবে সংসদীয় কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছিল। মরিস জোনসের ভাষায় : 'যথাযথ বিরোধী ছাড়া যথেষ্ট পরিমাণ শক্তি ও সম্মতি অর্জন করে সুস্থ সংসদীয় সরকার গড়ে উঠতে পারে না; সে সরকার হয়ে ওঠে অনিয়ন্ত্রিত ও দায়িত্বহীন।'[৭] সংসদীয় ব্যবস্থায় কোনো কিছু যাচাই-বাচাই, তত্ত্বাবধায়ন ও সমালোচনার প্রধান দায়িত্বটি বিরোধী দলের। দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৭৩-এর জাতীয় সংসদে এমন কোনো পরিবেশ দেখা যায়নি। যদিও ভারতীয় সংসদের কার্যকর ব্যবস্থা, যা কোনোভাবেই জাতীয় কংগ্রেস ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারেনি- সেই কংগ্রেস শাসিত একদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার উদাহরণ প্রায়ই টানা হতো। কিন্তু ভারতীয় সাফল্যের ইতিহাস প্রধানতঃ নেহেরুর নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতা, কংগ্রেস পার্টির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক কাঠামো ও সংসদীয় কমিটি কর্তৃক সমালোচনা/প্রস্তাব পেশের মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে। নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়া সত্ত্বেও নেহেরু সরকার বিরোধী দলের প্রতি ঠিক তেমন আচরণই করতো যেমনটি একটি সংসদীয় বিরোধী দলের প্রাপ্য।[৮]

বাংলাদেশের প্রথম সংসদের একক প্রধান দল শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের মধ্যে বিরোধী দলের প্রতি উদার দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৭৩-'৭৫ সালের বিরোধী দলের উল্লেখিত ৭ জন সদস্য নিজেদের ওপর একটি বিরোধী দলের দায়দায়িত্ব টেনে নিতে চেয়েছিলেন। প্রবীণ রাজনীতিক আতাউর রহমান খান ছিলেন সেই বিরোধীদের আনঅফিসিয়াল নেতা। কিন্তু এ উদ্যোগ ছিল দুর্বল, হতাশাগ্রস্ত ও একটি বিকল্প সরকার

দাঁড় করার ব্যাপারে অক্ষম। এ ধরনের একটি ক্ষুদ্র বিরোধী গ্রুপের বিরুদ্ধেও আওয়ামী লীগ চরম অসহিষ্ণু ভূমিকা গ্রহণ করে। আসল ব্যাপার হলো এই যে, এটা সংসদীয়ভাবে অনুমোদিত বিরোধী দল ছিল না; ফলে সরকার তাদের সঙ্গে সেভাবে আচরণ করতো না। তদুপরি শেখ মুজিবের প্রবল পরাক্রান্ত ব্যক্তিত্ব এবং সংসদ সদস্যদের খর্বিত স্বাধীনতার ফলে ক্ষমতাসীন মুজিব সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে ইচ্ছামতো আচরণ করতো। প্রথম জাতীয় সংসদের সংসদীয় কার্যক্রমেই এ ঘটনা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রশ্নোত্তর পর্ব সংসদীয় কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জনগণের দুঃখ-দুর্দশার কথা জানা যায় ও ব্যক্তি-মানুষের অধিকার সংরক্ষিত হয়। প্রথম জাতীয় সংসদের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর পর্ব আরম্ভ করা হয় দ্বিতীয় অধিবেশন থেকে। জাতীয় সংসদে সর্বসাকুল্যে ৫২৮৮টি তারকাচিহ্নিত এবং ২২টি তারকাবিহীন লিখিত প্রশ্ন গ্রহণ করা হয়। শর্ট নোটিশ প্রশ্নের মধ্যে ছিল ৮টি তারকাখচিত আর ১১টি তারকাহীন। সকল প্রশ্নের মাত্র এক-তৃতীয়াংশের জবাব দেয়া হয়। বেশির ভাগ প্রশ্নই ছিল সাংবিধানিক স্বার্থ সংক্রান্ত এবং মাত্র কয়েকটি ছিল জাতীয় নীতি সংক্রান্ত। প্রথম জাতীয় সংসদের সকল অধিবেশনের মধ্যে দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রশ্নোত্তর পর্ব ছিল সবচেয়ে আকর্ষণীয়; বিশেষ করে যখন আতাউর রহমান খান অর্থমন্ত্রির কাছে ভারতে বাংলাদেশের মুদ্রা ছাপানোর বিষয়ে প্রশ্ন তোলেন। এর পরে কিছু সম্পূরক প্রশ্ন করা হয় যা সংসদে আকর্ষণীয় বলে বিবেচিত হয়। কিছু প্রশ্ন রাখা হয়, বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় পাটের গুদামে সংঘটিত রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডের ব্যাপারে। কিন্তু সংসদ সদস্যদের উত্থাপিত বেশিরভাগ প্রশ্ন ও মন্ত্রিদের উত্তর সেভাবে নিয়ন্ত্রিত ছিল না- প্রশাসনের দোষ-ত্রুটি যাচাই-বাছাই করে যেভাবে খুঁটিয়ে দেখা দরকার ছিল। প্রশ্নোত্তর পর্বে দলীয় নীতির বাইরে বক্তব্য রাখার সুযোগ থাকলেও সরকারি দলের বেশিরভাগ সদস্য অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করে দলীয় নীতির বাইরে যাওয়া থেকে সতর্কভাবে বিরত ছিলেন।

মূলতঃ প্রশ্নোত্তর পর্ব সরকারি নীতির ব্যাপারে সে রকম আগ্রহ কিংবা তেমন কোনো বিতর্কের জন্ম দিতে পারেনি। মজার ব্যাপার হলো, দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক সমস্যা বৃদ্ধি ও আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত প্রশ্নের সংখ্যাও কমে যায়। প্রথম জাতীয় সংসদের অষ্টম অধিবেশনে আদৌ কোনো প্রশ্নোত্তর পর্বই ছিল না।

একইভাবে শর্ট-নোটিশে প্রশ্ন এবং সম্পূরক প্রশ্নও কোনো আগ্রহ বা বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারেনি। অথচ উন্নত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এর উল্টোটা ঘটে। সেখানে 'পেছনের সারির সদস্যরা' এমন সব প্রশ্নের মাধ্যমে 'কোন মন্ত্রিকে নজেহাল করে আনন্দ' পায়।[৯] বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের 'পেছনের সারির সদস্যগণ' এমন কোনো উদ্যোগ গ্রহণ থেকে বিরত ছিলেন, যার কারণ প্রবন্ধের পূর্বভাগে উল্লেখ করা হয়েছে।

সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সুপরিচিত সংসদীয় পদ্ধতি 'মুলতবী প্রস্তাব' সংসদে অনুমোদন করা হয়নি; যদিও প্রতিদিনই পত্রপত্রিকায় দেশের সার্বিক আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতির খবরাখবর প্রকাশিত হচ্ছিল। বিশেষ করে, দেশে তখন সরকারের স্বার্থে নিয়োজিত রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে আন্দোলনরত র‍্যাডিকেল সংগঠনের সংঘর্ষ চলছিল। ১৯৭৩-এর শেষ ভাগ থেকে ১৯৭৪-এর প্রথম ভাগ পর্যন্ত পরিস্থিতির এতোদূর অবনতি ঘটে যে, অবস্থার সামাল দিতে শেখ মুজিবের সরকারকে সামরিক বাহিনী তলব করতে হলো। এরকম চরম পরিস্থিতিতে মাত্র ৭টি মুলতবী প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। কিন্তু এর কোনটিই গৃহীত হয়নি। সামরিক বাহিনীর মাত্রাতিরিক্ত ক্ষমতা ও দমনমূলক ব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলো সংসদে পেশ করাই হয়নি। এ কথা সত্য যে, আধুনিক সংসদগুলোতে মুলতবী প্রস্তাব রাখতে দেয়া হয় খুব কমই; কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অপকর্ম সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের ক্ষেত্রে মুলতবী প্রস্তাবের গুরুত্বের ব্যাপারটিকে একেবারে হেয়করে দেখা হবে। বস্তুতঃ মুলতবী প্রস্তাবের মাধ্যমে সংসদকে দেশের পরিস্থিতি এবং এর পরিণামের ব্যাপারে জনগণের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন করে তোলা হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে, শেখ মুজিবের শাসনামলে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদ এ ব্যাপারে অন্ধ হয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নিলো এবং সরকারের খামখেয়ালী পদক্ষেপ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে নাগরিক স্বাধীনতা খর্ব করার ইস্যুটিকে গুরুত্ব না দিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখার ব্যবস্থা করলো। মাত্র আধা ঘণ্টা আলোচনার জন্য ৪টি নোটিশ একইভাবে অবজ্ঞা করা হয়। সংসদীয় কার্যক্রমের এই নিয়ম যা ভারতীয় সংসদের সৃষ্টি-তাও সঠিকভাবে পালন করা হয়নি। সেখানে এই নিয়ম মুলতবী প্রস্তাবের বদলে পালন করা হয়, কোনো উত্তেজক ঘটনা বা স্পর্শকাতর বিষয়ে। শেখ মুজিবের সংসদে এ রকম মাত্র ৫টি নোটিশ আসে, যার মধ্যে মাত্র ২টি আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়। মজার ব্যাপার হলো, ২টি নোটিশের মধ্যে একটির আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল আলজিরিয়ায় অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমানের গৌরবময় বর্ণাঢ্য ভূমিকা প্রসঙ্গে। একইভাবে, জাতীয় সংসদ জরুরি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের দাবি সম্বলিত ৫২টি নোটিশ গ্রহণ করে কিন্তু আলোচনা হয় মাত্র ১৬টি। শাসক আওয়ামী লীগের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও উন্নাসিক মনোভাবের জন্য খুবই সঙ্গত কারণে এই ঘটে যে, জাতীয় সংসদ সরকারি কার্যক্রমের সমালোচনা অথবা পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা থামিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং সরকারকে নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তি স্বাধীনতা লংঘনের কাজ থেকে বিরত রাখতে পারেনি। কে সি হোয়ারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা যায় : জাতীয় সংসদ সরকারকে সঠিক ব্যবহার করার জন্য বাধ্য করতে অপারগ ছিল।[১০]

একইভাবে ১৯৭৩-এর সেপ্টেম্বরে প্রধানমন্ত্রি শেখ মুজিবর রহমান সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধনী) বিল ১৯৭৩-এর মাধ্যমে জাতীয় সংসদের ক্ষমতা আরো কর্তন করেন। এই বিল সংসদের দুই অধিবেশনের মধ্যকার বিরতি ৬০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২০ দিন করে এবং জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ ও প্রতিরোধমূলক আটকের সুযোগ দিয়ে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের হাতকে আরো শক্তিশালী করে।

বিরোধী দলের পরামর্শ উপেক্ষা করে আওয়ামী লীগ সংবিধান সংশোধনের জন্য আপীল বিল জনমত যাচাই কিংবা বাছাই কমিটিতে আলোচনার লক্ষ্যে প্রেরণ করেনি। বিলটি সংসদে ২৫০–০ বিভক্তি ভোটে পাস হয়। বিরোধী দলের আতাউর রহমান খান ও আবদুস সাত্তারের ওয়াক আউটের পর মাত্র ২ ঘণ্টায় বিলটি আইন হিসেবে পাস করে নেয়া হয়।[১১] এ ধরনের একটি বিতর্কিত বিল কোনো উত্তেজনা ছাড়াই পাস হয়। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী প্রথম পাঠের সময়ই কোনো বিলের বিরোধিতা করা যাবে না। এই ঐতিহ্য তখনই ভাঙা যাবে, যখন বিরোধীরা সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা অনুভব করতে পারবে। ভারতের সংসদে এমন ঐতিহ্য প্রথমবারের মতো ভাঙা হয় ২৩ নভেম্বর ১৯৫৪ সালে; যখন প্রতিরোধমূলক আটকাদেশ (সংশোধনী) বিল, ১৯৫৪ সংসদে উত্থাপনকালে বিভক্তি ভোটের জোরালো চেষ্টা করা হয়। যা হোক, সেটা ১৪৬-৩৬ ভোটে পাস হয়।[১২] এটাই হলো ভারতীয় সংসদের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের পার্থক্য।

শেখ মুজিবের শাসনাধীন প্রথম জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়নগত কার্যক্রমের দিকে তাকালে দেখা যাবে যে, সেটা ছিল একই রকমের হতাশাপূর্ণ। সংসদ সাধারণতঃ ব্যাপক সময় ব্যয় করেছে সরকারি দল উত্থাপিত বিভিন্ন বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও সংশোধনের কাজে। সরকার পক্ষ না চাইলেও সাধারণভাবে বিরোধী দল সংসদীয় বিতর্ক ও বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে উপর্যুপরি চাপ সৃষ্টি করে সরকারি নীতি বদলাতে সচেষ্ট হয়। ভারতের মতো একদলীয় গণতান্ত্রিক দেশেও সংসদীয় কমিটি আনীত স্পর্শকাতর জনমতের ব্যাপারে সুপারিশ ও সংশোধনীসমূহ সরকার অবজ্ঞা করতে পারে না। তুমুল সংসদীয় বিতর্কের মাধ্যমে বিরোধী দল বিভিন্ন সংশোধনী আনতে সরকারি দলের ওপর চাপ সৃষ্টি করে থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এমনটি দেখা যায়নি।

দুঃখজনকভাবে লক্ষণীয়, জাতীয় সংসদ যে দুটো গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টরের মাধ্যমে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের ওপর নিজস্ব আইন পরিষদীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে; মুজিবের সংসদীয় কার্যকালে সে দুটো চরমভাবে অবিকশিত ছিল। প্রথম জাতীয় সংসদের যে ১১০টি আইন পাস হয় তার ৯১টিই রাষ্ট্রপতির নির্বাহী আদেশ। অথচ সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রয়েছে কেবল মাত্র তখনই, যখন বিশেষ অবস্থা বিরাজ করে এবং সংসদের অধিবেশন থাকে না। কিন্তু মাত্র এক নজরে পর্যবেক্ষণ করলেই যে কেউ সহজেই অনুধাবন করতে পারবে যে, সে সময় কী নিপুণভাবে নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন পরিষদকে এড়িয়ে চলা হয়েছে। এমনকি, জনপ্রতিনিধি (মহিলা আসন) সংক্রান্ত সাংবিধানিক বিধি ও মৌলিক অধিকার বিষয়ক রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশকে একই মূল্যে তুলনা ও সংক্ষিপ্তকরণের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির আদেশে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং যা কেবলমাত্র একটি সীলমোহরের স্বীকৃতির জন্য গৃহপালিত সংসদে উত্থাপন করা হতো।

যথাক্রমে বহু বিতর্কিত অধ্যাদেশকে বিল আকারে সংসদের সামনে উপস্থিত করা হতো। প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন) বিল ১৯৭৩, জাতীয় রক্ষী বাহিনী (সংশোধনী) বিল ১৯৭৪, বিশেষ ক্ষমতা (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন

১৯৭৪, জরুরি ক্ষমতা আইন ১৯৭৫, এবং বিতর্কিত সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) বিল ১৯৭৫ কোনোরূপ জনমতের প্রকাশ না ঘটিয়ে কিংবা সিলেক্ট কমিটিতে না পাঠিয়ে সংসদে পাস করানো হয়। এসব বিল নিরীক্ষা (স্ক্রুটিনী) করার ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতা যে কতো অকার্যকর ছিল, সে প্রমাণ পাওয়া যায় বিলগুলো পাস করার জন্য সংক্ষিপ্ত সময় ক্ষেপণের উদাহরণের মধ্যে। যেমন : প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স (ডিক্লারেশন ও রেজিস্ট্রেশন) সংশোধনী বিল ১৯৭৪ পাস করতে মাত্র এক ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সময় নেয়া হয়; আলোচনায় অংশ নেয় চারজন বিরোধী দলীয় এবং একজন সরকার দলীয় সংসদ সদস্য আর বিলটি পাসের সময় বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। জাতীয় রক্ষী বাহিনী (সংশোধনী) বিল ১৯৭৪-এর মতো স্পর্শকাতর বিলের জন্য সময় দেয়া হয় মাত্র আড়াই ঘণ্টা; আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয় চারজন বিরোধী দলীয় এবং দুইজন সরকার দলীয় সংসদ সদস্যকে; এই ক্ষেত্রেও প্রতিবাদস্বরূপ বিরোধী দলীয় সদস্যরা সংসদ থেকে ওয়াক আউট করেন। বিশেষ ক্ষমতা (সংশোধনী) আইন ১৯৭৪–এর জন্য আলোচনা হয় তিন ঘণ্টা দশ মিনিট; চার জন বিরোধী দলীয় এবং দুইজন সরকারি দলের সংসদ সদস্য আলোচনায় অংশ নেয়; বিরোধী দলের সদস্যরা ওয়াক আউট করেন। বিশেষ ক্ষমতা (দ্বিতীয় সংশোধনী) আইন ১৯৭৪ পাস হয় ২৫ মিনিটে; দুইজন বিরোধী দলের এবং একজন সরকার দলের সংসদ সদস্যকে আলোচনায় অংশ নিতে দেয়া হয় এবং প্রতিবাদ জানিয়ে বিরোধী দলের সদস্যরা যথারীতি ওয়াক আউট করেন। বিতর্কিত বিল, যেমন জরুরি ক্ষমতা বিল ১৯৭৫ এবং সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল ১৯৭৫ উভয়টি একত্রে মাত্র আধ ঘণ্টায় পাস করা হয়। গণতান্ত্রিক ধারায় বাধা সৃষ্টিকারী এমন সব বিল এতো সহজে পাস করার ঘটনা বলতে গেলে অবিশ্বাস্য। ভারতের সাথে তুলনা করলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে। নিরাপত্তামূলক আটক আইন ১৯৫২ পাস করতে ভারতীয় সংসদ সাড়ে ৫৭ ঘণ্টা আলোচনা করেছিল। প্রেস (অপরাধ উত্তেজনামূলক) আইন ১৯৫১–এর ক্ষেত্রে ৫২ ঘণ্টা এবং জনপ্রতিনিধিত্ব (দ্বিতীয়) আইন ১৯৫০ পাস করতে ৫২ ঘণ্টা এবং ৩৯ ঘণ্টা সময় ক্ষেপণ করা হয়। একইভাবে শেখ মুজিবের সংসদে গৃহীত সংশোধনীগুলোকে তুলনা করলে দেখা যাবে যে, ভারতের সরকার অনেক বেশি সংখ্যক সংশোধনী গ্রহণ করেছিল; এতে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রাধান্যে সংসদে ব্যক্তিগতভাবে সদস্যরা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে বহু সংশোধনী এনেছিলেন।[১৩] আর এটাই একক দলীয় কর্তৃত্বের পরও ভারতের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সাফল্য। যা শেখ মুজিবের একক সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগের ক্ষেত্রে ব্যর্থতার চিহ্ন হয়ে আছে।

শেখ মুজিবের শাসনকালে সংসদ কর্তৃক বিলগুলো যথাযথভাবে যাচাই–বাছাই ও নিরীক্ষার (স্ক্রুটিনী) ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার পেছনে দায়ী ছিল দুর্বল কমিটি ব্যবস্থার উপস্থিতি। শক্তিশালী কমিটি ব্যবস্থা গড়ে তুলার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করার মতো যথেষ্ট শক্তি বিরোধী দলের ছিল না। সে সময় মাত্র সাতটি স্ট্যান্ডিং কমিটি ছিল; এর মধ্যে একটি ছিল পাবলিক একাউন্টস কমিটি আর কয়েকটি ছিল বাছাই কমিটি, সেগুলোও

ছিল কম গুরুত্বপূর্ণ বিল বাছাই করবার জন্য। সে সময় সংসদের ৬ষ্ঠ অধিবেশনে একটি পিটিশন কমিটি গঠন করা হয়, কিন্তু তাতে কোনো দরখাস্তই দাখিল করা হয়নি। একটি মাত্র রিপোর্ট জমা দেয়া হয়, সেটা ছিল 'কার্যপ্রণালী বিধি সংক্রান্ত, এ রিপোর্ট সংসদের পঞ্চম অধিবেশন চলাকালে গৃহীত হয়। সরকার সংসদীয় কার্যক্রমের সকল সুযোগ ও সময় গ্রহণ করেছিল। কিন্তু বেসরকারি সদস্যদের কার্যক্রমের জন্য কোনো সুনির্দিষ্ট সময় দেয়া হয়নি, যেমনটি ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থায় দেয়া হয়। ফলে শেখ মুজিবের শাসনামলে প্রথম জাতীয় সংসদে বেসরকারি সদস্যদের কোনো বিল কিংবা বেসরকারি সদস্যদের কোনো সিদ্ধান্ত সংসদে উত্থাপিত হয়নি। ফলে সন্দেহাতীতভাবে সংসদের উপর শাসক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ প্রদানকারী পরিস্থিতি পরিলক্ষিত হয়।

বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৫ পাসের সময় সংসদের ক্ষয়ের চিত্র উলঙ্গভাবে প্রকাশিত হয়। এই মর্মে একটি সিদ্ধান্ত পাঠ করা হয় "এই সংসদ ২৮ ডিসেম্বর ১৯৭৪, রাষ্ট্রপতি কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সংবিধানের ১৪১ (ক) অনুচ্ছেদের ধারা (১) এর অধীন জারীকৃত 'জরুরি অবস্থা' অধ্যাদেশ অনুমোদন করছে"। আওয়ামী লীগের শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন উত্থাপিত সিদ্ধান্তে বলা হয় "জরুরি অবস্থা ঘোষণা অনুমোদনের সিদ্ধান্তে কোনো আলোচনা অনুষ্ঠান উচিত হবে না এবং ধারাগুলো স্থগিত হবে।"[১৪]

বিরোধী দলীয় সংসদ নেতা আতাউর রহমান খান তার বক্তব্যে চিহ্নিত করেন যে, এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী সঠিকভাবে করা হয়নি। স্পীকার তাঁকে বলেন যে, এই ক্ষেত্রে কার্যপ্রণালীর ধারা ১৩০-১৪৪ প্রয়োগযোগ্য হবে না এবং বিশেষ কার্যপ্রণালী এই ক্ষেত্রে অনুসরণ ও প্রয়োগ করা হবে। বিলটির উত্থাপনকারী আইনমন্ত্রি মনোরঞ্জন ধর ঘোষণা করেছিলেন যে, এই প্রস্তাব উপস্থাপনকালে সংসদীয় কার্যপ্রণালী বিধি ৭৮, ৭৯, ৮২ এবং ৯১ রহিত থাকবে।[১৫]

বিরোধী সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ সরকার আপত্তি উত্থাপন এবং সংসদে আলোচনার অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, তা না হলে এটা অগণতান্ত্রিক পন্থায় পাস হতে বাধ্য। সরকার পরে চীফ হুইপ সংসদকে জানান যে, কোনো আলোচনার অনুমতি দেয়া হবে না। যা হোক, অবশেষে বিলটি কোনো আনুষ্ঠানিক ভোট কিংবা সংসদ সদস্যদের অংশগ্রহণ ছাড়াই পাস করা হয়।[১৬] সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ সরকার, যেমনটি আশা করা হয়, তেমনি একটি মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশ দেন; কিন্তু সেটি স্পীকার গ্রহণ করেননি।[১৭]

একইভাবে সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) বিল ১৯৭৫-এর মতো উল্লেখযোগ্য ও জটিল বিল, যা একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সংবিধানের মৌলিক চরিত্র সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করেছিল, তা'ও অনুরূপভাবে তাড়াতাড়ি করে একতরফা পাস করা হয়। সাধারণভাবে, সংসদে তিনদিন বা সাত দিনের নোটিশে একটি বিলের সূচনা করা হয়। চতুর্থ সংশোধনী বিলে এমনটি তো হয়ইনি, বরং সংসদে উপস্থিত হবার পর সেটা সংসদ সদস্যদের সরবরাহ করা হয়। শেখ মুজিবের কতিপয় কাছের সহযোগী

ছাড়া বিপুল সংখ্যক সংসদ সদস্য বিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত পর্যন্ত ছিলেন না। প্রধানমন্ত্রি শেখ মুজিব, সংসদে উপস্থিত হয়ে আওয়ামী লীগ সংসদীয় দলের কিছু উচ্চপদস্থ সদস্যদের সঙ্গে খোশগল্প করেন। বিল বা বিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি শব্দও উচ্চারিত হয়নি।[১৮]

বিলটি যেভাবে উত্থাপন করা হয়, তাতে পদ্ধতিগত ত্রুটির কথা উল্লেখ করে সংসদ সদস্য আবদুল্লাহ সরকার আবারো আপত্তি জানান এবং বিলটি সম্পর্কে সংসদে কোনো সংশোধনী আনার সুযোগ না দেয়ায় এ সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠানের দাবি করেন এবং আবারো আইনমন্ত্রি মনোরঞ্জন ধর বিলটি উত্থাপনকালে যথারীতি সংসদীয় কার্যপ্রণালী ধারার ৭৮, ৭৯, ৮২ এবং ৯১-এর বিধানাবলী স্থগিত করেন। বিরোধী দলীয় সদস্যদের ওয়াক আউট সরকারের অগণতান্ত্রিক পন্থায় আইন পাসের ঘটনার প্রতিবাদ চিহ্ন হিসেবে রয়ে গেছে। বিরোধী সদস্যদের অনুপস্থিতির সুযোগে মাত্র তিন মিনিটে ভোটাভোটি সম্পন্ন করা হয় এবং ২৯৪-০ ভোটে সংবিধান (চতুর্থ সংশোধনী) বিল ১৯৭৫-এর মতো একটি স্পর্শকাতর বিল পাস করিয়ে নেয়া হয়। বিলটি পাসের সকল উদ্যোগ আধ ঘন্টারও কম সময়ে শেষ করা হয়, যাতে মাত্র একজন বিরোধী দলীয় সদস্যকে মুখ খুলতে দেয়া হয়। এইভাবে সংবিধান সংশোধন করিয়ে নিতে তড়িঘড়িভাবে সংসদের সম্মতির সীলমোহর লাগানো হয়, যা ছিল সংসদের জন্য একটি ফাঁকিবাজীর মহড়া। শাসকবর্গের আইন প্রণয়নগত কার্যক্রম সংসদীয় পন্থায় সংহত করতে শেখ মুজিব শাসনামলের জাতীয় সংসদের কোনো ক্ষমতায়ই ছিল না।

অনুরূপভাবে, শাসকবর্গের উপর অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রদত্ত ক্ষমতা চর্চা করতেও প্রথম জাতীয় সংসদ চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। এ কথা সর্বজনবিদিত যে, শাসকবর্গকে নিয়ন্ত্রণ ও যথাযথ আচরণে বেঁধে রাখার ক্ষেত্রে আইন পরিষদ বা সংসদের অন্যতম কার্যকরী অস্ত্র হলো, আর্থিক বিষয়ে সংসদের ক্ষমতা। এই ক্ষমতার কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, মুজিব আমলের প্রথম জাতীয় সংসদ কার্যকরভাবে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করার মাধ্যমে শাসন পরিষদ বা সরকার ও তার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে সফল হয়নি। জাতীয় বাজেট পাস এবং প্রাসঙ্গিক যাচাই–বাছাই করার ক্ষেত্রে শাসন পরিষদের সুস্পষ্ট প্রাধান্য বজায় ছিল।

একইভাবে, সরকারের আর্থিক হিসাবপত্র নিরীক্ষণের মাধ্যমে আইন বিভাগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার ক্ষমতাও শেখ মুজিব শাসনামলে অকার্যকর ছিল। মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষক আদেশ ১৯৭২ (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫, ১৯৭২)–এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রি মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের পদ সৃষ্টি ও কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সেটা ইংল্যান্ডের মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের মতো হয়নি; যেখানে এই পদাধিকারী সরাসরি আইন পরিষদ বা 'হাউস অব কমন্স'–এর কাছে দায়বদ্ধ থেকে আইন পরিষদের সরকারি অর্থ কমিটির ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় স্বাধীনভাবে কাজ করেন। অথচ মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষককে শেখ মুজিবের আমলে রাষ্ট্রপতির কাছে দায়বদ্ধ করা হয়, সংসদের কাছে নয়। সংবিধানের ধারা ৬(১) নির্ধারণ করে যে, মহাহিসাব নিয়ামক ও

নিরীক্ষক সরকারের আর্থিক আয়-ব্যয় সম্পর্কে এমনসব কার্যাবলী পালন করবেন, এমনসব ক্ষমতা চর্চা করবেন এবং এমন প্রতিবেদন তৈরি করবেন, যা রাষ্ট্রপতি নির্ধারণ করে দেবেন। মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষক আর্থিক প্রতিবেদনের ধরন এমনই রাখবেন, যেমনটি রাষ্ট্রপতির সম্মতি পাবে। পরিশেষে এই ধারায় তিনি (প্রধান হিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষক) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক বিষয়াদি সংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরি করে রাষ্ট্রপতির কাছে জমা দিতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি সে প্রতিবেদন জাতীয় সংসদে উত্থাপন করবেন।[১৯] এ ব্যবস্থা মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের অফিসকে দুর্বল ও অকার্যকর করেছিল। উপরন্তু পাবলিক একাউন্টস কমিটি গঠনের মাধ্যমে ঐতিহ্যগত সংসদীয় পন্থার অনুশীলনকে বিপথগামী করা হয়েছিল।

প্রথম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনেই, ১৯৭৩ সালের ৭ এপ্রিল, একজন সরকার দলীয় সংসদ সদস্যের সভাপতিত্বে পাবলিক একাউন্টস কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এর ফলে মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষক শুধুমাত্র রাষ্ট্রপতি ও সংসদের কাছে দায়বদ্ধ নন, তাকে পাবলিক একাউন্টস কমিটির সভাপতির কাছেও যেতে হতো-গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সভাপতি ছিলেন সরকারি দল আওয়ামী লীগের সদস্য। ইংল্যান্ড এবং ভারত, উভয় দেশেই পাবলিক একাউন্টস কমিটি অথবা এস্টিমেট কমিটির সভাপতির দায়িত্ব মন্ত্রিরা পান না। এসব দেশে পাবলিক একাউন্টস কমিটির সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন একজন উচ্চপদস্থ বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্য ইংল্যান্ডে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৩ পর্যন্ত পাবলিক একাউন্টস কমিটির সভাপতি ছিলেন হেরল্ড উইলসন।

মুজিব শাসনামলে বাংলাদেশে এমন একটি ব্যবস্থা ছিল, যেখানে যে কেউ পরিষ্কারভাবে নির্বাহী কর্তৃপক্ষের উপর আইন পরিষদের (সংসদ) অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের ফলাফল বুঝতে পারবে। প্রথম জাতীয় সংসদের (১৯৭৩-'৭৫) পুরো সময়কালে মাত্র তিনবার পাবলিক একাউন্টস কমিটির সভা বসে, (২৬.০১.৭৪; ০২.০২.৭৪; ০৯.০২.৯৮) যেসব সভায় মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষককে পরামর্শ দেয়া হয় এবং Modus Oerandi নিয়ে আলোচনা করা হয়। কোনো আর্থিক হিসাব প্রতিবেদন সংসদে পেশ ও আলোচনা করা হয়নি।

বিদ্যমান আলোচনা থেকে প্রথম জাতীয় সংসদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে এটাই পরিষ্কারভাবে অনুধাবন করা যায় যে, সংসদ তার কর্তব্যকর্ম পালনে ব্যর্থ হয়েছিল; নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সালিশ নিষ্পত্তিতে ভারসাম্য ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেও ব্যর্থ হয়, যা ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে লিপিবদ্ধ ছিল। সন্দেহ নেই, সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি দীর্ঘ অঙ্গীকারের ফলে শেখ মুজিব সংসদীয় ব্যবস্থার প্রাতিষ্ঠানিক করণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শাসনতান্ত্রিক পরিষদের প্রথম অধিবেশনকালে তিনি শাহ আবদুল হামিদকে সংসদীয় গণতন্ত্রে একজন স্পীকার হিসেবে তার ক্ষমতা কাজে লাগানোর তাগিদ দিয়েছিলেন। এবং সংসদীয় সম্মেলনে তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের মূল্যায়ন কতটা মৌলিক ছিল সেটা উল্লেখ করেছিলেন।[২০]

কিন্তু পরবর্তীতে ঘটনাগুলো একেবারে বিপরীত দিকে মোড় নেয়। শক্তিশালী শাসনতান্ত্রিক বিরোধী দলের অনুপস্থিতিতে সংসদীয় নেতৃত্ব ক্ষমতাসীন দলের অনুকূলেই সম্পূর্ণভাবে চলে যায়। সরকার ও বিরোধী দলের মধ্যকার আইন প্রণয়নগত ক্ষমতার ফাঁক এতো বেশি ছিল যে, সরকারের খামখেয়ালী ও অযৌক্তিক কার্যক্রমের উপর মনোযোগ দেয়া, এমন কি বিকল্প সরকারের জন্যে নির্বাচকের উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়নি। উপরন্তু, দুর্বল ও হতাশাগ্রস্ত বিরোধীরা জানতেন যে, সংরক্ষণবাদী শাসনতান্ত্রিক নীতিমালার কারণে সরকারকে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে দায়বদ্ধ করার ক্ষমতা দেখানো ছিল একেবারেই অসম্ভব। অন্যদিকে, বিরোধী দলের প্রতি সরকারের আচরণ ছিল অসহিষ্ণু ও অনাকাঙ্ক্ষিত। বাস্তব ঘটনা হলো, সে সংসদে কোনো প্রাইভেট মেম্বারস বিল অথবা প্রাইভেট মেম্বারস রেজুলেশন প্রতিপালিত হয়নি, যা বিরোধী দলের ইচ্ছাগুলোর প্রতিফলন ঘটায়।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে শেখ মুজিব তাঁর ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে ব্যর্থ হন; মুজিবের মতো একই পরিস্থিতিতে থেকে ভারতে যেটা সম্ভব করেছিলেন জওহরলাল নেহেরু। অধিকন্তু, শেখ মুজিবের প্রতি দলের সদস্যদের অন্ধ আনুগত্য, যা পাকিস্তান আমলে দলের ঐক্য ধরে রাখতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল; সেই আনুগত্যই শেখ মুজিব সরকার প্রধান হবার পর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ফলে শেখ মুজিব তাঁর দল আওয়ামী লীগের ঊর্ধ্বে কখনোই উঠতে পারেননি। তারই ফলশ্রুতিতে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার ছিল একটি দলীয় সরকার মাত্র এবং তাঁর আমলে জাতীয় সংসদ ছিল দলীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত একটি 'রাবার স্ট্যাম্প'।

এ ধরনের অবস্থায়, দলের অভ্যন্তরীণ সাংগঠনিকতা শক্তিশালী সংসদীয় কমিটির উপস্থিতিতে বিদ্যমান জনমতের ব্যাপারে নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে সতর্ক ও সচেতন করার পথে বহুদূর এগিয়ে যায়। কিন্তু মুজিব শাসনামলে এগুলোর কোনো কিছুরই অস্তিত্ব ছিল না। অধিকন্তু, প্রধানমন্ত্রি সংসদ সদস্যদের ব্যক্তি স্বাধীনতা কমিয়ে দিয়ে দলীয় চ্যানেল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। পাবলিক একাউন্টস কমিটি ও মহাহিসাব নিয়ামক ও নিরীক্ষকের সাংবিধানিক ক্ষমতা ও মর্যাদার যথাযথ প্রায়োগিক অভাব, সংবিধানের ৭৭ নং ধারায় ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা না নেয়া, সাংবিধানিক প্রস্তাব এবং বিভাগীয় অন্যায়-শাসনের তদন্ত ও প্রমাণ কমিটি কার্যকর না থাকার মতো অনিয়ম ও অব্যবস্থা শেখ মুজিবের শাসনামলে সংসদীয় ব্যবস্থার পতনের কারণ হিসেবে কাজ করেছিল।

কাঠামো ও কার্যবিধিগত দিক থেকে প্রথম জাতীয় সংসদ ছিল একটি সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান। আইন প্রণয়নগত কার্যক্রম, আইন প্রণেতাদের ভূমিকা, নীতি নির্ধারণ, আর্থিক বিষয়াদি নিয়ন্ত্রণ, নির্বাহী কর্তৃপক্ষের সমালোচনা ও তত্ত্বাবধায়ন, ক্ষতিগ্রস্তদের আবেদন জানানোর চ্যানেল প্রদান এবং শেষতঃ অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে নির্বাহী কর্তৃপক্ষকে অপসারণের ক্ষেত্রে সংসদের ক্ষমতা-এমন সব মানদণ্ডের অনুপস্থিতি মুজিব শাসনামলের সংসদীয় কার্যকলাপে পরিলক্ষিত হয়। বাস্তবিক অর্থে, সংসদে কোনো

প্রাইভেট মেম্বারস বিল, প্রাইভেট মেম্বারস রেজুলেশন ছিল না। ছিল না সরকার কর্তৃক উত্থাপিত বিলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী। সংসদের মাধ্যমে আইনগত উদ্যোগসমূহ যে পন্থায় উত্থাপন করা হয়, তা প্রমাণ করে যে, আইন প্রণেতাদের ক্ষমতা আনুষ্ঠানিক এবং কর্মে পরিণত করার ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ হলো সংসদের উত্তরাধিকার। স্বাভাবিকভাবেই, কোনোরূপ নিয়ন্ত্রণ না থাকায় মন্ত্রিপরিষদ প্রবল পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে শেখ মুজিবের আওয়ামী শাসনামলে গণমানুষের বিকাশমান আশা–আকাঙ্ক্ষা ও প্রত্যাশার কোনোরূপ প্রতিফলনই জাতীয় সংসদে ঘটেনি। মানুষের বিভিন্নমুখী ও সংঘাতপূর্ণ স্বার্থসমূহকে সংসদীয় রাজনীতিতে আনুকূল্য দেখানোর বদলে গণমুখী নেতা শেখ মুজিব সাংবিধানিক একনায়কসুলভভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। বিরোধী দলের কার্যকরী অনুপস্থিতিতে মুজিবের প্রচেষ্টা আরো সহজ সাধ্য হয়ে উঠেছিল।

সাংবিধানিক বিল (চতুর্থ সংশোধনী) ১৯৭৫ পাস করার ঘটনা হলো বাংলাদেশের প্রথম সংসদের অক্ষমতার একটি দৃষ্টান্তমূলক স্মারক।

৫.৪ চতুর্থ সংশোধনীর অধীনে সংসদের আইনগত অবস্থান

সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় এবং সামগ্রিক রাজনীতিতে কাঠামোগত ও কার্যপ্রণালীগত পরিবর্তন এনেছিল। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতি শাসিত একদলীয় শাসন ব্যবস্থায় পর্যবসিত হলো। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শানুযায়ী গঠিত চতুর্থ সংশোধনীর অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাহীদের একটি উপাঙ্গে পরিণত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রি ও মন্ত্রিপরিষদের নিয়োগ, কার্যাবলী ও অবলুপ্তির ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির স্বেচ্ছাধীন বিষয়ে পরিণত হলেছিল। মন্ত্রিপরিষদ সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির নিকট দায়বদ্ধ ছিল। রাষ্ট্রপতি তার মন্ত্রিপরিষদের যে কোনো সংখ্যক সংসদ সদস্য নয় এমন ব্যক্তিকে নিয়োগ দিতে পারতেন। এক্ষেত্রে যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে, বাংলাদেশের মতো একটি দেশে যোগ্য লোকের অভাব রয়েছে; তাই রাষ্ট্রপতি বিশেষজ্ঞদের বাস্তব জ্ঞান ব্যবহার করতে পারবেন মন্ত্রিপরিষদের তাদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে। নতুন সংযোজিত ৭৩(ক) ধারায় অসংসদ সদস্য মন্ত্রিদের ভোটাধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছিল। এছাড়া আইন প্রণয়ন, আর্থিক বিষয় ইত্যাদি সকল ক্ষমতা অর্পণ করে এবং কতিপয় বিধি–বিধান যুক্ত করে জাতীয় সংসদকে সম্পূর্ণভাবে নির্বাহীদের অধীনস্থ করা হয়। সংবিধানের ৭২ নং ধারার ১ নং উপধারায় এই মর্মে একটি নতুন শর্ত জুড়ে দেয়া হয় যে, জাতীয় সংসদ কেবলমাত্র প্রয়োজন হলেই বছরে শুধুমাত্র দুইবারের জন্য অধিবেশনে বসবে। অধিবেশনের কোনো ন্যূনতম সময়কাল উল্লেখ ছিল না, যা প্রতিষ্ঠান হিসেবে সংসদের অনুপোযুক্ততাকে চিহ্নিত করে। ৭০ নং ধারায় সংসদ সদস্যদের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকার চূড়ান্তরূপে লাগামবন্দি করা

হয়। এই ধারা আরো কঠোর করা হয়েছিল এই বলে যে, একজন সংসদ সদস্য যদি মনোনয়নদানকারী দলের বিরুদ্ধে ভোট দেন অথবা নিজ দল থেকে পদত্যাগ করেন তাহলে উক্ত সংসদ সদস্য তার সদস্যপদ হারাবেন। এই ধারার উপরোপক্ত বিধান ছাড়াও সদস্য পদ হারানোর আরো কিছু শর্ত সংযুক্ত হয়। যদি কোনো সংসদ সদস্য (ক) সংসদে উপস্থিত থেকেও ভোটদানে বিরত থাকেন অথবা (খ) যে দল তাকে নির্বাচনে মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচিত করেছে, সে দলের নির্দেশনা উপেক্ষা করে সংসদের যে কোনো অধিবেশনে নিজেকে অনুপস্থিত রাখেন; তাহলেও উক্ত সদস্য তার সংসদ সদস্য পদ হারাবেন।[২১] এছাড়াও বিধান করা হয় যে, কেউ যদি কোনো বিলে সম্মতি না দেয়ার ঘোষণা দেন, কিন্তু পরবর্তীতে সে বিলে সম্মতি দান করেন। এরূপ করা হলে, সংবিধানের ৮০(৩) ধারায় উক্ত সংসদ সদস্যকে আইন প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখা হয়েছে।[২২] অর্থাৎ তার সদস্য পদ কেড়ে নেয়া হয়েছে।

৫.৫ উপসংহার : আইন পরিষদের মর্মান্তিক মৃত্যু

সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্যে দীর্ঘ বছর রক্তাক্ত সংগ্রাম ও আন্দোলনের অতীত ইতিহাস থাকার পরেও এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ঘটনা যে, বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় সংসদের মর্মান্তিক মৃত্যু ঘটেছিল। সফলভাবে কাজ করতে সমর্থ হলে আইন প্রণেতাগণ স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিক গতিশীলতায় একটি সুদূরপ্রসারী ও ইতিবাচক আবদান রাখতে পারতেন এবং এ রকম দৃষ্টান্ত গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য আর ঐতিহাসিক উদাহরণের অভাবকে ম্লান করে দিত। কিন্তু শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের শাসনামলে জাতীয় সংসদ গণতন্ত্রের স্বপক্ষে কোনো উজ্জ্বল চিহ্ন এঁকে দিতে পারেনি। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, প্রথম জাতীয় সংসদের ব্যর্থতার জন্য কার্যকর ছিল বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট কার্যকারণ। দুর্বল নেতৃত্ব, শক্তিশালী বিরোধী দলের অনুপস্থিতি, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি, কর্তৃত্ববাদী একনায়কসুলভ রাজনীতিক সংস্কৃতি–বহু আলোচিত বহু প্রত্যাশিত সার্বভৌম সংসদকে (১৯৭৩-'৭৫) পতনের অন্ধকার গহ্বরে ঠেলে দেয়। এবং এভাবেই মুজিব শাসনামলে গণতন্ত্রের পরীক্ষায় প্রথম পরাজয় সূচিত হয়।

সূত্র ও পাদটীকা

১. Lord Bryce, *Modern Democracies*, London: Macmillan & Company Ltd., 1921, pp. ৩৬৭-৭৭

২. Sir Ivor Jennings, *Parliament*, Cambridge: Cambridge University Press, 1969

৩. J. Blondel, *Comparative Legislatures*, New Jersey: Prentice hall Ine., 1973. p.8

৪. K. C. Wheare, *Legislatures*, London: Oxford University Press, 1968

৫. বিস্তারিত দেখুন, আবুল মনসুর আহমদ, *আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৭৫

৬. রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৭, ১৯৭৩

৭. W. H. Morris Jones, *Parliament in India*, London-New York: Longmans, Green and Co., 1975. p. ৩২৪

৮. *Ibid.*, p. ৩২৬

৯. Sir Ivor Jennings, *op-cit*, p. ১১৭

১০. K. C. Wheare, *op-cit*

১১. *জাতীয় সংসদ বির্তক*, Vol.3, No.5, September 25, 1973, pp. ১৭৪-৮০

১২. W. H. , Morn's-Jones, *op-cit*, P. ২৩০

১৩. *Ibid*, pp. ৩২২-২৩

১৪. *জাতীয় সংসদ বির্তক*, Vol.1, No.2,1975, p. ৪১

১৫. *Ibid.*, p. ৪৪

১৭. দুঃখের বিষয়, মুলতবী প্রস্তাবের নোটিশের কপি পাওয়া না যাওয়ায় বিষয়বস্তু অজ্ঞাত রয়েছে।

১৮. ব্যক্তিগত সাক্ষাতকারের ভিত্তিতে।

১৯. The Comptroller & Auditor-General Ordinance, 1972, P.O. 15 of 1972

২০. *Proceedings of the Constituent Assemble,* 1972,p. ২৮

২১. Articte 7, *Constitution (Fourth Amendment)* Bill, 1975

২২. Artilce 12, *Ibid*

মুজিব আমলে সংসদীয় গণতন্ত্র

ড. মাহফুজ পারভেজ

শেখ মুজিবর রহমানের রাজনৈতিক সংগ্রামের অন্যতম বিষয়বস্তু ছিল মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার করা। পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রাম করে তিনি এ জাতির রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস গ্রহণ করেছিলেন। স্বাধীন বাংলাদেশের সূচনালগ্নে অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিব সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক শাসন কায়েম করেন। কিন্তু অচিরেই সংসদীয় ব্যবস্থা প্রত্যাহার করে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপতি শাসনে বহুদলীয় সংসদীয় ব্যবস্থার লেশমাত্র ছিল না; সেটা ছিল একদলীয় শাসন। যে কারণে সমালোচকরা গণতন্ত্রের আপোষহীন সংগ্রামী শেখ মুজিবকে আখ্যায়িত করেন 'গণতন্ত্রের হত্যাকারী' হিসেবে। কিন্তু কেন এবং কী বাস্তব প্রেক্ষাপট ও সঙ্কট-সীমাবদ্ধতার কারণে শেখ মুজিব সংসদীয় গণতন্ত্রের বদলে একদলীয় শাসন কায়েম করেন, সেটা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ না করে কেবলমাত্র ব্যক্তি মুজিবের ওপর সকল দোষারোপ আরোপ করা হলে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের গণতন্ত্র তথা সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিপূর্ণ সঙ্কট অনুধাবন করা যাবে না। তেমনিভাবে তৎকালীন সঙ্কটের আশু ফলাফল হিসেবে পরবর্তীতে যে সামরিক রাজনীতির সূচনা ঘটে সেটার কার্যকারণও নির্ণয় করা সম্ভব হবে না।

শুধু শেখ মুজিব নয়, তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নকামী দেশের বহু জাতীয় নেতার ক্ষেত্রেও দেখা গেছে যে, ঔপনিবেশিক শাসন থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর তাঁরা উদার গণতন্ত্র, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থাসহ বহু গণতান্ত্রিক আদর্শকে ধারণ করে রাজনৈতিক ব্যবস্থার উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। স্বাভাবিক কারণে এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের নেতারা নিজ নিজ রাষ্ট্রের উন্নয়ন–অগ্রগতির স্বার্থে সংসদীয়

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছেন। কিন্তু সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বাস্তব কার্যক্রম ও সাফল্যের মাত্রা ছিল খুবই কম। এমনকি, সংসদীয় গণতন্ত্রের দীর্ঘ জীবন লাভের ঘটনাও খুব একটা দেখতে পাওয়া যায় না। সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর হতে না পারার পেছনে সাধারণতঃ দু'টি কারণ লক্ষ্য করা যায়। প্রথমতঃ জনপ্রিয় নেতারা একদলীয় কর্তৃত্ববাদী রাজনৈতিক দল গঠন করে একচ্ছত্র শাসন জারি করেন। দ্বিতীয়তঃ ফৌজি শাসকরা সামরিক শাসন কায়েম করে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কবর রচনা করেন। ফলে গণতন্ত্রের অনুপস্থিতিতে জাতি লাগাতার অস্থিতিশীলতা ও সর্বব্যাপী সংকটে নিমজ্জিত হয়। জাতির আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিকসহ সামগ্রিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রার জনকল্যাণধর্মী উদ্যোগও সঙ্গত কারণে ব্যর্থতার চোরাবালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে। শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে যে, আত্মপ্রকাশের পর থেকে বাংলাদেশ কখনোই সম্পূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উপভোগ করতে পারেনি। পণ্ডিতরা অবশ্য উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পক্ষে এবং বিপক্ষে বহু কারণ উপস্থাপন করেছেন।[১] বস্তুতঃ অপরাপর উন্নয়নকামী রাষ্ট্রের মতো বাংলাদেশেরও সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতার ঐতিহ্য রয়েছে। বাংলাদেশে প্রথমে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু হলেও পরে একদলীয় ব্যবস্থাই প্রতিষ্ঠা পায়। তারপরের ঘটনা আরো নির্মম। নামে বা ছদ্মনামে যে গণতন্ত্র উপহার দেয়া হয়, তা তত্ত্বে এবং বাস্তবতায় ছিল সামরিক শাসন, আধা-সামরিক শাসন কিংবা সামরিক-বেসামরিকতন্ত্রের শাসন। পরবর্তীতে দীর্ঘ স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনের পর '৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে সূচনা ঘটে গণতন্ত্রের নব অভিযাত্রা। ১৯৯১-এর সেপ্টেম্বরে পুনরায় জবাবদিহিমূলক দায়িত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি কাজ শুরু করে। বলা বাহুল্য, মাত্র তিন বছর পর, ১৯৯৪-এর শেষে সংসদীয় গণতন্ত্রের কার্যক্রম নানা রাজনৈতিক ইস্যু ও মত পার্থক্যের কারণে চরম অকার্যকর অবস্থার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে এবং ১৯৯৬ সালে নতুন নির্বাচনের মাধ্যমে অবস্থার আপাতঃ উন্নয়ন সাধন হয়েছিল। কিন্তু ক্রমেই সে অবস্থা অবনতিশীল হচ্ছে।

৬.১ সংসদীয় গণতন্ত্রের সংকটসমূহ

ধারণা হিসেবে গণতন্ত্র আদর্শ স্থানীয় এবং সুদূরপ্রসারী, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বেশ জটিল। বিশেষ করে অনুন্নত বিশ্বে গণতন্ত্রের উত্থান-গতি খুবই ধীর এবং চর্চা আরো কঠিন। নব্য স্বাধীন দেশে বহু কারণ সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্যকে বাঁধাহত করে, সংকট ডেকে আনে। সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলের নিয়মনিষ্ঠ কার্যক্রমের অনুপস্থিতি গণতন্ত্রের ব্যর্থতার একটি প্রধান কারণ।[২] অধিকাংশ দেশের ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে, বহু মত ও পথের লোকদের সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক দল উপনিবেশ বিরোধি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী সংগঠনই রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পূর্বে, জাতীয় স্বার্থকে সামনে রেখে বহু সামাজিক শক্তি রাজনৈতিক দলের পতাকা তলে সমবেত হয়। জাতীয়তাবাদী নেতারাও ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার জন্য সকল শ্রেণী ও গোষ্ঠীর ঐক্য গড়ে তোলেন। রাজনৈতিক দলগুলোকে সুস্পষ্ট মতাদর্শ ও কর্মসূচিভিত্তিক গড়ে তোলা হয় না। রাজনৈতিক দলগুলোতে একই সঙ্গে সমাজতন্ত্রী ও

পুঁজিবাদী, ধর্মনিরপেক্ষ ও কট্টরপন্থীদের একত্রিত করা হয়। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় নেতারা আর্থ-সামাজিক কর্মসূচির ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেন না। কিন্তু স্বাধীনতার পরে জাতীয়তাবাদী নেতারা যখন আন্দোলনকারী থেকে সরকার পরিচালকে পরিণত হন; তখন তাদের কর্মসূচি ও নীতিমালার প্রেক্ষিত বদলে যায়। উদার গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ অচিরেই নেতৃবৃন্দ পরিত্যাগ করেন।[৩] দলগুলোও অভ্যন্তরীণ কোন্দলে ক্ষত-বিক্ষত হয়। কেননা স্বাধীনতার জন্য বহু মত ও পথের লোকদের একত্রে নিয়ে আসা হলেও স্বাধীনতা অর্জিত হয়ে যাবার পর ভিন্ন ভিন্ন মতের লোকজন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা গ্রহণ করে। দলীয় সংহতি ও শৃঙ্খলা ব্যাহত হয়। রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা উল্লেখিত কারণে অসংখ্য এশীয় দেশে সাফল্য লাভ করেনি।[৪] 'রাজনৈতিক সংগঠনের ভেতরে উপদলগুলো নিজ নিজ আদর্শ প্রতিষ্ঠার তীব্র লড়াই-এ অবতীর্ণ হওয়ায় বিবাদের নিষ্পত্তি করা যায় না। ফলে বহু অংশে বিভক্ত জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে।

এ রকম প্রেক্ষাপটে বিভক্ত জাতীয়তাবাদী নেতারা সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার স্থিতিশীল কার্যক্রমে দারুণ সমস্যা সৃষ্টি করেন। নেতারা জাতীয়তাবাদী চেতনা হারিয়ে বহুমাত্রিক রাষ্ট্রীয় সমস্যায় জড়িয়ে পড়েন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একজন রাজনৈতিক বিশ্লেষকের মতে : গণতন্ত্র ব্যর্থতার পেছনে জনগণের অযোগ্যতা নয় বরং বিশেষ সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থায়ই দায়ী- যেখানে আস্থাশীল বিরোধী দল বিকশিত হয়ে কাজ করতে পারে না।[৫]

সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সুসংগঠিত ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মতোই সুশৃঙ্খল বিরোধী দলের উপস্থিতিও প্রয়োজন। কিন্তু নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রে সুশৃঙ্খল বিরোধী দলের উত্থান ঘটে না। কেননা, স্বাধীনতা অর্জন হয়ে গেলে ক্ষমতাসীনরা জাতীয় ঐক্যের 'ভাঙনের অভিযোগে' বিরোধীদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক দাবিসমূহ নাকচ করে দেয় এবং বিরোধীদের অবাস্তববাদী ও দেশদ্রোহী বলে অভিহিত করে। ফলে কর্তৃত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোর বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তোলা খুবই কষ্টকর।[৬]

এছাড়াও সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শেকড় নবগঠিত রাষ্ট্রের রক্ষণশীল জীবন ধারার গভীরে প্রোথিত থাকে না। ঔপনিবেশিক শাসকরা পরাধীন যুগে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিকাশে তেমন কিছুই করে না। ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো প্রকৃতিগতভাবে কর্তৃত্ববাদী ও আমলাতান্ত্রিক ধরনের। সেখানে দেশীয় জনগণের মতামতকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে সব ধরনের নীতি ও সিদ্ধান্ত বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া হয়। ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার সমালোচনাকারী নেতারা স্বাধীনতার পর তাদের শাসনকে ঔপনিবেশিক ধারায় পরিচালনা করার নকসা তৈরি করেন।[৭]

অন্যদিকে সব নতুন রাষ্ট্রই প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার অংশ- যেখানে আধুনিক সামাজিক গতিশীলতা গড়ে তোলা কষ্টকর। সমাজ বিভিন্ন গোত্র, বর্ণ, জাতিসত্ত্বা ও সামন্ততান্ত্রিকতায় বিভক্ত। জাতীয় ঐক্যের ধারণা অস্পষ্ট। একমাত্র রাষ্ট্র ছাড়া

সামাজিকভাবে স্বীকৃত কোনো প্রতিষ্ঠানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। রাজনৈতিক দলগুলোকে কদাচিত জাতীয়ভিত্তিক বলা যায়– বস্তুতঃ দলগুলো সম্প্রদায়, গোষ্ঠী কিংবা জাতিসত্তাগত স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করে। শ্রমিক সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দল কর্তৃক সৃষ্ট এবং এদের কোনো স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত অস্তিত্ব নেই। প্রকাশনাসমূহ জাতীয়ভিত্তিক নয়, স্থানীয়। এমন কোনো গণযোগাযোগ ব্যবস্থা নেই যা সমাজে কার্যকরভাবে বিস্তৃত। সমগ্র উপরিকাঠামোই ভঙ্গুর ও ক্ষয়িষ্ণু।[৮] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অসংখ্য দেশে আধুনিকায়নের শক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রক্ষণশীলদের সংঘাতের কারণে রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে না।[৯] রক্ষণশীল সমাজে জনস্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থ–দ্বন্দ্ব লেগেই থাকে।[১০]

সর্বোপরি, অসংখ্য নতুন রাষ্ট্র তীব্র রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় ভোগে। রাজনৈতিক সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের বিকাশ–কার্যক্রম সে সকল দেশে অত্যন্ত ধীর। দলীয় শক্তি ও কাঠামোর অবক্ষয়, নেতৃত্বে ভঙ্গদশা, গণসমর্থনের অভাব, সাংগঠনিক কাঠামোর ক্ষয় প্রাপ্তি, রাজনৈতিক নেতাদের আমলাতান্ত্রিকতা, ব্যক্তিতান্ত্রিকতার উত্থান– এসব কিছুই দেশে উপনিবেশ–পূর্ব বিশৃঙ্খলার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১১]

উপনিবেশ–উত্তর রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সেখানে কতিপয় ক্যারিসম্যাটিক নেতার ব্যক্তিত্বে সামগ্রিক রাজনীতি পরিচালিত হয়। কিন্তু ক্যারিসম্যাটিক ভূমিকা প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকায় পরিবর্তিত না হলে বিভিন্ন স্বার্থের দ্বন্দ্ব অচিরেই ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে পরিণত হয়।[১২] অন্তঃদলীয় কোন্দল মিটানো ও সরকারের ঐক্য গড়ে রাখার ক্ষেত্রে অনেক রাজনৈতিক নেতার অযোগ্যতার ফলে সংসদীয় ব্যবস্থার পতন ঘটে এবং সামরিক একনায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা লাভ করে।[১৩]

পরিশেষে, নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, সেখানে কার্যকরী দল ব্যবস্থার অভাব রয়েছে। এছাড়াও কার্যকরী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থা নাগরিকদের অতি–অংশগ্রহণজনিত চাপ সহ্য করতে পারে না। ফলে কার্যকরী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে রাজনৈতিক দলের অভাবে নব্য স্বাধীন দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না এবং রাজনীতিতে সামরিক হস্তক্ষেপের পথকে সুগম করে তোলে।[১৪]

৬.২ বাংলাদেশ আন্দোলন

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিভিন্ন দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। নতুন দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম রাষ্ট্র, যা 'অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ'-এর বিরুদ্ধে সাফল্যজনক জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করেছে।[১৫] ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে যখন ব্রিটিশ শাসিত ভারত 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'র[১৬] ভিত্তিতে বিভক্ত হয়, পাকিস্তান তখন মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে আর বর্তমান বাংলাদেশ রাষ্ট্র পাকিস্তানের অংশ হয়। অবিভক্ত ভারতের মুসলিম জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শীর্ষ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় প্রধান হতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে দেখা যায় যে, সংসদীয় রীতি–নীতির প্রতি

জিন্নাহর খুব কমই শ্রদ্ধাবোধ ছিল। যদিও জিন্নাহ্ ছিলেন রাষ্ট্রের নামমাত্র প্রধান, কিন্তু তিনিই একাধারে ছিলেন ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের প্রধান, সাংবিধানিক পরিষদের সভাপতি এবং তিনি মন্ত্রিপরিষদের সভায় সভাপতিত্ব ও রাষ্ট্রের সকল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে নিজের সুদৃঢ় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতেন। জিন্নাহর পরিচর্চা ও সমর্থনে প্রশাসনিক কর্তৃত্বের ক্ষতিকর ঔপনিবেশিক ঐতিহ্য পাকিস্তানে আক্ষরিকভাবে পুনঃসংযোজিত হয়। জিন্নাহর মৃত্যুর পর লিয়াকত আলী খান উত্তরাধিকারী হিসেবে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি হন। কিন্তু আমলাতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার উপনিবেশিক ঐতিহ্য বহাল রাখতে তিনি জিন্নাহর চেয়ে কম উৎসাহী ছিলেন না। আনুগত্যহীন আমলাতন্ত্রের প্রাধান্যের পরিবেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের মূল আদর্শ– 'আইন সভার সর্বোচ্চ অবস্থান', পাকিস্তানে বিকশিত হওয়ার খুব সামান্য সুযোগ পেয়েছিল। প্রাদেশিক পর্যায়ে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কাজ করার কোনো উদার সুযোগ পায়নি। গণতান্ত্রিক আদর্শ ঘোরতরভাবে লংঘনের অসংখ্য উদাহরণ, চরম রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, রাষ্ট্রীয় নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সংসদের অবস্থান সুদৃঢ়ভাবে বজায় রাখার অযোগ্যতা এবং মাত্রাধিক বিকশিত আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনাকে পাকিস্তানের রাজনীতি ও সংসদীয় ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণ বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন।[১৭] পাকিস্তানের এই সংকটাপন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতি, পাঞ্জাবীদের নেতৃত্বে সামরিক–বেসামারিক স্বৈরতন্ত্র কায়েমে সহায়তা এবং বঞ্চিত বাঙালিদের অবশেষে জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করে।[১৮]

ষাটের দশকের মধ্যভাগে বাঙালিরা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন শুরু করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা আওয়ামী লীগ এ অঞ্চলের শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত হয়। আওয়ামী লীগের অবিসম্বাদিত নেতা শেখ মুজিবর রহমান জাতির সামনে ৬-দফা কর্মসূচি[১৯] উত্থাপন করেন এবং ব্যক্তিগত নৈপুণ্যে সমগ্র জনতার মধ্যে গণআন্দোলনের সূচনা ঘটান–যার ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে।

৬.৩ স্বাধীনতা–পরবর্তী দৃশ্যপট

স্বাধীনতার পর শেখ মুজিব বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক পরিষদ আদেশ জারি করেন–যাতে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বে নির্বাচিত কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের একত্রিত করে সংবিধান প্রণয়ন পরিষদ গঠিত হয়। সংবিধান প্রণয়ন পরিষদ এক বছরেরও কম সময়ে সংবিধানের খসড়া তৈরি এবং চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশের সংবিধান রচনা করেন– যা ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হয়। নাগরিকদের মৌলিক অধিকার ও আইন বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করে বাংলাদেশ সংবিধান ব্রিটেনের 'ওয়েস্ট মিনস্টার' ধরনের এককেন্দ্রীক সংসদীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করে।[২০]

এদিকে জনসমর্থনকে নতুনভাবে ঝালাই করে নেয়ার জন্যে আওয়ামী লীগ আগেভাগে নির্বাচন করতে আগ্রহী হয়ে উঠে। ফলে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ জাতীয় সংসদ নির্বাচন

অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের ব্যাপক নির্বাচনী বিজয় আশা করা হলেও আওয়ামী লীগ এমনই বিজয় অর্জন করে যে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা পর্যন্ত হতবাক হয়ে পড়েন। জাতীয় সংসদের তিন শত আসনে আওয়ামী লীগ ২৯৩ টিতেই বিজয়ী হয় এবং মোট ৫৬% ভাগ প্রাপ্ত ভোটের শতকরা ৭৩ ভাগই আওয়ামী লীগের পক্ষে অর্জিত হয়।[২১]

এমন 'অভূতপূর্ব' জনপ্রিয়তা থাকার পরও আওয়ামী লীগ ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। সংসদে প্রাধান্যের কারণে কোনো বাঁধা ছাড়াই একদলীয় সরকারের পক্ষে সংবিধান পরিবর্তন করে নিতে শেখ মুজিবকে কোনো বেগই পেতে হয়নি। এভাবেই বাংলাদেশে (১৯৭২-'৭৫) সংসদীয় ব্যবস্থার কার্যক্রমকে বাতিল করে শেখ মুজিবের 'ব্যক্তিতন্ত্রের' মাধ্যমে 'ব্যক্তিগত শাসন' জারি করা হয়।[২২]

শেখ মুজিব কেন সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে এক ব্যক্তির শাসন কায়েম করেছিলেন, সে কারণ নির্ণয়ের জন্য তৎকালীন রাজনৈতিক গতিশীলতার ব্যাপক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। শেখ মুজিব শাসনের শুরুতে সংবিধান প্রণয়নের কৃতিত্ব লক্ষ্য করা গেলেও শাসনের পরবর্তী বছরগুলোতে লাগাতার সঙ্কট নেমে আসে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে অন্তঃদ্বন্দ্ব, দ্রুত গড়ে উঠা বিরোধী দলের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ, সামরিক–বেসামারিক আমলাদের বিচ্ছিন্নতাবোধ, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা–এ সবের ফলে দেশে প্রায় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মতাদর্শ ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্বের ফলে উপদলীয় কোন্দল বাড়তে থাকে। প্রবীণ আওয়ামী লীগার সৈয়দ নজরুল বনাম তাজউদ্দিন এবং তরুণ আওয়ামী লীগার শেখ ফজলুল হক মনি বনাম তোফায়েল আহমেদের সংঘাত তীব্র আকার ধারণ করে। শাসক দলের অন্তঃদ্বন্দ্ব জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে ছড়িয়ে পড়ে।[২৩] মস্কোপন্থী বলে পরিচিতি আওয়ামী লীগের অর্থমন্ত্রি তাজউদ্দিন আহমেদ নীতিগতভাবে কোনো বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। বরং তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কঠোর সমাজতান্ত্রিক কৌশল প্রচলনের পক্ষপাতি ছিলেন। মার্কিনপন্থী বলে পরিচিত শিল্পমন্ত্রি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রি খন্দকার মোশতাক আহমদ মিশ্র অর্থনীতির পথ অনুসরণের চেষ্টা চালান। প্রধানমন্ত্রি শেখ মুজিব দলের অভ্যন্তরীণ এ সকল কোন্দলের ফলে বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলেন। তিনি দুই প্রধান উপদলের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে চেষ্টা করতেন। কিন্তু ১৯৭৪ সালের মধ্যভাগে দেশের অর্থনীতি যখন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়, তখন শেখ মুজিব দলের ডানপন্থী উপদলের সঙ্গে যোগ দেন। যার ফলে ১৯৭৪ সালের ৭ জুলাই তাজউদ্দিন গ্রুপের ছয়জন মন্ত্রি শেখ মুজিবের সরকার থেকে পদত্যাগ করেন এবং তাদের পদত্যাগপত্র প্রধানমন্ত্রির পরামর্শে রাষ্ট্রপতি যথারীতি গ্রহণ করেন।[২৪]

মূল সংগঠন ও যুব ফ্রন্টের মতোই আওয়ামী লীগের ছাত্রফ্রন্টেও উপদলীয় কোন্দল আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়েছিল। স্বাধীনতার ঠিক পরপরই ছাত্র সংগঠনের ভেতরে দলাদলি শুরু হয়। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে (যার ঠিক চার মাস আগে শেখ মুজিব পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন এবং ব্যাপক জনপ্রিয়তা ভোগ করছিলেন) ছাত্রলীগের মধ্যকার বামপন্থী নেতা-কর্মীরা বিদ্রোহ করে দল থেকে বেরিয়ে

আসে। আর এটা ছিল শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে প্রথম প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ। শেখ মুজিবপন্থী শেখ ফজলুল হক মনি, নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদ, ফলে শেখ মুজিবের আরো বেশি কাছে চলে আসেন। তাঁরা 'মুজিববাদ'[২৫] নামে এক নতুন ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করতে থাকেন-যা ছিল ভিন্ন ভিন্ন চারটি রাজনৈতিক আদর্শের সমন্বয়ে তৈরি একটি অদ্ভুত মিশ্রণ। অন্যদিকে শেখ মুজিব বিরোধী সিরাজুল আলম খান, আসম আবদুর রব ও শাজাহান সিরাজ 'জাসদ' নামে নতুন রাজনৈতিক সংগঠন গঠন করে 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। ফলে ভাঙনের কবলে পতিত আওয়ামী লীগ ক্রমশঃ সাংগঠনিক কার্যকারিতা হারাতে থাকে।[২৬]

শেখ মুজিবের শাসনামলে প্রশাসনের মধ্যেও দলাদলি দেখা যায়। ১৯৭২ সালে প্রশাসকদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ ফেরত 'মুজিবনগরপন্থী' এবং 'অমুজিবনগরপন্থী' দু'টি ধারা সৃষ্টি হয়। এ দুই দল পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়। এছাড়াও বেসামরিক আমলারা আওয়ামী লীগে বিদ্যমান কোন্দলে নিজেদের জড়িয়ে ফেলেছিল। সামরিক বাহিনীর সদস্যরাও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত ছিল না। মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সামরিক অফিসারদের সঙ্গে পাকিস্তান ফেরত সামারিক অফিসারদের তীব্র বিরোধ লক্ষ্য করা যায়। রাজনৈতিক দল, প্রশাসন ও সেনাবাহিনীকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা পরবর্তী শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল। বরং সে সময় দল, সরকার ও প্রশাসনের সর্বত্র দুর্নীতি শুরু হয়। যে কারণে রাজনৈতিক নেতা-কর্মী, প্রশাসক, সামরিক-বেসামরিক আমলাদের নৈতিক চরিত্রের পতন ঘটেছিল। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অযোগ্যতা শেখ মুজিব শাসনের অযোগ্যতাকে আরো ঘনীভূত করেছিল।[২৭] দলাদলি ও দুর্নীতি আওয়ামী লীগ সরকারকে সন্দেহাতীতভাবে দুর্বল করে তুলেছিল। শেখ মুজিবের উচ্চ ব্যক্তিত্ব বিবাদ-বিসংবাদ মিটাতে ও দুর্নীতি রুখতে ব্যর্থ হয়েছিল।

দলের ভেতরে মতাদর্শগত ও নেতৃত্বের সংঘাতের কারণে আওয়ামী লীগ সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক ভূমিকা পালন করতে পারেনি। অন্যদিকে, দলীয় চাপের কারণে সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারেনি। সমগ্র রাজনৈতিক ব্যবস্থাই ব্যক্তি মুজিবের কর্তৃত্ববাদী শাসনে পরিচালিত হচ্ছিল। শেখ মুজিবের কর্তৃত্ব অচিরেই সদ্য প্রতিষ্ঠিত বিরোধী দলসমূহের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) এবং বিপ্লবী বামপন্থী আত্মগোপনকারী সংগঠনসমূহ মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। হাজার হাজার ছাত্র-যুবকের সমন্বয়ে গঠিত জাসদ মুজিব সরকারের নৈরাজ্য ও নির্যাতনের প্রতিবাদে দেশব্যাপী 'ঘেরাও আন্দোলন' শুরু করে। পক্ষান্তরে মুজিব সরকার বিরোধী আন্দোলন বন্ধ করার জন্য 'নিবর্তনমূলক চরমপন্থা' গ্রহণ করে। এ অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বনকারী প্রকাশ সংগঠন যেমন, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি-ন্যাপ (ভাসানী) বাংলা জাতীয় লীগ, বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সবাদী-লেলিনবাদী) ও শ্রমিক কৃষক সমাজবাদী দল মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে 'ঐক্য মোর্চা' গঠনের মাধ্যমে শেখ মুজিব .সরকারের দুর্নীতি, রাজনৈতিক নিপীড়ন ও ভারতপন্থী মনোভাবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করে। সব ধরনের

বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে শেখ মুজিব সরকার চরম নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এছাড়াও, একমাত্র মস্কোপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া বহু বিপ্লবী বামপন্থী দল বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে 'অসমাপ্ত' ও 'ভারতের সাহায্যে অর্জিত' বলে অভিহিত করে। বিপ্লবী দলগুলো শেখ মুজিব সরকারকে ভারতের 'ক্রীড়ানক' হিসেবে আখ্যা দিয়ে আওয়ামী লীগের মাধ্যমে ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের অভিযোগ উত্থাপন করে। প্রকাশ্য ও গোপন উভয় পথেই কার্যকর থেকে বিপ্লবী বামপন্থীরা গণঅভ্যুত্থান ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকারকে উৎখাত করে বিপ্লব সম্পন্ন করতে চায়। বিরোধী দলের আন্দোলন-সংগ্রামের প্রেক্ষাপটে দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি শেখ মুজিবের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় এবং ১৯৭৪ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশ সামগ্রিক নৈরাজ্যে পতিত হয়। আন্দোলন দমনের নামে আওয়ামী লীগ সরকার হাজার হাজার বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীকে হত্যা ও আটক করে। বামপন্থীরা অভিযোগ করে যে, ১৯৭৫ সালের আগস্ট অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত সরকার ৮৬,০০০ কর্মীকে আটক করেছিল। বিশেষ করে সরকারি পেটুয়া বাহিনী নামে পরিচিতি জাতীয় রক্ষীবাহিনী 'দুর্বৃত্ত দমনের প্রচেষ্টা'র ছদ্মাবরণে দেশব্যাপী ৬০,০০০ বামপন্থী নেতা-কর্মীকে নির্মমভাবে হত্যা করে। এ সময়ে জাতীয় সংসদে কোনোরূপ আলোচনামূলক বিবেচনা ছাড়াই অসংখ্য নিবর্তনকারী আইন পাস করা হয়- যার মাধ্যমে বিনা বিচারে আটক, রাজনৈতিক-পেশাজীবী আন্দোলন স্থগিত, দ্রুত বিচারের নামে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন এবং শেখ মুজিবের অনুগত আধা-সামরিক জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে কোনো পরোয়ানা ছাড়াই কোনো ব্যক্তিকে আটক ও যে কোনো স্থানে তল্লাশি চালানোর বিশেষ ক্ষমতা দেয়া হয়; অথচ এ সকল নিপীড়নের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেয়ার কোনো সুযোগ দেয়া হয়নি।[২৮]

বস্তুতপক্ষে, শেখ মুজিব সরকার বিরোধী রাজনৈতিক আন্দোলনকে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে কোনোরূপ কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে পারেনি। বরং রাষ্ট্রযন্ত্রকে শক্তিশালী করে কঠোরতার মাধ্যমে রাজনৈতিক বিরোধিতা মোকাবিলার নেতিবাচক পন্থা গ্রহণ করা হয়। সরকার ও শাসনের পক্ষে জনমত গড়ে তোলা এবং জনগণকে রাজনৈতিক দীক্ষা প্রদানের ব্যর্থতার জন্য দলীয় নীতি ও পরিকল্পনা অকার্যকর হয়ে পড়েছিল এবং শেখ মুজিব শাসনের প্রতি জনসমর্থন ক্রমেই ক্ষীণ হতে থাকে। দুঃখজনক সত্য এই যে, ব্যাপক সংখ্যক জনগণের প্রতি লক্ষ্য রাখার বদলে বাধ্য হয়ে শেক মুজিবকে ঘর সামলাতে ব্যস্ত থাকতে এবং প্রতিনিয়ত দল ও প্রশাসনের ভেতরকার কোন্দল মিটাতে হয়েছিল।[২৯]

দেশব্যাপী নৈরাজ্যকর অনিয়ন্ত্রিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৭৪ সালের ২৮ জানুয়ারি বাংলাদেশে 'জরুরি অবস্থা' ঘোষণার মাধ্যমে সকল সাংবিধানিক অধিকার স্থগিত করে। কিন্তু এতেও নাজুক পরিস্থিতির কোনো উন্নয়ন ঘটেনি। যদিও এর আগে, ১৯৭৪ সালের এপ্রিল মাসে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার ঢাকায় প্রথমবারের মতো ১৪৪ ধারা জারি করে বিরোধী

দলীয় বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা চালায়। মূলতঃ এভাবেই আওয়ামী লীগ নির্যাতনের পথে অগ্রসর হয়-পাকিস্তানের ২৫ বছরব্যাপী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে শেখ মুজিব যে পন্থার কঠোর সমালোচনা করেছিলেন।[৩০]

আওয়ামী লীগ বিরোধী আন্দোলন দমন করতে এবং নিজের দলের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে শেখ মুজিব দলীয় সদস্যদের বাঁধার মুখেও[৩১] সংবিধানের সংশোধন করতে মনস্থ করেন এবং পরিশেষে ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস করেন। জাতীয় সংসদে এ বিলের পক্ষে ২৯৪ জন সদস্য ভোট দেন এবং কেউই বিপক্ষে ভোট দেননি। চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ সংসদীয় ব্যবস্থা ছেড়ে রাষ্ট্রপতির শাসনের অধীনে চলে আসে। সংশোধিত সংবিধান অনুযায়ী সকল রাজনৈতিক দলের কার্যক্রম স্থগিত করে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য রাষ্ট্রপতিকে দায়িত্ব দেয়া হয়।[৩২] শেখ মুজিব সংসদীয় ব্যবস্থা বাদ দিয়ে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনকে 'শোষিতের জন্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লব' বলে অভিহিত করেন। সংবিধান সংশোধনের ফলে দেশে বাংলাদেশ কৃষক-শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি মাত্র রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম হয়। আর এভাবেই শেখ মুজিব তার জীবনব্যাপী পরিচালিত গণতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

বাংলাদেশে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে স্বাধীনতা পরবর্তী শাসনকালে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার ব্যর্থতার পেছনে দলীয় কোন্দল, শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানের অভাব, বিরোধী দলীয় উস্কানিমূলক আন্দোলন ছাড়াও উল্লেখযোগ্য কারণ ছিল আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের আইন প্রণয়নগত কাজের অভিজ্ঞতার অভাব। যার ফলে জাতীয় সংসদে সংসদ সদস্যরা সাক্ষী গোপালের ভূমিকা পালন করেছিলেন মাত্র। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মনোভাব ছিল, যে কোনো প্রকারে ক্ষমতা ধরে রাখা। সে কারণে তারা দলের সর্বোচ্চ নেতা শেখ মুজিবের অন্ধ আনুগত্য করে যেতেন। আওয়ামী লীগ কর্তৃক জাতীয় সংসদে নিবর্তনমূলক আইন পাস, এমনকি সংবিধান বদল করে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে একদলীয় স্বৈরশাসন প্রতিষ্ঠার সময় পর্যন্ত দলীয় সংসদ সদস্যরা নিশ্চুপ ছিলেন।[৩৩] অন্যদিকে, আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রিদেরও আইন প্রণয়নগত যথেষ্ট অভিজ্ঞতা ছিল না। মাত্র ২ জন মন্ত্রি (মোট মন্ত্রিদের শতকরা মাত্র ৯ ভাগ) আয়ুব খানের আমলে দু'টি সাংবিধানিক পরিষদে কাজ করার পূর্ব অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। শেখ মুজিবসহ ১১ জন মন্ত্রির (মোট মন্ত্রিদের শতকরা ৪৮ ভাগ) ১৯৫৪ সালে সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে কাজ করার অভিজ্ঞতা ছিল। মন্ত্রিপরিষদের অন্য ১০ জন সদস্যের (শতকরা ৪৩ ভাগ) আইন প্রণয়নগত কাজের কোনোরূপ পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না।[৩৪]

৬.৪ সেনানিবাসগামী পথের সূচনা

সাংবিধানিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শেখ মুজিবের একনায়কসুলভ চরিত্র ধারণ তার শাসনের বৈধতা ভেঙে দেয় এবং সেনাবাহিনীর একটি অংশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথকে সুগম করে।[৩৫]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট অতি ভোরের অভ্যুত্থানের মেজর, ক্যাপ্টেন পদমর্যাদার একটি সামরিক দল শেখ মুজিব এবং তার প্রায় সকল নিকটাত্মীয়কে নির্মমভাবে হত্যা করে। শেখ মুজিবের সরকারকে বাতিল করে দিয়ে আওয়ামী লীগেরই আরেক নেতা খন্দকার মোশতাক আহমদ সরকার গঠন করেন। শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার প্রায় সকল সদস্যই স্বইচ্ছায় মোশতাক সরকারে যোগদান করেছিলেন। আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থানের পর বেসামরিক মন্ত্রিসভার কার্যক্রম এটা প্রমাণ করে না যে, দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ছিল। বস্তুতঃ পর্দার আড়ালে সেনাবাহিনীই ক্ষমতার মূল চালিকাশক্তি ছিল। বরং বাংলাদেশে বেসামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে প্রথম বারের মতো সামরিক শাসনের সূচনা তখনই ঘটেছিল। ১৯৯০ সালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সামরিক শাসন কিংবা সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রের মিশ্র শাসনের অধ্যায়ে পরিণত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, বিশেষ করে সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি সুদীর্ঘ বছরের জন্যে সুদূর পরাহত হতে বাধ্য হয়েছিল।[৩৬]

বলা বাহুল্য, শেখ মুজিব শাসনামলে সংসদীয় গণতান্ত্রিক কার্যক্রমের ব্যর্থতার ফলস্বরূপ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। স্বাধীনতার পর অতিবাহিত ২৫ বছরে, বাংলাদেশ দীর্ঘ ৯ বছর ছিল সরাসরিভাবে প্রত্যক্ষ সামরিক শাসনাধীন। আর ৬ বছর ছিল প্রচ্ছন্ন সামরিক শাসনের আওতায়। জাতীয় সংসদের ভাগ্যেও ছিল একই ললাট লিখন। এমনকি, বাংলাদেশে পূর্ণ ৭ বছর সময়কাল সংবিধান সম্পূর্ণভাবে স্থগিত ছিল। ১৯৭৫ সালের পর থেকে দেশে অসংখ্য অভ্যুত্থান ও পাল্টা-অভ্যুত্থান সংগঠিত হয়েছে। কেউ সঠিকভাবে জানে না, কত সংখ্যক সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা এ সকল রক্তাক্ত অভ্যুত্থানে প্রাণ হারিয়েছেন। শাসনকালের শেষ অর্ধাংশে জিয়াউর রহমান দাবি করেছিলেন যে, তার আমলে গণতান্ত্রিক শাসন চালু এবং বেশ কিছু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কিন্তু সেগুলো এতই ক্ষীণ ও দুর্বল ছিল যে, ব্যক্তিগতভাবে জিয়াউর রহমানের জীবনকে ফৌজি জান্তার হাত থেকে রক্ষা করতে পারেনি। দেশে সামরিক হস্তক্ষেপ রোধ করা তো সম্ভবই হয়নি। ক্ষমতাচ্যুত একনায়ক এরশাদ সেনানিবাসের ক্ষমতায় দেশ শাসন করলেও ব্যাপক রাজনৈতিক বিরোধের সম্মুখীন ছিলেন। এ সকল প্রতিক্রিয়ার ফলে বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার চরিত্র নিয়মতান্ত্রিকভাবে সরকার পরিবর্তনের ব্যর্থতা এবং ক্ষমতার গণতান্ত্রিক রীতিসিদ্ধ প্রয়োগের অযোগ্যতার আলোকে চিত্রিত হয়েছে।[৩৭] বস্তুতঃ স্বাধীনতার পরে শেখ মুজিবের শাসনামলে সংসদীয় গণতন্ত্রের ব্যর্থতাই উল্লেখিত রাজনৈতিক সঙ্কটের জন্ম দিয়েছিল। তবে যাই হোক, ৯০-এর গণঅভ্যুত্থানের পর দেশ ১৯৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে সংসদীয় গণতন্ত্রের নবঅভিযাত্রা শুরু করেছে।

৬.৫ উপসংহার : ঐতিহাসিক নিয়তি?

শেখ মুজিবের জন্য এ ঐতিহাসিক নিয়তি অত্যন্ত দুরূহ যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করে তাঁকেই এ গণতন্ত্রের কবর রচনাকারীর ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। কিন্তু এ ব্যর্থতার জন্যে একমাত্র শেখ মুজিবই কী ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ছিলেন? সম্ভবতঃ

নয়। ব্যর্থতার পেছনে ছিল এমন আরো অনেক কারণ–যার বিরুদ্ধে শেখ মুজিব যুদ্ধ পরবর্তী বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে কিছুই করতে পারেননি। হয়তো গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক লড়াই শুরু করার ব্যক্তিগত ইচ্ছা, প্রশিক্ষিত জনবল, সুশৃঙ্খল রাজনৈতিক সংগঠন, অর্থনৈতিক শক্তি, স্থিতিশীলতা, নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল, এমনকি আন্তর্জাতিক সহযোগিতা তার স্বপক্ষে ছিল না। তিনি যেমন ছিলেন নিয়তির পরিচালক, তেমনি তাকে শেষ পর্যায়ে হতে হয়েছিল নিয়তিরই হাতের পুতুল।

'মুজিব আমলে সংসদীয় গণতন্ত্রের সঙ্কট'–এর কারণ ও পরবর্তী ফলাফল আলোচনা শেষে নিশ্চিতভাবে উপসংহারে বলা যায় যে, আওয়ামী লীগ এমন কোনো প্রশিক্ষিত রাজনৈতিক দল ছিল না, যে দলের মাধ্যমে শেখ মুজিব জাতিকে গণতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে পারতেন। সে সময়, সহনশীলতা ও দায়িত্বশীলতার তীব্র অভাব থাকায় শাসক ও বিরোধী দলের সম্মিলিত কার্যক্রমে রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারেনি। আর স্বয়ং শেখ মুজিব রাষ্ট্রীয় ও দলীয় সকল ক্ষমতা নিজের হাতে কুক্ষিগত করেছিলেন এবং সরকার ও রাজনৈতিক দল–উভয়টিকেই তিনি নিজের ব্যক্তিগত শাসনের ভিত্তিতে পরিচালিত করতেন। এতো কিছুর পরও শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ এবং দলের ছাত্র–যুব অংশের ভেতরে বিদ্যমান দলাদলি, নেতৃত্ব ও মতাদর্শের উপদলসমূহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। সর্বোপরি, বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতি যে ঐকমত্য গড়ে উঠেছিল– শেখ মুজিব ও তার দলের স্বৈরতান্ত্রিকতা এবং বিপ্লবী দলগুলোর সশস্ত্র লড়াই–এর মাধ্যমে সে ঐকমত্য ভেঙে পড়েছিল। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক মতাদর্শ ও ক্ষুদ্র ব্যক্তি স্বার্থের কারণে বিরোধী নেতারা শেখ মুজিবের সংসদীয় ব্যবস্থার প্রতি সমন্বিত সমর্থন দেননি– শেখ মুজিবও বিরোধীদের রাজনৈতিক সমর্থন আদায়ে দারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছিলেন। শেখ মুজিব জাতীয় নেতা হয়েও দলীয় গণ্ডির বাইরে যেতে পারেননি। কিন্তু সংসদীয় ব্যবস্থা তখনই উৎকৃষ্টভাবে কাজ করে যখন সংসদের ভেতরে ও রাজপথে শাসক দল ও বিরোধী দল একে অপরের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। এ ধরনের সুস্থ সম্পর্ক শেখ মুজিবের শাসনামলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেখতে পাওয়া যায়নি।

এতো কিছু সমস্যার বাইরে, শেখ মুজিবের শাসনামলে সামরিক–বেসামরিক প্রশাসনের বিরাজমান দ্বন্দ্ব–সংঘাত রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাঁধাহীন কার্যক্রমকে ব্যাহত করে। প্রশাসন, রাজনৈতিক দল, সেনাবাহিনীসহ অসংখ্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সুদৃঢ় না থাকায় রাজনৈতিক ব্যবস্থা হয়ে পড়েছিল ভেতর থেকেই অস্থিতিশীল। আমলা–প্রশাসকদের মধ্যে ছিল মুজিবনগরপন্থীদের দাপট আর পাকিস্তান আমলের প্রবীণ কর্মকর্তাদের দুর্দিন। সামরিক বাহিনীতে যুদ্ধ ফেরত অফিসারদের কর্তৃত্ব এবং পাকিস্তান ফেরত উচ্চতর অফিসারদের কোণঠাসা অবস্থা। সমগ্র সামরিক বাহিনীই ছিল শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণে অবদমিত–নিজস্ব জাতীয় রক্ষী বাহিনীর ছিল রমরমা অবস্থা। রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমের সর্বত্র শেখ মুজিব ও তার উগ্র অনুসারীদের কর্তৃত্ববাদী দাপটের কারণে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল আদর্শ– আইন বিভাগের সর্বোচ্চ অবস্থান, বাংলাদেশে সে সময় রক্ষিত হয়নি। যদিও শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী

লীগের নেতাদের আইন প্রণয়নগত কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতাই ছিল না; তারপরও শেখ মুজিব দল ও দলের সংসদ সদস্যদের সংসদীয় কার্যক্রমের সঙ্গে পরিচিত করে তুলতে চেষ্টা চালাননি। বরং নিজস্ব কর্তৃত্ববাদী মনোভাবের অধীনে সকল রীতি–নীতি ও পদ্ধতিকে নিয়ে এসে সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে ব্যক্তিতান্ত্রিক শাসন বহাল রাখেন। প্রকৃত অর্থে, এভাবেই সংসদীয় গণতান্ত্রিক ধারা প্রাণহীন হয়ে পড়ে। সর্বোপরি, সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি শেষ ও চূড়ান্ত আঘাত ছিল একদলীয় শাসন পদ্ধতি প্রতিষ্ঠার ঘটনাটি। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী এনে ১৯৭৫ সালে বাকশাল গঠনের মাধ্যমে শেখ মুজিব নিজেই গণতান্ত্রিক গতিধারাকে হত্যা করেন। যার পরিপ্রেক্ষিতে, গণতান্ত্রিক সমাজের সকল রীতি–নীতি বাংলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয়। ফলাফল হিসেবে দেখা যায়, মত ও সংবাদপত্রের বন্দিদশা, আইনের শাসনের অনুপস্থিতি এবং সরকার ও জনগণের মধ্যকার সম্পর্কের সেতুটি ভেঙে যায়। জনমত আর শেখ মুজিবের সরকারের কাছে পৌঁছাইনি। স্তাবক পরিবেষ্টিত শেখ মুজিব এক একচ্ছত্র শাসনের পথে যাত্রা করেন। শেখ মুজিব নিজেও বুঝতে পারেননি যে, গণতন্ত্রের নিঃশব্দ মৃত্যুর মাধ্যমে তিনি একজন গণতান্ত্রিক থেকে স্বৈরতান্ত্রিকে পরিণত হয়েছেন। শেখ মুজিবের ভাগ্যলিপিতে লেখা হয়ে যায় অমোচনীয় অভিশাপ : ... Mujibur Rahman was the person resposible in 1975 for perverting the country's pariamentary system and turning Bangaldesh into an authoritarian, one party state.

কিন্তু এই অমোঘ ললাট লিখনই মুজিবের ভাগ্যে শেষ কথা ছিলনা। বরং "...শেষ পর্যন্ত অনেক দুঃখে, নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অনেকটা পরিস্থিতির চাপে একদলীয় পন্থায় দেশ পরিচালনার উদ্যোগ নিতে গিয়ে তিনি একদল বিক্ষুব্ধ বাঙালি সৈনিকের হাতে মর্মান্তিকভাবে নিজের জীবন দিয়ে তাঁর প্রিয় দেশবাসীর ভালবাসার ঋণ শোধ করে যান।"[৩৯]

সূত্র ও পাদটীকা

১. Dilara Choudury, "Democracy in Bangladesh: Problems and Prospects", *Asian Studies*, No. 12, June 1993. P. 1

২. Veena Kukraya, "Parliamentary Democracy in South Asia: A Regional Comparative Stuy", *India Quarterly*, 2 (2), April-June, 1986, P. 167

৩. Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issuses*, Dhaka: University Press Ltd. 1980. P. XI

৪. Norman D. Palmer, *The Indian Political System*, Boston: Houghton Miffin Company 1961, pp. 182-83

৫. J. R. E. Waddell, *An Introduction to Southeast Asian Politics*, New York: John Wiley and Sons Australasian, 1972, P. ২৬৮

৬. Roger Scott, "The Politics of New States" in R. Scott, (ed.), *The Politics of the New States*, London: George Allen and Unwin, 1970, P. 34

৭. *Ibid.*, P. 33

৮. Edward Shils, "On the Comparative Study of the New States", in Geertg Cliffore (ed.), *Old Societies and New States*, New Delhi: Amerind Publishing Co., 1971, P. 22

৯. L. W. Pye, *Southeast Asia's Palitical System*, New Jersey: Englewood Chiffs; Prentice Hall, 1987, P. 2

১০. L. W. Pye, *Aspect of Political Development*, New Delhi: Amerind Publishing Co., 1972, P. 105

১১. S. P. Huntington, *Political Order in Changing Societies*, New Haven: Yale University, 1968, P. 409

১২. L. W. Pye, 1972, P. 108

১৩. Myron Weiner, *Party Building in a New Nation: The Indian National Congress*, Chicago: The University of Chicago Press, 1967, P. 4

১৪. Siddique Ahmed Chowdhury, "Faiure of Parliamentary Democracy in the New States: A Theoetical Analysis", *Chittagong University Studies*, Vol. XI, No. 2, November 1990, P. 144

১৫. Rounaq Jahna, 1980, P. 65

১৬. V. P. Menon, *The Transfer of Power*, Princeton: Princeton University Press, 1957, P. 89

১৭. বিস্তারিত দেখুন, Muhammad A. Hakim, *Bangladesh Polities: The Shahabuddin Interregnum*, Dhaka: University Press Ltd., 1993 PP. 68-70

১৮. বিস্তারিত দেখুন, Khalid B. Sayed, *The Political System of Pakistan*, Boston: Houghton Mifflin Co., 1967. Rounaq Jahan, *Pakistan: Failure in National Integration*, New York: Columbia University Press, 1972

১৯. ছয় দফার মূল দাবি ছিল "পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রীয় পদ্ধতির সংবিধান হতে হবে, যেখানে সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সাংসদদের নিয়ে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা থাকবে।" বিস্তারিত দেখুন, M.A.W. Bhuiyan, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami Leage*, New Delhi: Vikas Publishing House Pvt. Ltd., 1982

২০. Abul Fazl Huq. "Constitution Making in Bangladesh", in Emajuddin Ahmad (ed.), *Bangladesh Politics*, Dhaka: Centre for Social Studies, 1980. P. 130

২১. Rounaq Jahan, 1980, PP. 83-4

২২. Muhammad A, Hakim, 1993, P. 71

২৩. Rounaq Jahan, 1980, P. 85

২৪. বিস্তারিত দেখুন, Talukder Maniruzzaman, "Bangladesh in 1974: Economic Crisis and Political Polarization", *Asian Survey*, 2, 1975

২৫. 'মুজিববাদ' চারটি মৌলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল: ক. গণতন্ত্র, খ. সমাজতন্ত্র, গ. ধর্মনিরপেক্ষতা, ঘ. জাতীয়তাবাদ। বাংলাদেশ সংবিধানে এই নীতিমালাকে দেশের দিক নির্দেশক আদর্শ হিসেবে লিপিবদ্ধ করা হয়। গণতন্ত্রকে ব্রিটিশ ধাঁচের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার মডেলে গ্রহণ করা হয়। বিস্তারিত দেখুন, Mahfuz Parvez, "The Fall of Parliamentary Democracy in Post-Liberation Bangladesh (1972-75): Causes and Consequences", Presented in a Seminer held in Jahangirnagar Unviersity, Dhaka on June 5, 1994

২৬. Muhammed Solaiman "Oppsition Politics and Mujib's Quest for Power (1972-75)", *The Journal of Political Science Association*, 1988, P. 163

২৭. Rounaq Jahan, 1980, PP. 85-7

২৮. বিস্তারিত দেখুন, Talukder Maniruzzaman, 1975; Muhammed Solaiman, 1988; *Far Eastern Economic Review*, "Power to Mujib's Private Army", January 10, 1975

২৯. Rounaq Jahan, 1980, P. 79

৩০. Moudud Ahmed, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman*, Dhaka: University Press Ltd., 1983, P. 218

৩১. চতুর্থ সংশোধনীর পূর্বে আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের সভায় অধিকাংশ সদস্যই সংবিধানের এই সংশোধনীর বিরোধিতা করেন। চতুর্থ সংশোধনী বিলে সমর্থন না করা হলে সংসদ ভেঙে

দেয়া হবে বলে মুজিব হুমকি দেন এবং সদস্যদের বিরোধিতাকে আয়ত্তে আনেন। বিস্তারিত দেখুন, Talukder Maniruzzaman, "Bangladesh in 1975: The Fall of the Mujib Regime and its aftermath', in *Group Interests and Political Changes: Studies of Pakistan and Bangladesh*, New Delhi: South Asian Publishers Pvt. Ltd., 1980, PP. 170-83

৩২. Siddiqe Ahmed Chowdhury, "A Critique of the Forth Amendment of Bangaldesh Constitution", *Chittagong University Studies*, Vol. XI, No.1, June 1990, P. 24

৩৩. Rounaq Jahan, 1980, PP. 147-156

৩৪. UAB Razia Akter Banu, "The Fall of Seikh Mujib Regime-An Analysis", *The Indian Political Science Review*, Vol, XV, No.1, January 1981, P. 9

৩৫. *Ibid.*, P. 14

৩৬. Baladas Ghoshal, "Bangladesh: Passage to Military Role", *Foreign Affairs Reports*, Vol. XXXI. No.8, August 1983, P. 141

৩৭. Mahbubur Rhaman, "Dysfunctional Aspects of Political Order in Bangladesh", *The Jahangirnagar Review*, Vol. XI & XII, 1986-88, P. 50

৩৮. Craig Baxter, "Bangladesh: A Parliamentary Democracy, If they can Keep it?" *Current History*, March 1992, P. 133

৩৯. সৈয়দ তোসারফ আলী, *শেখ মুজিব: একটি মূল্যায়ন*, ঢাকা: নন্দন প্রকাশ, ১৯৯৬, পৃ. ৮২

মুজিব আমলের বাংলাদেশ ও বৃহৎ শক্তি

ড. মোহাম্মদ সোলায়মান

একটি দেশের বৈদেশিক নীতি গড়ে ওঠে সে দেশের জাতীয় স্বার্থকে কেন্দ্র করে; যেখানে দেশটির ভৌগলিক-কৌশলগত অবস্থান, আভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং বৈদেশিক নীতি প্রণেতাদের বিশ্ব-দৃষ্টি প্রতিফলিত হয়। বিশেষ করে আঞ্চলিক প্রেক্ষাপটে শক্তির ভারসাম্য গড়ে তোলাও কোন দেশের বৈদেশিক নীতিতে গুরুত্ব পেয়ে থাকে। রাষ্ট্রীয় নেতার ব্যক্তিত্ব বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন ধারায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বৈদেশিক নীতি প্রণয়নে নেতার প্রভাব সম্পর্কে বহু তত্ত্ব গড়ে ওঠেছে।[১] এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, নেতার নেতৃত্ব ও তাঁর আন্তর্জাতিক আচরণের মধ্যে একটি সেতুবন্ধ রয়েছে। বৈদেশিক নীতিতে গ্রহণ-বর্জন, গুরুত্ব-গুরুত্বহীনতার বিষয়গুলো নির্ধারিত হয় নেতৃত্বের নিজস্ব অভিরুচির ভিত্তিতে; যে অভিরুচি নেতা অর্জন করেন অতীত অভিজ্ঞতা থেকে এবং যেসব অভিজ্ঞতা নেতার অভিরুচির অংশে পরিণত হয়।[২] প্রকৃতপক্ষে, কোন দেশের বৈদেশিক নীতিতে নেতা তার নীতি, আদর্শ ও অভিব্যক্তির প্রতিফলন রাখেন। একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতা দেশের জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ ও বিকাশকারী একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও গতিশীল বৈদেশিক নীতি গড়ে তুলতে পারেন। স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রি হিসেবে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে যে বৈদেশিক সম্পর্ক রচিত হয়েছিল, এ প্রবন্ধে সে পর্যালোচনা করা হবে। সেই সঙ্গে বৃহৎ শক্তির মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, অধুনালুপ্ত তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং গণচীনের সঙ্গে মুজিবের নেতৃত্বে কিরূপ সম্পর্ক গড়ে তোলা হয়েছিল সেটাই দেখা হবে।

৭.১ শেখ মুজিবের বৈদেশিক নীতির কাঠামো

শেখ মুজিবের নেতৃত্বে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ নামক একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে মূল কাজ ছিল স্বাধীনতার প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করা এবং সে লক্ষ্যেই শেখ মুজিব এমন একটি বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করতে চেয়েছিলেন, যার মাধ্যমে নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশ অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে পারে।

স্বাধীনতা সংগ্রামের আবশ্যিক চেতনার কথা মনে রেখেই শেখ মুজিব সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী একটি বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিলেন। আন্তর্জাতিক রাজনীতির বাস্তব অবস্থা এবং নতুন স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক মুক্তি অর্জনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সম্পর্কে শেখ মুজিবের ছিল পরিষ্কার উপলব্ধি। এ ধরনের সমস্যাগুলো অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক-উভয় ক্ষেত্রেই ছিল। একটি জাতি গঠনের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ কলহ ও অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডের বেড়াজাল ছিন্ন করে বেড়িয়ে আসা শেখ মুজিবের জন্য প্রকৃতপক্ষে একটি দুরূহ কাজ ছিল। সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে শেখ মুজিব দৃঢ় কণ্ঠে 'Central Treaty Organisation'-এর সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখার ঘোষণা দেন।

উল্লেখ্য, এ Treaty বা সামরিক জোট ছিল সম্পূর্ণভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট। শেখ মুজিব অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য এ Treaty বাতিল করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অঙ্গীকারের পূর্ব প্রতিশ্রুতিস্বরূপ তিনি মন্তব্য করেন : "...আমরা সকলের বন্ধুত্ব প্রত্যাশী... বাংলাদেশ তার আভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক কোন ব্যাপারেই কোন বহিঃশক্তির আদেশ-নির্দেশ গ্রহণ করবে না"।[৪]

শেখ মুজিবকে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী, স্বাধীন ও ভিন্নধর্মী একটি বৈদেশিক নীতি প্রণয়নের জন্য বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির স্থপতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রদানকালে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন : 'সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়-এই নীতিতে আমি বাংলাদেশকে প্রাচ্যের সুইজারল্যাণ্ডে পরিণত করতে চাই।'[৫] তিনি আরো বলেন : 'জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো আন্তর্জাতিক উত্তেজনার তীব্রতা কমিয়ে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগ করে নিয়েছে'। শেখ মুজিব এটাকেই তাঁর বৈদেশিক নীতির মূল ভিত্তি প্রস্তর হিসেবে চিহ্নিত করেন।[৬] তিনি বলেন : "আমার সরকার আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোট নিরপেক্ষ নীতিতে অঙ্গীকারাবদ্ধ। কিন্তু এই জোট নিরপেক্ষ নীতি বলতে আমরা কোন নিষ্ক্রিয় বা পরোক্ষ নীতি বুঝাচ্ছি না। আমরা জাতিসংঘের কাছে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার উন্নয়নের ব্যাপারে একটি ইতিবাচক ভূমিকা রাখার প্রস্তাব করছি।"[৭]

জোট নিরপেক্ষ নীতিই শেষ পর্যন্ত শেখ মুজিবের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বৈদেশিক নীতির একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ অবলম্বনে পরিণত হয়। এ নীতির দ্বারা শেখ মুজিব বুঝাতে চেয়েছিলেন : "সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো সাথে শত্রুতা নয়।"[৮] তিনি কোন নির্দিষ্ট

বৃহৎ শক্তির ছত্রছায়ায় থাকতে চাননি। বরং স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যের কথা মনে রেখেই সকল রাষ্ট্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন, এই জোট নিরপেক্ষ নীতি শান্তি অর্জনে এবং সেই সঙ্গে জাতীয় উন্নয়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে যথেষ্ট সহায়ক হবে। অবশ্য বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ব্যাপারও শেখ মুজিবের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কাজ করেছিল। সমাজতন্ত্র ছিল 'মুজিববাদ'-এর চারটি মূখ্য নীতির একটি। তাই নৈতিক সমর্থন ও আদর্শগত কারণে বাংলাদেশ স্পষ্টতই সমাজতান্ত্রিক গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলোর দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের মূল নেতৃত্বও ছিল অপেক্ষাকৃত বাম-ঘেষা। ফলে বৈদেশিক নীতি স্বভাবতই প্রভাবিত হয়েছিল।[৯]

সে যাই হোক, জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতিতে অবিচল থাকার কারণে শেখ মুজিবকে নানা ধরনের বিপরীতমুখী চাপের সম্মুখীন হতে হয়। যেমন- একদিকে তাঁর আদর্শগত সমর্থন ছিল সমাজতান্ত্রিক নীতির প্রতি; অন্যদিকে বিভিন্ন সাহায্যের জন্য পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থন প্রয়োজন ছিল। যদিও এ দুটো আর্দশই ছিল সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। বিশেষ করে, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে পুনর্গঠন এবং জাতির অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল বিভিন্নমুখী সাহায্য ও সহযোগিতার। "যদিও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো থেকেও কিছু সাহায্য পাওয়া যাচ্ছিল; কিন্তু তা একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের জন্য ছিল একেবারেই অপ্রতুল।"[১০] তাই সমাজতন্ত্রের প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অবস্থানে থাকার পরেও শেখ মুজিবকে পশ্চিমা শক্তি, বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য লাভের খাতিরে তাদের সঙ্গে সমঝোতায় আসতে হয়েছিল।

অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের লক্ষ্যে শেখ মুজিব আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে ছিলেন সম্পূর্ণ আপসহীন। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ও বিশেষ তৎপরতার জন্যে তাঁকে ১৯৭২ সালে 'World Peace Council' এর পক্ষ হইতে 'Julio Curie Medal' পুরস্কার প্রদান করা হয়। শেখ মুজিব এঙ্গোলা, গিনিবিসাউ, মোজাম্বিকের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি জোরালো সমর্থন জানান। তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুই ও নামিবিয়ায় সংঘটিত বর্ণ-বৈষম্য নীতি ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্যের কারণে নিপীড়িত জনগণের প্রতি তাঁর সরকারের পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের ২৯তম অধিবেশনে ভাষণদানকালে তিনি দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন : "বাংলাদেশের সাম্প্রতিক স্বাধীনতা সংগ্রাম শান্তি ও ন্যায়বিচার আদায়ের লক্ষ্যে বিশ্ব সংগ্রামেরই প্রতীক। এটা খুবই সঙ্গত ও স্বাভাবিক যে, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাড়িয়েছে। ...এ সংগ্রাম আগ্রাসনের মাধ্যমে বেআইনীভাবে ভূ-খণ্ড দখলের বিরুদ্ধে; সাধারণ মানুষের অধিকার অস্বীকার করার বিরুদ্ধে এবং বর্ণবৈষম্যবাদ ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্য নীতির বিরুদ্ধে।"[১১]

শেখ মুজিব ফিলিস্তিনী জনগণের প্রতি তাঁর সমর্থন জানিয়ে ইসরাইলের বেআইনী আগ্রাসনের জন্য তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কম্বোডিয়ার উপর বোমা বর্ষণ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের

কথা মনে রেখেই তিনি দক্ষিণ ভিয়েতনামের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন এবং দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের স্বাধীনতা সংগ্রামরত জনতার প্রতি সমর্থন দানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন।

এটা অবশ্যই সত্য বলে প্রতীয়মান হয় যে, শেখ মুজিবের বৈদেশিক নীতি কিছু মৌলিক সত্যের ভিত্তিতে গৃহীত হয়েছিল। যেমন– সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, জোট নিরপেক্ষ নীতি, বিশ্ব শান্তি, জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সংহতি, সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে সুন্দর ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন। প্রকৃতপক্ষে, এসব নীতি ছিল গণতন্ত্র, নৈতিকতা ও সমাজতান্ত্রিক মনোভাবের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পদ্ধতিরই একটি গতিশীল ও প্রাণবন্ত প্রতিচ্ছবি। যা হোক, জোট নিরপেক্ষ নীতি ও সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হলেও পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্র ও মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে শেখ মুজিব কখনো কখনো পরস্পর বিরোধিতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

৭.২ শেখ মুজিব ও বৃহৎ শক্তিবর্গ : সম্পর্কের মাত্রা

সাধারণভাবে বলতে গেলে শেখ মুজিব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে দ্বি-পাক্ষিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। তিনি বার বার উল্লেখ করেন যে, সকল বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সুষম-সুন্দর সম্পর্ক বজায় রেখে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবেন। শেখ মুজিব এটাও ঘোষণা করেন যে, তিনি বাংলাদেশের মাটিতে কোন বৈদেশিক সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের প্রস্তাব অনুমোদন করবেন না। সে যাই হোক, বৃহৎ শক্তিবর্গের ব্যাপারে শেখ মুজিবের বৈদেশিক নীতিকে বুঝতে হলে দুটো বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন: ১. বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি শেখ মুজিবের মনোভাব এবং ২. বাংলাদেশ সম্পর্কে বৃহৎ শক্তিবর্গের মনোভাব।

৭.৩ বাংলাদেশ-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন অনেকাংশেই নির্ভর করছিল শেখ মুজিবের রাজনৈতিক মতাদর্শ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর মনোভাবের প্রেক্ষিতে। শেখ মুজিব রাজনৈতিক জীবনের শুরু থেকেই মার্কিনীদের প্রতি দুর্বল ছিলেন। উল্লেখ্য, শেখ মুজিব তাঁর পঞ্চাশ বৎসর বয়স পর্যন্ত মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আদর্শের দিকে ঝুঁকে পড়েন। মজলুম জনতার পক্ষে সংগ্রামরত মাওলানা ভাসানীর আদর্শের চেয়ে সোহরাওয়ার্দীর মতো একজন উদার নৈতিক রাজনীতিবিদের প্রতিই শেখ মুজিব আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[১২] মুজিবের রাজনৈতিক পটভূমি ও শ্রেণী চরিত্র শহীদ সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত বুর্জোয়াদের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ জাগ্রত করার আকাঙ্খার সঙ্গেই অধিক মানানসই ছিল। শেখ মুজিব পশ্চিমা সংসদীয় পদ্ধতি সম্পর্কে নানা ধারণা সোহরাওয়ার্দীর কাছ হতেই পেয়েছিলেন। "এটা পরিলক্ষিত হয় যে, শেখ মুজিব ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বিশেষ অনুগ্রহভাজন এবং সোহরাওয়ার্দীর কাছ হতেই রাজনীতিক দীক্ষা লাভ করেছিলেন। ফলে শেখ মুজিবের

রাজনৈতিক ওয়াদাসমূহ এলিট সম্প্রদায়ের স্বার্থের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।"[১৩] বস্তুতঃ রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দীর প্রতি শেখ মুজিবের শর্তহীন আনুগত্য ছিল সর্বজনবিদিত। সোহরাওয়ার্দীকে একজন মার্কিনপন্থী রাজনীতিবিদ হিসেবে গণ্য করা হয়; যিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনুপ্রাণিত সামরিক চুক্তিতে পাকিস্তানের অংশগ্রহণের পেছনে মূল কারিগর ছিলেন এবং এরই ফলশ্রুতিতে আওয়ামী লীগ বিভক্ত হয় ও মাওলানা ভাসানী অনুগতদের নিয়ে সোহরাওয়ার্দীকে পরিত্যাগ করেন। সোহরাওয়ার্দীর মার্কিনপন্থী বৈদেশিক নীতিকে সমর্থন করেছিলেন শেখ মুজিব। তখন থেকেই শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে পশ্চিমা দেশগুলোর সমর্থক ও মার্কিনপন্থী হিসেবে বিবেচনা করা হয় এবং শেখ মুজিবও মার্কিন সামরিক মৈত্রী জোট, সেন্টো (CENTO) ও সিয়েটো (CENTO)-এর জোরালো সমর্থক ছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সংযোগের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যান্য শক্তির সঙ্গে যে ভারসাম্য সৃষ্টি করেছিল, বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ফলে সেটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন সরকার সর্বতোভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছিল। বাংলাদেশে রাজনৈতিক সংকট জেগে উঠার সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ও এশিয়ায় নিজস্ব কৌশল পুনঃনির্ধারণে ব্যস্ত ছিল।[১৪] যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেনি, বরং পাকিস্তান ও চীনের পক্ষাবলম্বন করেছিল। যখন বাংলাদেশ অনিবার্য নিয়তির মতো স্বাধীনতা লাভ করলো, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও তার প্রশাসন কি করে নতুন দেশটিকে বশে আনা যায় সে সিদ্ধান্ত নিল। শীঘ্রই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বুঝতে পারলো যে, বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজন হবে এবং সে অনুযায়ী সাহায্যের পরিমাণ বাড়িয়ে বাংলাদেশকে কব্জা ও প্রভাবিত করা যাবে।[১৫]

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি শেখ মুজিবের মনোভাব ছিল মিশ্র; একদিকে ছিল পশ্চিমা শক্তির প্রতি তার বিরোধিতাপূর্ণ মনোভাব আর অন্যদিকে ছিল তাদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা। অতঃপর তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিধি-বিধানকে উপেক্ষা করে মার্কিন জনগণের প্রকাশ্য ও মজবুত সমর্থনের বিষয়কে গুরুত্ব দেয়ার পথটি বেছে নেন।[১৬] তিনি এটা স্বীকার করেন যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে প্রচুর পরিমাণে সরকারি-বেসরকারি সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছিল।[১৭] স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের শেখ মুজিব সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দু'টি বিষয়ের উপর অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এর প্রথমটি হলোঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান; আর দ্বিতীয়টি হলো : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্য গ্রহণ।[১৮]

শেখ মুজিব সরকারের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, বাংলাদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি পাবে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কোনরূপ ইতিবাচক ঘোষণা ছাড়াই বেশ কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ায় শেখ মুজিবের সরকার বেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে, ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশের মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয়ার পর মার্কিন সিনেটে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান প্রসঙ্গে আনীত একটি প্রস্তাব পাস হয়।

১৯৭২ সালের ৪ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিকভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। তৎকালীন মার্কিন মন্ত্রি উইলিয়াম রজার্স তার বিবৃতিতে বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক উন্নয়নে তারা আগ্রহী এবং ব্যাপক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে বিপর্যস্ত বাংলাদেশকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে চায়।[১৯] তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে আবির্ভূত হয়। শেখ মুজিব যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতিকে স্বাগত জানান এবং আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, এ উদ্যোগ দু'টি জাতিকে বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মার্কিন জনগণের সমর্থনের জন্য তাদের প্রতি ধন্যবাদ জানানোর সুযোগটিও শেখ মুজিব এ উপলক্ষ্যে গ্রহণ করেন।[২০]

স্বীকৃতি জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত বাংলাদেশকে সাহায্য করবার অঙ্গীকার করে। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের মাধ্যমে ১১৫ মিলিয়ন ডলারের চেয়েও বেশি সাহায্য বাংলাদেশকে প্রদান করেছিল। ১৯৭৩ সালের ৩০ জুলাই পর্যন্ত মার্কিন সাহায্যের পরিমাণ ছিল ৪৩৩ মিলিয়ন ডলার, যা ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর থেকে প্রাপ্ত মোট বৈদেশিক সাহায্যের এক-তৃতীয়াংশ।[২১] মজার ব্যাপার হলো এই যে, বাংলাদেশ কর্তৃক মার্কিন সাহায্য গ্রহণ বিষয়ে শেখ মুজিব সরকারের মধ্যে বেশ বির্তক ছিল। সরকারের ভেতরে বামপন্থীরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের জন্য সাহায্য প্রাপ্তি ছিল খুবই জরুরী এবং শেখ মুজিব খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করলেন যে, বাংলাদেশ শর্তহীনভাবে প্রাপ্ত যে কোন বৈদেশিক সাহায্যকে স্বাগত জানাবে।

শেখ মুজিব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক-উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যার ফলশ্রুতিতে ১৯৭৪ সালের হেমন্তে তিনি ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক সফর করেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো এই যে, শেখ মুজিব এ আশাতে যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন যার মাধ্যমে তিনি দ্বৈত মৈত্রী বন্ধন ভেঙে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হৃত মধুর সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একক জোট গড়ে তুলবেন এবং ১৯৭১ সালের অপমান ও মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রি কিসিঞ্জারের বাংলাদেশ বিরোধী জোট গঠন ও তৎপরতার কবর রচনা করবেন।[২২] সফরকালে শেখ মুজিব মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে সাক্ষাত করেন, যা ১৫ মিনিট স্থায়ী ছিল। মুজিব সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রি ড. কামাল হোসেন, যিনি ওয়াশিংটন সফরে শেখ মুজিবের সঙ্গে ছিলেন– তার মতে, মুজিবের প্রতি প্রদত্ত প্রটোকল ও রাষ্ট্রীয় সম্মানে স্পষ্টতই মার্কিনীদের শীতল অবস্থানকে প্রতিফলিত করে।[২৩] ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সময় যখন দেশে দ্রুত খাদ্য-শস্য সরবরাহের জন্য শেখ মুজিবের আবেদন যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাহ্য করে, তখনই শেখ মুজিবের মার্কিন সাহায্যের আশা নিষ্ফল প্রমাণিত হয়।[২৪] এমনও পরিলক্ষিত হয় যে, আন্তর্জাতিকভাবে দেউলিয়াত্ব এবং বিশ্ববাজারে ঢাকার 'ফিন্যানসিয়াল ক্রেডিট' এর বিলুপ্তি মোকাবিলার জন্য শেখ মুজিব ও তার উপদেষ্টারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে তুষ্ট করতে ছুটে যান। কিন্তু পূর্বের মতোই এ সকল ছাড় পাওয়ার বিষয়টি কিসিঞ্জার ও মার্কিনীদের কাছে সামান্যই গুরুত্ব পায়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তিশালী পৃষ্ঠপোষক ও অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ অনুগত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যকার দ্বন্দ্ব ও বৈষম্যের সম্পর্ক ছিল এ রকম।[২৫]

বিদ্যমান অর্থনৈতিক সংকটের প্রেক্ষাপটে মার্কিন অনুদান লাভের আশায় শেখ মুজিব তার কিছু প্রধান রাজনৈতিক সমর্থকদের বাদ দিয়ে বৈদেশিক নীতির কতিপয় পরিবর্তন করার চেষ্টা করেছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৭৪ সালের অক্টোবর মাসের শেষ দিকে দক্ষিণ এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রি হেনরি কিসিঞ্জার ঢাকা এসেছিলেন; কিসিঞ্জার শেখ মুজিবের সঙ্গে দুই ঘন্টাব্যাপী আলোচনায় অংশ নেন এবং মুজিবকে 'a man of vast conception' বলে অভিহিত করেন।[২৬] মার্কিনীদের তুষ্ট করার লক্ষ্যে শেখ মুজিব কিসিঞ্জারের ঢাকা সফরের প্রাক্কালে বাম-ঘেঁষা বলে চিহ্নিত প্রভাবশালী নেতা তাজউদ্দিন আহমদকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেন।[২৭] এভাবেই মুজিব প্রগতিশীল ও ধর্মনিরপেক্ষ সহকর্মীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পথ প্রশস্ত করেন। শেখ মুজিবকে ঘিরে থাকা মোসাহেবরা তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে বুর্জোয়া ভাবধারা ছিল সেটাকে কাজে লাগিয়ে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে খেলায় আত্মসমপর্ণ করতে বাধ্য করেছিল।[২৮]

শেখ মুজিব তাঁর মন্ত্রিসভা থেকে কথিত মার্কিন বিরোধীদের বাদ দিয়ে এবং বিশ্বব্যাংকের পরামর্শক্রমে দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরি করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক সমর্থন লাভের চেষ্টা চালান। প্রকৃত অর্থে, বিশ্বব্যাংক ও দলের ভেতর মার্কিন লবী বলে খ্যাত খন্দকার মোশতাক অংশের চাপেই শেখ মুজিব যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে খুশি করার লক্ষ্যে শেখ মুজিবের সকল প্রচেষ্টা একটি সুন্দর সম্পর্কের দিকে নিয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ রাজনীতির বিশিষ্ট পর্যবেক্ষক লরেন্স লিফসুজ লিখেন... দেশের অভ্যন্তরীণ অর্থনীতির রাজনীতি ও বৈদেশিক সাহায্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বহুবিধ ছাড় দিয়ে এবং মন্ত্রিসভা থেকে চিহ্নিত মার্কিন-বিরোধীদের সরিয়ে শেখ মুজিব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে যে রাজনৈতিক সমর্থন লাভের আশা করেছিলেন, তা কখনোই সফল হয়নি। সংকট থেকে মুক্তির তীব্র আকাঙ্খায় মুজিব বিভিন্ন ছাড় দিয়েছিলেন, আদর্শের প্রতি দৃঢ় অঙ্গীকারে নয় এবং এমন প্রয়োজনীয় অবস্থান নিতে ব্যর্থ হন, যাতে পৃষ্ঠপোষক রাষ্ট্র তার উপর ভবিষ্যতের জন্য নির্ভর করতে পারে।[২৯]

ঘটনাচক্র ও তথ্য থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক চাপ, তীব্র অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও সর্বোপরি নিজস্ব বুর্জোয়া নেতৃত্বের মানসিকতার কারণে শেখ মুজিব যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মতেঃ শেখ মুজিবের শাসনামলে বাংলাদেশ-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ছিল বুর্জোয়া রোমান্টিকতায় বাঁধা সহজাত ব্যক্তিগত শুভ ইচ্ছার কাহিনী যা, শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্তদের মধ্যে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা অনুযায়ী এজেন্টদের বসিয়ে শুভেচ্ছা ও স্তাবকতা দিয়ে এমন এক অবস্থান অর্জন করে অতি শুভ ইচ্ছার উপর চাপিয়ে দেয়া হয়, যা মুজিবের মতো একজন বৈপ্লবিক নেতার ব্যক্তিত্বে নেতিবাচক বিশেষত্বরূপে কাজ করেছিল।[৩০]

৭.৪ বাংলাদেশ-সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্ক

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থনের অঙ্গীকার অনুযায়ী এবং নিজস্ব দক্ষিণ এশিয় নীতির আলোকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে

সমর্থন দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের ধুঁয়াটে ও অগণতান্ত্রিক নীতি, বিশেষ করে বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনকে দমন করবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে ভূমিকা নিয়েছিল, সে সম্পর্কে শেখ মুজিব ওয়াকিবহাল ছিলেন। এরই প্রেক্ষাপটে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে দাড়ায়[৩১] এবং দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে সহায়তা করে। এ সকল ঘটনা প্রবাহের অগ্রগতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শেখ মুজিব বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পূর্ব-সম্পর্ক সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনে মুক্তিযুদ্ধকালীন ঘটনার ধারাবাহিকতা প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রকৃতির জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন সন্তুষ্ট ছিল এবং শেখ মুজিবের এ সংক্রান্ত প্রদত্ত অঙ্গীকারে বিশ্বাস স্থাপন করেছিল। উপমহাদেশের সমস্যা সমাধানে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বি-পাক্ষিক সমঝোতার প্রতি সমর্থন দিয়েছিল। উল্লেখ্য, সোভিয়েত কূটনীতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মাধ্যমে বাংলাদেশকে ব্রেজনেভের এশিয়ার সমন্বিত নিরাপত্তা পরিকল্পনার (Asian Collective Security plan) অধীনে আনা।[৩২]

সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো অগ্রণী ভূমিকা পালন করে এবং এ ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়নই প্রথম এগিয়ে আসে। সোভিয়েত ইউনিয়নসহ সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের জন্য বাংলাদেশ একটি বড় ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এবং পুনরায় ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মস্কো সফর করেন। ১৯৭২ সালের সফর শেষে প্রকাশিত যুক্ত বিবৃতিতে আরব ভূ-খণ্ডে চলমান ইসরাইলি দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে মতৈক্য এবং দক্ষিণ ভিয়েতনামে কার্যরত বিপ্লবী সরকারের প্রতি সমর্থন পরিলক্ষিত হয়। যুক্ত বিবৃতিতে এবং পরবর্তীতে সুনির্দিষ্ট চুক্তিসমূহে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশের জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বিভিন্ন প্রকার সাহায্য দানে সম্মত হয়।

শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সুনামকে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক সৃষ্টির মোড়কে বাংলাদেশের মতো একটি সদ্য স্বাধীন দেশের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশের চেষ্টায় পুঁজি হিসেবে ব্যবহার করেছিল। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রদত্ত বৃত্তির ব্যাপক সংখ্যাধিক্যের কথা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন এক স্কোয়াড্রন বিমান সরবরাহ করে, যেসব বিমানের পাইলটদের প্রশিক্ষণের দায়িত্বভার তারা নিজেরাই গ্রহণ করে।[৩৩]

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধের পর বাংলাদেশের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্ক ব্যাপকভিত্তিক উন্নতি হয়।[৩৪] সবচেয়ে বড়ো দৃশ্যমান প্রকল্প ছিল চট্টগ্রাম বন্দর কার্যকারি করা।[৩৫] এ রকম একটি প্রকল্পকে বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে হাতে নেয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য

ছিল ব্যাপক পরিমাণ প্রয়োজনীয় ত্রাণ সামগ্রী বন্দর দিয়ে প্রবেশ করানো। অধিকন্তু, চট্টগ্রাম বন্দর পরিষ্কার করা অতি গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কারণ দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনে বন্দরের অগ্রণী অবদান অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশের জন্যে দেয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি খুব বেশি ছিল না।[৩৬] সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে ১৮ মিলিয়ন পাউণ্ডের মতো অপর্যাপ্ত সাহায্য প্রদানের অঙ্গীকার করেছিল।[৩৭] এ কথা বলা যেতে পারে যে, প্রত্যক্ষ দান ও ঋণ হিসেবে দেয়া সোভিয়েত সাহায্য যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের ব্যাপক প্রয়োজনের নিরিখে পর্যাপ্ত ছিল না।[৩৮] লক্ষণীয় যে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৪ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত সময়কালে সর্বমোট ৪৫১.৯৪ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে সর্ববৃহৎ একক ঋণদাতা দেশে পরিগণিত হয়। ৩৩৯.৯ মিলিয়ন ডলার প্রদানকারী ভারত দ্বিতীয় এবং ১৩৮.৮৬ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়ে সোভিয়েট ইউনিয়ন পঞ্চম অবস্থানে ছিল।[৩৯] উল্লেখ্য, সোভিয়েত প্রদত্ত অপর্যাপ্ত সাহায্যের কারণে শেখ মুজিব পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন।

শেখ মুজিবের ধৈর্যচ্যুতি ও অনির্ণীত বহু ক্ষেত্রে বিশাল অংকের বৈদেশিক সাহায্যের প্রয়োজনীয়তার পটভূমিতে সোভিয়েত-বাংলাদেশ চলমান সম্পর্ক মুখ থুবড়ে পড়ে। বাংলাদেশকে প্রগতিশীল পথে রাখার জন্য বলিষ্ঠ উদ্যোগ গ্রহণের শক্তি সঞ্চয়ের পূর্বেই শেখ মুজিব সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের শিকার হন। অধিকন্তু, সোভিয়েত বন্ধুত্ব দ্বারা পরিচালিত হবার মতো নেতা শেখ মুজিব ছিলেন না। প্রকৃতিগতভাবে মুজিব বামদের প্রতি সন্দেহপ্রবণ ছিলেন; তিনি তাঁর সোভিয়েত মিত্রদের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দবোধ করতেন না বলেই অবশেষে ঘটনা পরম্পরায় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন। বলা বাহুল্য, এটা ছিল শেখ মুজিবের নেতৃত্বের মারাত্মক বৈপরিতা, যা বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির জ্বলজ্বলে মোচড় খাওয়াও বটে।

৭.৫ বাংলাদেশ-চীন সম্পর্ক

গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে শেখ মুজিব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। যদিও স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় চীন বাংলাদেশের সঙ্গে বিদ্বেষমূলক আচরণ করায় বাংলাদেশের পক্ষে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা সম্ভব ছিলনা, তথাপি শেখ মুজিব চীনের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। শেখ মুজিব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশ বৃহৎ প্রতিবেশি চীনের সঙ্গে খুব সঙ্গত কারণেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক পুনঃস্থাপনে প্রত্যাশী হবে... "তবে সেটা ভিক্ষার আশায় নয়।"[৪০] শেখ মুজিব পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত চীন-বাংলাদেশ মৈত্রী ও বন্ধুত্বের পক্ষে ওকালতি করেছিলেন। মজার ব্যাপার হল, চীন শেখ মুজিবকে কট্টর চীন-বিরোধী হিসেবে বিবেচনা করতো।[৪১] চীনের বিদ্বেষের কথা বিবেচনা করে বিশিষ্ট রাষ্ট্র বিজ্ঞানী জি ডব্লু চৌধুরী অভিমত দেন যে, ১৯৭১ সালে নতুন রাষ্ট্র হিসেবে অভ্যুদয়ের স্মৃতি মনে থাকায় চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক ছিল সন্তোষজনক অবস্থানের বহু দূরবর্তী।[৪২]

এদিকে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলো এই যে, ১৯৭২ সালের ১০ আগস্ট নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভের জন্য বাংলাদেশের আবেদন পত্র গৃহীত হলে চীন সেটার বিরোধিতা

করে। কারণ চীন ছিল সে পরিষদের স্থায়ী সদস্য। এটাও লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতাদের কাছে চীন শত্রুভাবাপন্ন দেশ হিসেবে বিবেচিত হতো। মুক্তিযুদ্ধকালীন শত্রুতা আরো প্রমাণিত হয়, যখন চীন নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যপদ লাভে প্রত্যাশী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভেটো দেয়। এমনকি, মুক্তিযুদ্ধকালের প্রধান প্রতিপক্ষ পাকিস্তান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উভয় দেশই বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও চীন ১৯৭৫ সালের আগস্টের আগ পর্যন্ত, শেখ মুজিবের শাসনকালে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানে অস্বীকৃতি জানায়।[৪৩]

যাই হোক, চীনের স্বীকৃতি আদায়ে বাংলাদেশ কূটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল এবং পরবর্তীতে চীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে। অবশ্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পূর্ব প্রমাণস্বরূপ চীন ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশকে এক মিলিয়ন ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।[৪৪] এই দ্বি-পাক্ষিক নীতির ভিত্তিতে চীন ও বাংলাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ ধীরে ধীরে বিস্তৃতি লাভ করে। শেখ মুজিব চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন আদর্শগত বাঁধা খুঁজে পাননি। তাছাড়া তিনি ভৌগলিক অবস্থানের ইতিবাচক দিকগুলোর কারণে চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক উন্নয়নে বিশেষ জোর দেন।[৪৫]

৭.৬ উপসংহার : জাতীয় স্বার্থের সংরক্ষণ

বিভিন্ন প্রসঙ্গে আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই শেখ মুজিব বৈদেশিক নীতির মূলতত্ত্ব প্রণয়ন করেছিলেন। শেখ মুজিবের বৈদেশিক নীতির মূলতত্ত্ব ছিল : সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সংহতি প্রকাশ, সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক ও বন্ধুত্ব বজায় রাখা এবং জোট নিরপেক্ষ অবস্থানে দৃঢ় থাকা। শেখ মুজিব জোট নিরপেক্ষতার আদর্শে বৈদেশিক নীতির মূলভিত্তি রচনা করে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর দ্বি-পাক্ষিক নীতি গ্রহণ ছিল আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ কৌশল। বিশ্ব শক্তি সম্পর্কে তাঁর ধারণা ভৌগলিক আবশ্যকতা, আর্থ-সামাজিক অগ্রাধিকার ও অভ্যন্তরীণ বাধ্যবাধকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

শেখ মুজিব বৃহৎ শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন কৌশলগত বিবেচনা এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে। স্বাধীনতা যুদ্ধকালের তিক্ত অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেন। যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা যুদ্ধে, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে ও বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষের সময় সাহায্য করেনি, তথাপি তিনি মার্কিনীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছিলেন। স্বাধীনতার পর থেকেই শেখ মুজিব বাংলাদেশের পুনর্গঠন ও উন্নয়নের জন্যে বহির্বিশ্বে আর্থিক উৎস খুঁজছিলেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করেছিলেন সাহায্য লাভের প্রত্যাশায়। যখন মার্কিনীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার চেষ্টা করছিলেন, তখন তিনি একই সঙ্গে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায়ের চেষ্টা করছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, শেখ মুজিবের কাছে যুক্তরাষ্ট্র ছিল গুরুত্বপূর্ণ সাহায্যের উৎস। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে গড়ে ওঠা সম্পর্ক ছিল বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই। কিন্তু শেখ মুজিবের মরণপণ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে

সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রাপ্ত সাফল্য ছিল সীমিত। অন্যদিকে, একটি নব্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশ হিসেবে নিজস্ব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই তিনি সোভিয়েত ব্লকভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। শেখ মুজিবের বৈদেশিক নীতির অন্যতম দিক ছিল, একই সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক এবং সোভিয়েত ব্লকভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। কিন্তু আওয়ামী লীগের মধ্যে ভাঙন, দেশের বিপর্যস্ত অর্থনীতির কঠোর বাধ্যবাধকতা ও নব্য ঔপনিবেশিক শক্তির ষড়যন্ত্রের জন্য শেখ মুজিবের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার যে আদর্শগত অঙ্গীকার ছিল, তা ধীরে ধীরে ভোঁতা হতে থাকে। চীন বাংলাদেশকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হতে বিরোধিতা করা সত্ত্বেও শেখ মুজিব চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব বজায় রেখেছিলেন। ভৌগলিক অবস্থানের ইতিবাচকতাই শেখ মুজিবকে চীনের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষায় পরিচালিত করেছিল।

সে যাই হোক, শেখ মুজিব সচেতন প্রচেষ্টার মাধ্যমে বাংলাদেশকে শুধুমাত্র উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে নয়, বরং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি বিশেষ স্থান করে দেয়ার জন্যে কৃতিত্বের দাবীদার। শেখ মুজিবের দূরদর্শীতার জন্যেই বাংলাদেশ আন্তঃদেশীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি আত্মসম্মানবোধ সম্পন্ন ভূমিকা পালন করতে পেরেছিল। এজন্য বাংলাদেশের বৈদেশিক নীতির কাঠামো গঠনের জন্য শেখ মুজিব প্রথম রাজনৈতিক নেতা হিসেবে কৃতিত্বের অধিকারী।

সূত্র ও পাদটীকা

১. বৈদেশিক নীতিতে ব্যক্তিত্বের ভূমিকার নানা দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন, Margaret Herman, "Leader, Personality and Foreign Policy Behaviour", in James N. Rosenau (ed.), Comparing Foreign Policies: Theories, Findings and Methods, New York: Halstead, 1974, pp. 211-230; Joseph H. de Revera, *The Psychological Dimension of Foreign Policy,* HIO: Columbus, 1968.

২. B. M. Jain, *Indo-US Relations During the Kennedy Era,* Ph.D Dissertation, Jaipur: University of Rajastan, 1982, PP. 62-68

৩. *The Times of India,* New Delhi: 15 January, 1972

৪. *The Hindustan Times,* New Delhi: 5 January, 1972

৫. *The Bangladesh Observer,* Dhaka: 15 January, 1972

৬. Virendra Narain, *Foreign Policy of Bangladesh,* Jaipur: Aalekh Publishers, 1987, P. 52

৭. S. M. Ali, *After the Dark Night,* New Delhi: Thomson Press Ltd., 1973, P. 129

৮. *Bangladesh Documents*, Vol. I & II, New Delhi: Publication Diviston, Government of India, 1971-72, P. 81; *The Bangladesh Observer,* Dacca: 15 January, 1972.

৯. P. Chopra, "Bangladesh: In Search of a Role", *India Quarterly,* Vol. 28 No. 2, 1972, p. 120

১০. বাংলাদেশে প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন,
Iftekhar A. Chowdhary, Bangladesh External Relations: *The Strategy of Small Power in a Sub-system,* Ph.D Dissertation, Jaipur: University of Rajasthan 1980, pp. 289-303

১১. GAOR, 29th Session, 25 December, 1974

১২. Muhammad Solaiman, "Nature and Pattern of Leadership in Pre-Liberation Bangladesh," *The Jahangirnagar Review*, Part II, Vol. XI, XII, 1990, p. 115

১৩. Kathleen Gough and Hari P. Sharma (eds.), *Imperialism and Revolution in South Asia,* New York: Monthly Review Press, 1973, P. 168

১৪. M. R. Shelly, *Emergence of a New Nation in a Mutlti-polar World: Bangladesh*, Dhaka: Oxford University Press, 1979, P. 111
১৫. *The New York Times*, New York : 6 Janauary, 1972
১৬. *The New York Times*, 6 April, 1972
১৭. *The New York Times*, 9 April, 1972
১৮. Emajuddin Ahamed, (ed.), *Foreign Policy of Bangladesh: A Small States Imperative*, Dhaka: University Press Ltd, 1984, P. 70
১৯. *The New York Times*, 25 April, 1972
২০. *The New York Times*, 6 April, 1972
২১. U. S. Office of the Coordination of Relief and Rehabilitation, Dhaka: 1973
২২. Lawrence Lifschultz, *Bangladesh: The Unfinished Revolution*, London: Zed Press, 1979, p. 140
২৩. মুজিবের পররাষ্ট্রমন্ত্রি ড. কামাল হোসেনের সাক্ষাৎকার, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা, ১৩৯
২৪. *The New York Times*, 27 October, 1972
২৫. Lawrence Lifschultz, (1979), p. 142
২৬. পূর্বোক্ত
২৭. ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর অর্থমন্ত্রি তাজউদ্দিন আহমেদকে শেখ মুজিব মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেন, বিস্তারিত, Muhammad Solaiman, "Sheikh Mujib's Leadership: The Socio-Economic Dimensions, "*Asian Studies*, No. II, 1991, pp. 44-63
২৮. Muhammad Solaiman, "The Fall of Sheikh Mujibur Rahman", *The Jahangirnagar Review*, Vol. III, 1989, p. 78
২৯. Lawrence Lifscultz, (1979), p. 144
৩০. Virendra Naraian, (1987), p. 65
৩১. Bangladesh Documents, (1971-72), p. 65
৩২. S. M. Ali, (1973), p. 158
৩৩. Bhawani Sengupta, "Soviet Union and Bangladesh", in *Problems of Communism*, Vol. 24, 1975, p. 19
৩৪. *Road to Communism*, Documents of the 22th Congress of CPSU, Moscow: Foreign Language Publishing House, 1971, p. 491
৩৫. Peter Lyon, "Bangladesh: Fashioning a Foreign Policy", *South Asian Review*, Vol. 5, 1972, p. 235
৩৬. S. W. Simon, "China, the Soviel Union and the Sub-Continent Balance", *Asian Survey*, Vol. 13, No. 7, 1973, p. 654
৩৭. পূর্বোক্ত
৩৮. Iftekhar A. Chowdhury, (1980), p. 293
৩৯. J. P. Jain, *Soviet Policy Towards Pakistan and Bangladesh*, New Delhi: Radiant Publishers, 1978, pp. 184-185
৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৯
৪১. G. W. Chowdhury, *India, Pakistan, Bangladesh and the Major Power Politics of Divided Sub-continent*, London: Free press, 1975, P. 211
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৮—২৩৯
৪৩. Virendra Narain, (1987), p. 136-137
৪৪. *OECD Reprot*, Development Corporation, 1975, p. 176
৪৫. *বাংলার বাণী*, ঢাকা : ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪

শেখ মুজিবের একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা

ড. তারেক শামসুর রেহমান

স্বাধীনতার পরপরই একদলীয় বাকশাল (বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ) গঠন বাংলাদেশের রাজনীতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি এক অধ্যাদেশ বলে বাকশাল গঠন করা হয়।[১] এজন্য যে শাসনতান্ত্রিক সংশোধনী (১১৭ ক) আনা হয়েছিল, তা 'চতুর্থ সংশোধনী' নামে পরিচিত। এ সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিবর রহমান একটি 'জাতীয় দল' বাকশাল গঠন করতে পেরেছিলেন। বাকশাল গঠনের সাথে সাথে অন্যান্য সংগঠনের অবলুপ্তি ঘটলো। কমিউনিস্ট পার্টি অব বাংলাদেশ (সিপিবি), ন্যাশনাল আওয়ামী ,পার্টি (ন্যাপ-মোজাফফর) ছাড়া অন্য কোন সংগঠন বাকশালে যোগ দেয়নি। একদলীয় ব্যবস্থা চালু হবার সাথে সাথে বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের মৃত্যু ঘটলো। এর ফলে শেখ মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন[২] সেই প্রতিশ্রুতি তিনি ভঙ্গ করলেন।

বাকশাল ব্যবস্থা বাংলাদেশে বেশি দিন টিকে থাকতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব সরকারের পতনের সাথে সাথে এই ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। শেখ মুজিবের পতনের পর খন্দকার মোশতাক আহমদের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়, তারা একদলীয় ব্যবস্থা বাতিল করলেন এবং পুনরায় বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতিশ্রুতি দিলেন। আর এভাবেই বাংলাদেশের রাজনীতিতে একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থার অবসান ঘটে। তবে ১৯৮৩ সালে আওয়ামী রাজনীতির এক ক্ষুদ্র অংশ বাকশাল নামে পুনরায় সংগঠিত হয়েছিলো। এখানে পার্থক্যটা হচ্ছে তারা একদলীয় রাজনীতির বদলে বহুদলীয় রাজনীতিতে আস্থাশীল ছিলেন। এই বহুদলীয় বাকশালও বেশি দিন টিকে থাকতে পারে নি। ১৯৯১ সালে তারা বাকশালের অবলুপ্তি ঘটিয়ে মূলস্রোত আওয়ামী লীগে ফিরে গিয়েছিলেন।[৩] বাংলাদেশের রাজনীতিতে একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা একটি বিতর্কিত অধ্যায় হিসাবে চিহ্নিত হলেও, বাকশাল নিয়ে গবেষণা হয়েছে খুব কম। মনে

রাখতে হবে এ ব্যবস্থা টিকে ছিল মাত্র সাত মাস। এ ব্যবস্থা বিকশিত হবার আগেই ছেদ পড়লো। তবে বাংলাদেশের অন্যান্য সংগঠনগুলো একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থার ব্যাপারে উৎসাহ না দেখালেও সোভিয়েত রাজনীতির সমর্থক বলে পরিচিত সিপিবি ও ন্যাপ (মো) আগ্রহ দেখিয়েছিল এবং যতদূর জানা যায়, সোভিয়েত ইউনিয়নও উৎসাহী ছিল। তারা তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এই ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিলেন। বাংলাদেশে সিপিবি ও ন্যাপ (মো) তাদের স্বার্থ প্রতিনিধিত্ব করতো এবং এই দুটো সংগঠনের মাধ্যমেই এই একদলীয় ব্যবস্থা বাংলাদেশে পরোক্ষভাবে উত্থাপিত হয়েছিল। আলোচিত প্রবন্ধে বাকশাল গঠনে সিপিবি ন্যাপ (মো)-এর ভূমিকা বিশ্লেষণ, সোভিয়েত দৃষ্টিকোণ থেকে বাকশাল এর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং বাকশাল কাঠামো আলোচনায় এনে শেখ মুজিবের একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থাকে পর্যালোচনা করা হবে।

৮.১ বাকশাল : সোভিয়েত তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে

বাকশাল ব্যবস্থা সম্পর্কে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রহ ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের শেষের দিনগুলোতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থনের পরপরই স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের আগ্রহ দেখা যায়। প্রথম থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, বিশেষ করে সিপিবি, ন্যাপ (মো) ও আওয়ামী লীগের সমন্বয়ে একটি ঐকবদ্ধ মোর্চা গঠন করার আহ্বান জানিয়ে আসছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি। ঠিক এক মাসের মধ্যে বাংলাদেশ সফরে এসে সোভিয়েত প্রতিনিধিরা মন্তব্য করলেন যে, বাংলাদেশ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে আগেই সাহায্য আশা করতে পারবে, যদি বাংলাদেশ সরকার প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর সাথে ঐক্য গড়ে তোলে।[৪] সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রগতিশীল সংগঠন বলতে সিপিবি ও ন্যাপ (মো) বুঝাতো।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল বিশ্বের একটি দেশ এবং উন্নয়নশীল বিশ্ব সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে। সেই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করেই সোভিয়েত ইউনিয়ন বাকশালের ব্যাপারে আগ্রহী হয়েছিল। উন্নয়নশীল বিশ্ব সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে নীতি, সে নীতির পেছনে রয়েছে আদর্শ। আর এই আদর্শ হচ্ছে মার্কসবাদ। কিন্তু এই মার্কসবাদী আদর্শ, ঘটনার প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন সময়ে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত হয়েছে। প্রতিটি দেশের রাজনীতিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখেই এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধিত হয়েছে। অধ্যাপক আলাভিন রুবিনস্টাইন লিখেছেন, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল কাঠামোকে সামনে রেখে যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তাতে বলা হয় যে, সোভিয়েত নেতারা আদর্শকে বিসর্জন দেননি এবং মনে করেন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীর সঠিক বিশ্লেষণের জন্য এই আদর্শের প্রয়োজন রয়েছে। অকমিউনিস্ট দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আদর্শের পরিবর্তন হয়েছে বলে তিনি মনে করেন এবং বিশ্বাস করেন বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর জন্য এটা পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করবে।[৫] আদর্শের এই পরিবর্তনের জন্যই দেখা যায়, সোভিয়েত নেতারা বিভিন্ন সময়ে 'দু-স্তর বিশিষ্ট বিপ্লবী কিংবা অধনবাদী পথে উন্নয়ন' প্রভৃতি তত্ত্ব হাজির করেছেন। তারা মনে করতেন সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবি নয়, বরং পুঁজিবাদী কাঠামোয় সমাজতন্ত্রের কিছু উপাদান নিয়ে মিশ্র অর্থনীতির আওতায় তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়ন সম্ভব।

ষাটের দশকে উন্নয়নশীল বিশ্বে এক ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এ সময় তৃতীয় বিশ্বে নাসের, সুকর্ণ, নেহেরু, লুমুম্বার মত নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। এরা সমাজতান্ত্রিক ছিলেন না। ছিলেন জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় বিপ্লবী ও প্রচণ্ড রকমের পশ্চিমা তথা সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী। এরা এদের স্ব স্ব দেশে ব্যাপক পরিবর্তন এনেছিলেন। একই সঙ্গে ভূমি সংস্কার, মিল-কারখানা রাষ্ট্রায়ত্তকরণ, রাষ্ট্রীয় খাতের প্রসার, বিদেশী পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের ব্যাপারে বাঁধা-নিষেধ আরোপ ইত্যাদি সোভিয়েত তাত্ত্বিকদের আকর্ষণ করেছিল। এদের এই উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে সামনে রেখেই ১৯৬০ সালে মস্কোতে ৮১টি দেশের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক সংগঠনের উপস্থিতিতে ন্যাশনাল ডেমোক্রেসির তত্ত্ব উপস্থাপন করা হয়।[৬] ১৯৬১ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির ২২তম কংগ্রেসে তৃতীয় বিশ্বের জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়াদের 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেট' হিসাবে আখ্যায়িত করা হয় এবং বলা হয় এদের নেতৃত্বে যেসব দেশ পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলো প্রগতিশীল, বিপ্লবী ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী।[৭] সোভিয়েত তাত্ত্বিকরা উন্নয়নশীল বিশ্বে প্রগতিশীল সংগঠনগুলোর সমন্বয়ে একটি 'ঐক্যফ্রন্ট' গঠনের কথাও বলেছিলেন। সোভিয়েত তাত্ত্বিকদের মতে অধনবাদী পথে বিকাশের সাথে উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজ কাঠামোর যে পরিবর্তন সাধিত হয় তা সমাজতন্ত্রে উত্তরণের পথে সহায়ক।[৮] তারা যুক্তি দেখিয়েছেন যে তৃতীয় বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম মিত্র তাই কমিউনিস্ট পার্টিগুলো হতে পারে না। বরং জাতীয় বুর্জোয়ারাই হচ্ছে প্রকৃত মিত্র। অধ্যাপক উলিয়ানভস্কি এ ব্যাপারে যুক্তি দেখিয়ে বলেছেন : এশিয়া ও আফ্রিকাসহ উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় বুর্জোয়ারাই তাদের প্রভাব, দক্ষতা, সাংগঠনিক গুণ ও জনগণের মাঝে জনপ্রিয়তার কারণে সেখানে যে বিপ্লব সংগঠিত হচ্ছে, তার নেতৃত্ব দিচ্ছে। সমাজ থেকে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে উৎখাত করে জাতীয় বুর্জোয়া ও তাদের সহযোগী বামপন্থী বন্ধুরাই প্রকৃতপক্ষে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন।[৯]

সোভিয়েত তাত্ত্বিকরা 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ' ও 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেট'দের মাঝে মিল লক্ষ্য করেছেন। তাদের মতে 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ হচ্ছে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ'।[১০] এরা পরিচালিত হয় জাতীয় স্বার্থে এবং এই 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ'ই পরবর্তীতে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাঠামো অতিক্রম করে সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে পরিণত হয়।[১১] সোভিয়েত তত্ত্ব অনুযায়ী 'জাতীয় মুক্তিযুদ্ধ' দুই স্টেজে পরিচালিত হয়। প্রথম স্টেজে জনগণ একটি বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করে। এই বিপ্লব হচ্ছে জাতীয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। এ সময য জাতীয় বুর্জোয়ারা ঔপনিবেশবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের দিকে হাত বাড়ায় এবং তাদের সাথে একটা সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের লক্ষ্যে ভিত্তি গড়ে যায়।[১২] দ্বিতীয় স্টেজে 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেট' বা জাতীয় বুর্জোয়ারা তাদের বামপন্থি বন্ধুদের সমন্বয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্যোগ নেন বা প্রতিষ্ঠা করেন ও তারা মার্কসবাদ-লেনিবাদকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন।[১৩]

সোভিয়েত তত্ত্বে যে 'ন্যাশনাল ডেমোক্রেট'দের কথা বলা হয়েছিল, শেখ মুজিব ছিলেন সেই ন্যাশনাল ডেমোক্রেট। মুজিবকে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাংলাদেশে

সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। সোভিয়েত তত্ত্বে যে দ্বিতীয় স্টেজের কথা বলা হয়েছিল, বাকশাল সেই দ্বিতীয় স্টেজের অংশ, যাতে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপ (মো) 'তথাকথিত সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়।

৮.২ বাংলাদেশে মস্কোপন্থী সংগঠনগুলোর ভূমিকা

সোভিয়েত তত্ত্বে উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয় বুর্জোয়াদের ভূমিকাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হলেও, সোভিয়েত রাজনীতি সমর্থিত স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টি ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলোর ভূমিকাকে ছোট করে দেখা হয়নি। বলা হয়েছিল, এরা এক সাথে কাজ করবে ও একটি ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গড়ে তুলবে। এদের কাজ হবে জাতীয় বুর্জোয়াদের সাথে নিয়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাওয়া। স্বাধীনতা উত্তর সিপিবি ও ন্যাপ (মো)-এর ভূমিকা সোভিয়েত তত্ত্বে বর্ণিত কথাই প্রতিধ্বনিত করে।

১৯৭২ সালে ঢাকায় সিপিবি প্রথমবারের মত আত্মপ্রকাশ করে। কেননা ১৯৫৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর থেকে পার্টির কর্মকাণ্ড তেমন একটা ছিল না। ন্যাপ (মো) ছিল সিপিবির একটি অঙ্গ সংগঠন। স্বাধীনতার পরপরই এরা আওয়ামী লীগের 'বি' টিম হিসেবে কাজ করতে শুরু করলো। ১৯৭২ সালের ১৫ জানুয়ারি ন্যাপ নেতা নলিনী দাস প্রথমবারের মত আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপ (মো)-এর সমন্বয়ে একটি 'ফ্রন্ট' গঠনের আহ্বান জানালেন। তিনি বললেন, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় এই ফ্রন্ট গঠন অত্যন্ত জরুরি। এর ঠিক দশ দিন পর ন্যাপ নেতা আলতাফ হোসেন পুনরায় আহ্বান জানালেন 'ফ্রন্ট' গঠনের। ফেব্রুয়ারি মাসে চট্টগ্রাম ও ফেনীতে দু'টি জনসভায় সিপিবি সভাপতি মনি সিং আওয়ামী লীগ প্রণীত নীতির প্রতি সমর্থন জানিয়ে ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠনের আহ্বান জানালেন। ২৮ ফেব্রুয়ারি ন্যাপ কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় গৃহিত এক প্রস্তাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতিকল্পে আওয়ামী লীগ সরকারের সহযোগিতা করার জন্য প্রগতিশীল শক্তিগুলোর প্রতি আহ্বান জানান হয়। ন্যাপ নেতা মহিউদ্দিন খুলনায় এক জনসভায় ঘোষণা করলেন যে, তার দল আওয়ামী লীগকে রাষ্ট্রের চার মূলনীতি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে। ১৯৭২ সালের ৩০ এপ্রিল ন্যাপের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং তাতে গৃহিত এক প্রস্তাবে 'ফ্রন্ট' গঠনের আহ্বান জানান হয়। মে মাসে ন্যাপ সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদের মুখে শোনা গেল একটি সর্বদলীয় সরকার গঠনের আহ্বান।[১৪] জুলাই মাসে (১৯৭২) সিপিবির একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল মস্কো গেলেন। মস্কোতে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাথে তারা আলোচনায় মিলিত হলেন। গুরুত্বপূর্ণ এই আলোচনায় সোভিয়েত পার্টির নেতৃত্ব দেন পার্টির পলিটব্যুরোর বিকল্প সম্পাদক প্যানোমারেভ। আর সিপিবির নেতৃত্ব দেন সিপিবি সভাপতি মনি সিং। আলোচনায় অভিমত পোষণ করা হয় যে, প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তির সমন্বয়ে 'ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট' গঠনের উপর গুরুত্ব দিতে হবে।[১৫] বছর শেষ হবার আগে আওয়ামী লীগের কেউ কেউ 'ফ্রন্ট' গঠনের দাবি সমর্থন করলেন। ৯ ডিসেম্বর সিপিবির সভায় প্রথমবারের মত বলা হয় যে, সমস্যা সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে 'ঐক্যফ্রন্ট' গঠন করা। ১৯৭৩ সালের মে মাসে তিনটি সংগঠনের (আওয়ামী লীগ, সিপিবি ও ন্যাপ) ছাত্র সংগঠনগুলো একটি ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট গঠন করে। জুলাই ও আগস্ট মাসে বাংলাদেশ সরকারের বেশ কয়েক জন কর্তা ব্যক্তি আমন্ত্রিত হয়ে মস্কো সফরে

যান। তারা ফিরে আসার আগেই প্রথম ত্রি-দলীয় ঐক্যজোট গঠনের কথা শোনা যায়। ৫ আগস্ট কুমিল্লায় এই জোট গঠনের কথা শোনা যায়। ২৬ আগস্ট ঐক্যজোট গঠিত হয় বগুড়ায়। সেপ্টেম্বর মাসে সরকার ঘোষণা করে যে, রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকে সামনে রেখে প্রগতিশীল সংগঠনগুলোকে নিয়ে একটি ঐক্যফ্রন্ট গঠন করা হবে। অক্টোবর মাসে আলোচিত 'গণ ঐক্যজোট' গঠিত হয়। ১৯ সদস্য বিশিষ্ট যে কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়েছিল, তাতে ১১ জন ছিলেন আওয়ামী লীগ থেকে, ৫ জন ন্যাপ (মো) থেকে ও ৩ জন সিপিবি থেকে। গণঐক্যজোট গঠনের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে সোভিয়েত পত্র-পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়েছিল যে, উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের সমাজ প্রগতির লক্ষ্যে কি ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তা বাংলাদেশে একটি ঐক্যফ্রন্ট গঠনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে।[১৬] ফ্রন্ট গঠনের দু'মাসের মধ্যে সিপিবি'র প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। কংগ্রেস ফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্তকে 'বিপ্লবী' হিসাবে আখ্যায়িত করে। সোভিয়েত অর্থে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত বিশ্ব শান্তি পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রমেশ চন্দ্র ১৯৭৪ সালের ৫ মে ঢাকায় ফ্রন্ট গঠনের ধারণাকে সমর্থন করেন। এ সময় আওয়ামী যুব লীগের ভূমিকাও লক্ষ্য করার মত। যুবলীগ এ সময় ঘোষণা করেছিল যে, যুবলীগ আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন নয়। শুধমাত্র প্রধানমন্ত্রি অর্থাৎ শেখ মুজিবের কাছেই যুবলীগ জবাবদিহি করবে। যুবলীগ প্রধান শেখ মনি বলেছিলেন বাংলাদেশে সংসদীয় পদ্ধতি ব্যর্থতায় পরিণত হয়েছে। এজন্য প্রয়োজন একটি 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' এবং স্বয়ং শেখ মুজিবই এই 'দ্বিতীয় বিপ্লবের' নেতৃত্ব দেবেন।[১৭] এখানেই মস্কোপন্থী সংগঠন ও সোভিয়েত বক্তব্যের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। এরা সবাই চাচ্ছিলেন শেখ মুজিবকে রেখেই একটা ব্যাপক পরিবর্তন, যা কিনা সোভিয়েত তত্ত্বকেই সমর্থন করে।

বাংলাদেশে ত্রি-দলীয় ঐক্যজোট গঠিত হলেও তা সামগ্রিক অবস্থার কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। দেশের অবস্থা খারাপ থেকে খারাপের দিকে যাচ্ছিলো। দুর্নীতি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হল। এ সময় ক্লার স্টারলিং যুক্তরাষ্ট্রের সাময়িকী 'আটলান্টিক'- এ (সেপ্টেম্বর ১৯৭৪) লিখলেন : লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছেন, কেননা তাদের কাছে খাওয়ার কিছুই নেই। এমনি এক পরিস্থিতিতে সিপিবি এক নতুন প্রস্তাব নিয়ে এলো। শেখ মুজিবের কাছে দেয়া প্রস্তাবে বলা হয়েছিল : ১. ব্যাপক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে দেশের সম্পদের সুষ্ঠ ব্যবহার করতে হবে, ২. প্রেসিডেন্সিয়াল পদ্ধতি চালু করতে হবে, ৩. প্রেসিডেন্ট প্রগতিশীল ও সৎ লোকদের সমন্বয়ে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করবেন। প্রগতিশীল ও সৎ লোকদের নেয়া হবে প্রগতিশীল সংগঠনগুলো থেকে (অর্থাৎ সিপিবি ও ন্যাপ), ৪. জাতীয় সংসদ থাকবে। তবে তার কোন ক্ষমতা থাকবে না। মন্ত্রিরা সংসদের কাছে দায়ী থাকবেন না।[১৮] মুজিব সিপিবির এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন ও ২৫ জুন ১৯৭৫ সালে শাসনতন্ত্র সংশোধন করে একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা চালু করলেন। ঢাকার সোভিয়েত দূতাবাস শেখ মনির মাধ্যমে শেখ মুজিবের কাছে বাকশালের প্রস্তাব উপস্থাপন করেছিল।[১৯] প্রকৃতপক্ষে গণঐক্যজোটের পরবর্তী সংস্করণ হচ্ছে বাকশাল। সোভিয়েত ইউনিয়ন বাকশাল ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছিল ও আশা করেছিল যে, এতে করে এই দুটো দেশের মাঝে সম্পর্কের আরো উন্নতি ঘটবে।[২০] এভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমর্থন নিয়ে সিপিবি ও ন্যাপ (মো)-এর সহযোগিতায় শেখ মুজিব বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা কায়েম করেছিলেন।

৮.৩ বাকশাল : একদলীয় শাসন

শাসনতন্ত্রের সংশোধনীতে (১১৭ ক) শেখ মুজিবের হাতে যে ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল, সে ক্ষমতা বলে শেখ মুজিব একটি 'জাতীয় পার্টি' বাকশাল, গঠন করেছিলেন। বাকশাল গঠনের সাথে সাথে অন্যান্য পার্টির অবলুপ্তি ঘটলো। সিপিবি ও ন্যাপ (মো) ছাড়া সাংগঠনিকভাবে অন্যকোন সংগঠন বাকশালে যোগ দেন নি। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট যে নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হয়েছিল, তার পুরোটা নেয়া হয়েছিলো আওয়ামী লীগ থেকে।[২১] বাকশাল ব্যবস্থায় শেখ মুজিব প্রেসিডেন্ট হলেন ও সব ক্ষমতা তার হাতে অর্পিত হল। শেখ মুজিব যে মন্ত্রিসভা গঠন করলেন তার সদস্যদের পুরোটা নেয়া হল আওয়ামী লীগ থেকে। শুধু প্রতিমন্ত্রির একটি পদ দেয়া হল সাবেক ন্যাপ (মো) নেতা সৈয়দ আলতাফ হোসেনকে। বাহ্যত: বাকশাল ছিল আওয়ামী লীগেরই বিকল্প নাম। এই বাকশাল ব্যবস্থা সাধারণ মানুষের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে চালু করা হয়নি। এর উদ্দেশ্য ছিল একটিই। শেখ মুজিবের অবস্থান, তথা আওয়ামী লীগকে আরো শক্তিশালী করা। অধ্যাপক তালুকদার মনিরুজ্জামান এ ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন যে, নতুন ব্যবস্থা ছিল অনেকটা 'সোভিয়েত ব্যবস্থাকে নকল করা। কিন্তু তার আদর্শকে প্রত্যাখান করা'। এই নতুন ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল বিরোধী দলগুলোকে পরিপূর্ণভাবে নিঃস্তব্ধ করে দেয়া ও দুর্নীতিপরায়ণ মুজিব পরিবারের পারিবারিক শাসনের ঐতিহ্য বজায় রাখা।[২২]

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাকশালে অন্যান্য সংগঠনের উপস্থিতি ছিল অত্যন্ত সীমিত। ১১৫ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে মস্কোপন্থী বলে পরিচিত মাত্র ৭ জনকে নেয়া হয়েছিল।[২৩] বাকশালের গঠনতন্ত্র শেখ মুজিব অগাধ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন চেয়ারম্যান। কিন্তু এটা উল্লেখ ছিল না যে, চেয়ারম্যান কিভাবে নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে তিনিই পার্টির চেয়ারম্যানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। যে ১৫ জন নির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন, এরা কেউই পার্টি ফোরামে নির্বাচিত হননি। বরং মুজিব কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। যে কারণে এরা সবাই মুজিবের প্রতি অনুগত থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন (বাকশাল শাসনতন্ত্র ধারা ১০ উপধারা ২)। মুজিব ইচ্ছে করলে কোন কারণ ছাড়াই এদের যে কাউকে চাকরিচ্যুত করতে পারতেন ও এজন্য তাঁকে কারো কাছে জবাবদিহি করতে হত না। পার্টির চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বিতার কোন ব্যবস্থা না থাকায়, মুজিব পরিণত হয়েছিলেন স্বৈরতান্ত্রিক একনায়কে।[২৪] বাকশালের সদস্যপদের ব্যাপারেও বাঁধা নিষেধ ছিল। ধারা ৬, উপধারা ৫গ-তে বলা হয়েছে নির্বাহী পরিষদই সিদ্ধান্ত নেবে, কেউ সদস্যপদের জন্য উপযুক্ত কিনা। এই নির্বাহী পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করতেন মুজিব। পরোক্ষভাবে মুজিবের হাতেই অর্পিত হয়েছিল সদস্যপদে কাউকে নিযুক্তির ক্ষমতা। কেন্দ্রীয় কমিটিতেও মুজিবের ক্ষমতা ছিল অসীম। এখানে পার্টি চেয়ারম্যানকে ক্ষমতা দেয়া হল এক তৃতীয়াংশ (১১৫ জনের মধ্যে) সদস্যকে মনোনয়নের (ধারা ১২, উপধারা ৪, ৫)। ১১৫ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন মস্কোপন্থীবাদে বিরোধী দলের ৩ জন ব্যক্তিত্ব (জাতীয় লীগের সভাপতি আতাউর রহমান, ভাসানী ন্যাপের হাজী দানেশ ও উপজাতী নেতা মং প্রু সু) বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। এর বাইরে ২৩ জন সিভিল ও মিলিটারী ব্যুরোক্রেট বাকশালের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যপদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। বাকশালের চতুর্থ স্তরে একটি কাউন্সিল

গঠনের কথা বলা হয়েছিল। যদিও এই 'কাউন্সিল' শেষ পর্যন্ত গঠিত হতে পারেনি। শাসনতান্ত্রিক ধারায় (১২, উপধারা ১৬) বলা হয়েছিল যে, চেয়ারম্যান (শেখ মুজিব) কাউন্সিলে ৫০ জন সদস্য পর্যন্ত মনোনয়ন দিতে পারেন। এমনকি জেলা প্রতিনিধিদেরকেও তিনি মনোনীত করবেন (১, গ)। ধারা ২৪, উপধারা ২-এ বলা হয়েছে, কোন সদস্য যদি বাকশালের কাঠামো থেকে পদত্যাগ করে, সেখানে নতুন কাউকে মনোনয়ন দেবেন স্বয়ং চেয়ারম্যান। বিভিন্ন সেক্টর কর্পোরেশন, সেনাবাহিনী, বিডিআর ও প্রশাসনিক উচ্চ পর্যায় থেকে যারা মনোনীত হবেন, তাদের মনোনয়ন চূড়ান্ত করবেন চেয়ারম্যান (ধারা ১০, উপধারা ১০, ১৬, ২.২)। এমনকি বাকশালের কোন কাঠামো যদি পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, কিংবা শাসনতন্ত্র সংশোধন করা যদি জরুরি হয়ে ওঠে, তাহলে চেয়ারম্যান তা এককভাবে করতে পারবেন (ধারা ১২, উপধারা ১ ও ২) এবং এজন্য তাকে কারো কাছে জবাব দিতে হবে না। সুতরাং এই যে ব্যবস্থা, যে ব্যবস্থায় শেখ মুজিবকে অসীম ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল তাঁকে আমরা কি বলতে পারি? একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা? নাকি স্বৈরাতান্ত্রিক একনায়কতন্ত্র? ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বোধকরি শেষের বক্তব্যই সমর্থন করবে।

৮.৪ উপসংহারঃ বির্তকিত ব্যবস্থা?

তত্ত্বগতভাবে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বাকশালের ব্যাপারে উৎসাহিত হলেও, শেষের দিকে এ ব্যাপারে তাদের মোহমুক্তি ঘটে। শেখ মুজিবের উৎখাতের পর সোভিয়েত বিশ্লেষকরা মন্তব্য করেছিলেন যে, বাকশাল ব্যবস্থায় জনগণের প্রত্যাশা পূরণ হয়নি।[২৫] তবে এটা সত্য যে, সোভিয়েত তত্ত্বে অধনবাদী পথে উন্নয়নের যে কথা বলা হয়েছিল, বাকশালের তা ছিল না।[২৬] একজন মার্কসবাদী বিশ্লেষক বাকশাল ব্যবস্থা সমাজতান্ত্রিক নয় বলেও মন্তব্য করেছেন।[২৭] মওদুদ আহমদের মূল্যায়ন হচ্ছে বাকশাল গঠনের কারণ ছিল অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, নিজের ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।[২৮] কিন্তু মুজিবের উদ্দেশ্য যাই ছিলো না কেন, এটা জানা হল না তিনি কি চেয়েছিলেন। এমনও আভাস পাওয়া গেছে শেখ মুজিব সীমিত সময়ের জন্য বাকশাল ব্যবস্থা চালু করেছিলেন।[২৯] উন্নয়নশীল বিশ্বে জাতীয়তাবাদী নেতারা এ ধরনের একদলীয় ব্যবস্থা চালু করেছিলেন অতীতে (ঘানা, জাম্বিয়া, তানজানিয়া)। তারা সবাই যে সোভিয়েত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদলীয় ব্যবস্থা চালু করেছিলেন, তেমন নয়। তবে স্পষ্টতই বাংলাদেশে বাকশাল ব্যবস্থা প্রবর্তনের ব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের হাত ছিল। তারা মুজিবের সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তবে বাকশাল ব্যবস্থা সম্পর্কে চূড়ান্ত মন্তব্য করা যায় না। কেননা এই ব্যবস্থা পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারেনি। শেখ মুজিবের মৃত্যু সব প্রশ্নের কবর রচনা করলো ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এবং বাংলাদেশের রাজনীতিতে বির্তকিত ব্যবস্থা হিসেবে বাকশালেরও অবসান ঘটালো।

সূত্র ও পাদটীকা

১. শেখ আব্দুর রশীদ, *যুগ পরিক্রমায় বাংলাদেশের সংবিধান*, ঢাকাঃ সিটি প্রকাশনী ১৯৯৪

২. *Bangladesh Observer*, 11 January, 1972

৩. *বিচিত্রা*, ২ আগস্ট ১৯৯১, পৃষ্ঠা. ১৯-২০

৪. মাদাম সুখারভেজর মন্তব্য, *দৈনিক সংবাদ*, ঢাকা: ২৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২
৫. Alvin Z Rubinstein(ed.), *The Foreign Policy on the Soviect Union*, New York: 1922, p. 386
৬. *Current Digest of the Soviet Press* (CDSP), XII, 49, 4, 1960
৭. Leo Gruliow & Charlotte Saikowski (ed.), *Current Soviet Politics*, IV, 1962, p. 1-11
৮. B. Mokolyeu, "Third World-Choice of Path", *International Affairs*, (INTAF), Moscow: July, 1970, p. 11-16.
৯. R. Ulyanovsky, "The Third World-Problems of Socialist Orientation," *International Affairs*, (INTAF,) September, 1974, p. 26-35
১০. F. Kim'র উদ্ধৃতি Ishwer C. Ojha, *The Kremlin & the Third World Leadership-Closing the Circles*, in W. Raymond Duncan (ed.), *Soviet Policy in Develoring Countries*, London-Toronto, 1970, p. 19
১১. V. L. Tyagurenko'র উদ্ধৃতি Ishwer Co. Ojha, ঐ, পৃষ্ঠা. 20.
১২. *World Marxist Review*, London: 8, 1979, pp. 61-81, No. 3, 1959, pp. 66-81
১৩. R. A. Ulianovsky'র উদ্ধৃতি Robert H. Donaldson, *Soviet Policy Towards India-Ideology & Strategy*, Harvard University Press, 1979, p. 181
১৪. তারেক শামসুর রেহমান, *সোভিয়েত-বাংলাদেশ সম্পর্ক*, ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯৩.
১৫. *সংবাদ*, ১৮ আগস্ট, ১৯৭২
১৬. *Neu Zeit*, Moscow: December, 1973, p. 14
১৭. *বাংলার বাণী*, ঢাকা: ১২ ও ১৩ অক্টোবর, ১৯৭৪
১৮. অধ্যাপক ভবানী সেনগুপ্তের সাথে কমরেড মনি সিং-এর আলাপচারিতা, Bhabani Sengupta, "Moscow & Bangladesh" in *Problems of Communism*, Washington: April-May, 1975, p. 64
১৯. Tolukder Maniruzzaman, "Bangladesh in 1975: The Fall of Mujib and its Aftermath", *Asian Survey*, February, 1976, p. 121
২০. *Bangladesh Observer*, 30 january, 1975
২১. নির্বাহী পরিষদের সদস্য ছিলেন যথাক্রমে শেখ মুজিবর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মনসুর আলী, খোন্দকার মোসতাক আহমদ, এ, এইচ, এম কামরুজ্জামান, ইউসুফ আলী, আবদুল মালেক উকিল, মনোরঞ্জন ধর, ড. মোজাফফর আহমদ, শেখ আবদুল আজিজ, মহিউদ্দিন আহমদ, গাজী গোলাম মোস্তফা, জিল্লুর রহমান, শেখ ফজলুল হক মনি, ও আবদুর রাজ্জাক। *সংবাদ* ৭ জুন, ১৯৭৫
২২. Tolukder Maniruzzaman (1976), p. 121
২৩. এই ৭ জন হচ্ছেন অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ, খন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, আতাউর রহমান (রাজশাহী), পীর হাবিবুর রহমান, সৈয়দ আলতাফ হোসেন, মোহাম্মদ ফরহাদ ও মতিয়া চৌধুরী।
২৪. *Daily Telegraph*, London: 27 January, 1975
২৫. V. Shurysin's article in *Pravda*, 3 Oct. 1975, quoted in R. K. Jain, *Soviet South Asian Relation: 1947-78*, New Jersey, 1979, p. 187
২৬. আলী রিয়াজ, "বাকশাল-গণতন্ত্র না একনায়কতন্ত্র", *তারকালোক*, ঢাকা: ১-১৮ অক্টোবর, ১৯৮৫
২৭. হায়দার আকবর খান রনো, "এ মোহ পরিত্যাগ করুন-সিপিবির বন্ধুদের প্রতি, ঢাকা: ১৯৭৯
২৮. Moudud Ahmed, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman*, Dhaka: UPL., 1983
২৯. আওয়ামী লীগ নেতা আবদুস সামাদ আজাদ, সাবেক রাষ্ট্রদূত শামসুর রহমান ও সাবেক রাষ্ট্রপতি সায়েমের সাক্ষাৎকার, বিস্তারিত, তারেক শামসুর রেহমান (১৯৯৩)।

মুজিব শাসনামলে বিরোধী দল : সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ড. জোহোরা খানম

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে যারা সহযোগিতা প্রদান করে তারা এবং চীনপন্থী কিছু দল ছাড়া তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের সকল বিরোধী রাজনৈতিক দল এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে। পূর্ব-পাকিস্তানে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীদার আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা যুদ্ধেও নেতৃত্ব দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরের পরে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এই বলে দাবি করা শুরু করে যে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুত্থান শুধুমাত্র তাদেরই প্রচেষ্টার ফসল। সেহেতু ১৯৭০ এর নির্বাচনে বিজয়ী এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী হিসেবে আওয়ামী লীগ স্বাধীন বাংলাদেশে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে সরকার গঠন করে। ১৯৭১ সালের সশস্ত্র সংগ্রাম যে সব চরমপন্থী ধারণার বিকাশ ঘটায় তার ফলে স্বাধীনতাপূর্ব বিপ্লবী দলগুলো যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। ফলশ্রুতিতে স্বাধীনতা অর্জনের এক বৎসরের মধ্যে ১৯৭২ সালের অক্টোবরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) নামে একটি নতুন বিপ্লবী রাজনৈতিক দল গঠিত হয়।[১] কিন্তু তাদের দুর্বল সাংগঠনিক বুনিয়াদের কারণেই এ নতুন দল বা অন্যকোন বিপ্লবী দল শেখ মুজিবের শাসনামলের বিকল্প শক্তি হিসেবে বিকশিত হতে পারেনি। এ প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠালগ্নে বিরোধী রাজনৈতিক সংগঠনের প্রকৃতি বিশ্লেষণ এবং তাদের দুর্বল সাংগঠনিক বুনিয়াদের প্রতি আলোকপাত করে পর্যালোচনা করা হবে যে, কি কি কারণে এ সমস্ত দল বাংলাদেশের রাজনীতিতে কোন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

৯.১ বিরোধী দলসমূহের সাংগঠনিক চিত্র

স্বাধীনতার প্রাক্কালে বাংলাদেশে আধা ডজন নিয়মতান্ত্রিক বিরোধী দল এবং পাঁচটি গুপ্ত সাম্যবাদী দলের অস্তিত্ব বিদ্যামান ছিল। ডানপন্থী বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে ইসলামিক রাজনৈতিক দলসমূহ যেমন- মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী, নেজাম-ই-

ইসলাম এবং খিলাফত-ই-রাব্বানী পার্টি ছিলো ইসলামিক মতাদর্শে অনুপ্রাণিত এবং এই ধর্মীয় ঐক্যের অনুভূতিই ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের মূলভিত্তি। এই সমস্ত দল তদানিন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধিতা এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তানের সামরিক জান্তাক সহযোগিতা করে। এ লক্ষ্যে দলগুলো রাজাকার, আল বদর, আল শামস প্রভৃতি প্রাইভেট বাহিনী গঠন করে। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতায় তুষ্ট ছিল না। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর পরই সামরিক সরকারকে সহযোগিতা প্রদানের কারণে এ সমস্ত দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে এবং তাদের হাজার হাজার নেতা কর্মীকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়।[২]

বিরোধী দলগুলোর মধ্যে মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এবং বাংলাদেশের সাম্যবাদী দল ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাত করতে মনস্থ করে এবং এ উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তারা আওয়ামী লীগ সরকারের রাষ্ট্রনীতির মৌলিক নীতিমালাসমূহ সমর্থন করে।[৩] স্বতন্ত্র অস্তিত্বের পরিচায়ক হিসেবে তারা আওয়ামী লীগ সরকারের দুর্নীতি, বিরোধীদের দমন, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ক্রম-অবনতি ইত্যাদি বিষয়ে হালকা সমালোচনা করত। কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার কোন অবস্থাতেই যাতে তাদেরকে সরকার বিরোধী মনে করতে না পারে, সে ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ সচেতন ছিল। তারা দেখাতে চেষ্টা করতো যে, কোন মৌলিক নীতিতে আওয়ামী লীগের সাথে তারা দ্বিমত পোষণ করে না। বহু চেষ্টার ফলে পরিশেষে মস্কোপন্থীরা ১৯৭৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের সাথে জোটবদ্ধ হতে সফল হয় এবং এই জোট 'গণ ঐক্যজোট' নামে খ্যাত।[৪] শেখ মুজিবের শাসনামলে মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এবং বাংলাদেশ সাম্যবাদী দলের বিকাশের ধরন থেকে এটাই পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, একটি সুসংগঠিত বিরোধী দল হিসেবে দল গঠন করার পরিবর্তে তারা ক্ষমতার অংশীদারিত্ব লাভের জন্য ছিল বেশী আগ্রহী।

অন্যদিকে চীনপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ-ভাসানী) ছিল অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কোন্দলে জর্জরিত। এর অপেক্ষাকৃত ডান অংশের নেতৃত্বে ছিলেন ড. আলীম-আল রাজি এবং মশিউর রহমান (যাদু মিয়া)। আর বাম অংশের নেতৃত্বে ছিলেন কাজী জাফর আহমেদ ও রাশেদ খান মেনন। মাওলান আব্দুল হামিদ খান ভাসানীসহ কাজী জাফর আহমেদ ও রাশেদ খান মেননের নেতৃত্বাধীন বাম অংশ স্বাধীনতা যুদ্ধে সমর্থন দেয় এবং ড. আলীম-আল-রাজি ও মশিউর রহমানের নেতৃত্বাধীন ডান অংশ পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করে। স্বাধীনতার পরে স্বাভাবিকভাবেই পার্টিতে বাম নেতৃত্বের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তীতে মাওলানা ভাসানীর ভারত বিরোধী অবস্থান, সমাজতন্ত্রের সাথে ইসলামের সংমিশ্রণ সম্পর্কীয় বক্তব্য, বৃহত্তর বাংলা হুকুমত-ই-রাব্বানী[৫] প্রতিষ্ঠার শ্লোগানের কারণে পার্টির ডান অংশ পার্টিতে তাদের কর্তৃত্ব সুসংহত করতে সক্ষম হয়। ডান অংশের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পার্টির অভ্যন্তরীণ কোন্দল পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত বাম অংশ পার্টি থেকে বেরিয়ে যেতে বাধ্য হয়।[৬] দেবেন শিকদার ও আবুল বাশারের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সাম্যবাদী পার্টি নামে আর একটি সাম্যবাদী পার্টি চীনপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং অন্যান্য বামপন্থীদের নিয়ে জাতীয় গণমুক্তি ইউনিয়ন নামে

জোটবদ্ধ হয়।[৭] ১৯৭৪ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে এই জোটভুক্ত পার্টিসমূহ 'গণ মুক্তি ইউনিয়ন' নামে একটি পার্টি গঠন করে।[৮] চীনপন্থী ন্যাপের বাম অংশ মূল পার্টি থেকে বেরিয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নামে তাদের নিজস্ব একটি দল গঠন করে।[৯] ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসে কাজী জাফর আহমেদের নতুন সংগঠিত বাংলাদেশ ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ক্যাপ্টেন আবদুল হালিম চৌধুরীর নেতৃত্বে মস্কোপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিসহ বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল (লেনিনবাদী)-এর সাথে একীভূত হয়ে ইউনাইটেড পিপলস পার্টি-ইউপিপি নামে একটি নতুন দল গঠিত হয়।[১০] চীনপন্থী ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির উপরোল্লিখিত বিকাশ থেকে ধরে নেয়া যায় যে, এ পার্টি বাংলাদেশে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারত (যেটা বাংলাদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের সফলতার জন্য অপরিহার্য ছিল), যদি এর প্রবীণ নেতা মাওলানা ভাসানী পার্টির সকল অংশের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি ইতিবাচক কর্মসূচি প্রদান করতে পারতেন কিংবা এ পার্টি যদি অভ্যন্তরীণ কোন্দল এড়াতে পারত।

মূলতঃ মাওলানা ভাসানীর রাজনীতির ধরনই ছিল ভিন্ন প্রকৃতির। তিনি কখনই দেশের শাসক হওয়ার ব্যাপারটা গভীরভাবে চিন্তা করেননি এবং তাঁর ভূমিকার মধ্যে প্রায়ই সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যেত না। প্রায়ই তিনি পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ছাড়াই কিছু কিছু ধারণা এবং মতামত প্রকাশ করতেন (যেমন, ইসলামী সমাজতন্ত্র, বৃহত্তর বাংলা ইত্যাদি)। যার ফলে তাঁর সমর্থক ও সাধারণ মানুষ পরিষ্কারভাবে কিছু বুঝতে পারত না। এ ছাড়া পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে তিনি মাঝে মাঝে রাজনীতি থেকে অবসর নিতেন এবং প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গিয়ে সপ্তাহের পর সপ্তাহ কাটাতেন।[১১] এভাবে পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব, ইতিবাচক এবং সুস্পষ্ট ব্যাখ্যাভিত্তিক কর্মসূচির অভাব এবং সাংগঠনিক তৎপরতা না থাকার কারণে এ দল ক্রমান্বয়ে জনগণের আস্থা হারিয়ে ফেলে। মূল আওয়ামী লীগ দল থেকে জাসদের উদ্ভব হয় এবং অচিরেই দলটি বাংলাদেশে একটি নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। দলের যুবকর্মীদের বেশির ভাগই মূল আওয়ামী লীগ থেকে বেরিয়ে আসা এবং শীঘ্রই এ দল জনসাধারণের দুঃখ দুর্দশা ও অভিযোগ প্রকাশের মুখপত্র হিসেবে আওয়ামী লীগের বিপরীতে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু তুলনামূলকভাবে জাসদ ছিল একটি নতুন সংগঠন এবং এর বেশির ভাগ কর্মী ছিল যুবক এবং রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ। এই দল তার বুনিয়াদ শক্তিশালী ও সুসংগঠিত করার জন্য প্রধানতঃ ছাত্র সংগঠনের উপর নির্ভরশীল ছিল। আওয়ামী লীগ শাসনামলে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল স্থানীয় পর্যায়ে দল-সংগঠনের পরিবর্তে রাজনৈতিক আন্দোলন নিয়েই বেশি তৎপর ছিল। এমতাবস্থায় নতুন পার্টি হিসেবে[১২] এবং সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে এ দল জনগণের আস্থাভাজন হতে পারেনি।[১৩] আতাউর রহমান খানের জাতীয় লীগ এবং অলি আহাদের জাতীয় লীগসহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলো ছিল নেতা নির্ভর এবং নাম সর্বস্ব দল। বাস্তবিকপক্ষে এ দলগুলোর কোনটিরই স্থানীয় পর্যায়ে কোন সংগঠন ছিল না। এই সমস্ত দলের নেতৃত্বে ছিলেন নগরভিত্তিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীভুক্ত আইনজীবিরা। অনেক দলেরই অনেক শহরে কোন দলীয় অফিসও ছিল না। তারা কোন্দলে লিপ্ত থাকত ও দলের নেতার নাম ও যশ-এর উপরে ভরসা করে চলত।[১৪]

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে বিরোধী দলগুলোর মধ্যে একটি ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু দলীয় কোন্দল ও সাংগঠনিক তৎপরতার অভাব হেতু কোন দলই সক্ষম

দলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সাধারণ কর্মসূচি প্রদান করতে ব্যর্থ হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী গুপ্ত সাম্যবাদী দলগুলো শক্তিশালী দল হিসেবে আবির্ভূত হলেও তারাও ছিল অভ্যন্তরীণ কোন্দলে জর্জরিত। এ দলগুলোর মধ্যে আদর্শগত প্রভেদ ছিল সামান্যই এবং প্রতিটি দলের ভাঙ্গন হয়েছে নেতাদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের কারণে। যদিও প্রত্যেকটা ভাঙ্গনকেই কোন না কোন কৌশলগত বা আদর্শগত কারণে হয়েছে বলে ব্যাখ্যা দেখা হয়েছে। বেশির ভাগ সাম্যবাদী দলের নামকরণ করা হয় দলের নেতার নামে এবং দলের তত্ত্ব এবং কৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে দলের নেতারাই মূখ্য ভূমিকা পালন করেন। এই দলগুলোর স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠন থাকলেও সেগুলো ছিল ক্ষণস্থায়ী এবং কয়েকটি বিশেষ এলাকায় সীমিত। তারা মাঝে মাঝে সেনাবাহিনী এবং জাতীয় রক্ষী বাহিনীর সংগে সশস্ত্র সংগ্রামে লিপ্ত হত। এভাবে গুপ্ত সাম্যবাদী দলগুলোর সমন্বয়ে একটি ঐক্যবদ্ধ শক্তিশালী ফ্রন্ট গঠন করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতার পর্যবশিত হয়।[১৫]

৯.২ উপসংহার: দুর্বল বিরোধী দল

দলগত বিভক্তির কারণে বেশির ভাগ নিয়মতান্ত্রিক ও গুপ্ত সাম্যবাদী দলগুলোর ফিনিক্স পাখির মতই জন্ম এবং এই দলগুলো প্রধানতঃ রাজনৈতিক দলের পরিবর্তে দলাদলি প্রবণ গোষ্ঠী হিসাবেই থেকে যায়। সুতরাং শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের শাসনামলে বাংলাদেশে বিরোধী রাজনৈতিক দলের বিকাশ ছিল বস্তুতঃ কতগুলো সংগঠিত দুর্বল দলের একত্রিভবন, যা অবস্থাদৃষ্টে আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, এ দলগুলো ব্যক্তি কেন্দ্রীক দল ছাড়া অন্য কিছুই ছিল না।

সূত্র ও পাদটীকা

১. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল, জাসদ-এর উৎপত্তি বিকাশ ও মতাদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Lawrence Lifschult, "Abu Taher's Last Testament: Bangladesh, The Unfinished Revolution," *Economic and Political Weekly,* Special Number, August 1977, pp. 1303-54
২. Badruddin Umar, "On Muslim Bengali", Dhaka: *Holiday*, May 27, June 3, 10, 1973
৩. *দৈনিক বাংলা,* ঢাকা: ৩ জুলাই, ১৯৭২
৪. বাংলাদেশ গণঐক্যজোট, ঘোষণাপত্র, ঢাকা: *ইস্টার্ণ প্রিন্টিং পাবলিশিং এন্ড প্যাকেজেস লিমিটেড,* তারিখ নেই, পৃ: ১-৭; *বাংলার বাণী,* ঢাকা : ১৪-১৫ অক্টোবর, ১৯৭৩
৫. মাওলানা ভাসানীর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি, বিস্তারিত, *The Bangladesh Observer,* Dhaka: January 1, April 24, 1974
৬. Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issues,* Dhaka: The University Press Ltd., 1980, p. 106
৭. *The Bangladesh Observer,* Dhaka: December 4, 1973
৮. *পূর্বোক্ত,* ১৮ জানুয়ারি, ১৯৭৪
৯. *পূর্বোক্ত,* ১৬-১৭ জুলাই, ১৯৭৪
১০. *পূর্বোক্ত,* ১৭-১৮ নভেম্বর, ১৯৭৪
১১. Moudud Ahmed, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman,* Dhaka: The University Press Ltd., 1983, p. 221
১২. Rounaq Jahan, (1980), p. 109
১৩. Moudud Ahmed, (1983), p. 221
১৪. Rounaq Jahan, (1980), p. 109-10
১৫. Rounaq Jahan, (1980), p. 109-10

সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে মুজিব নেতৃত্ব

ড. হাসান মোহাম্মদ

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে স্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান পর্যায় পর্যন্ত এই জনপদে যে ক'জন রাজনৈতিক নেতা ব্যক্তিত্বে ও জনপ্রিয়তায় শিখরস্পর্শী সাফল্য অর্জন করেছিলেন; যাঁদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখনো গণমানুষকে প্রভাবিত করে চলেছে; তাঁদের মধ্যে শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান অন্যতম। যদিও এই নেতৃবৃন্দের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক অভ্যুদয় এবং প্রভাব বিস্তার কালের প্রেক্ষাপট এক ও অভিন্ন ছিলনা। ছিলনা তাদের রাজনৈতিক আদর্শ, লক্ষ্য ও উদ্দেশের অভিন্নতা। তবুও বিগত শতাব্দীর বাংলা ভাষাভাষী এই অঞ্চল, সাবেক পূর্ববঙ্গ বা আজকের বাংলাদেশের রাজনীতিতে তাঁরাই ছিলেন অপরিহার্য নির্ধারক ব্যক্তিত্ব।

শেরে বাংলা ছিলেন অবিভক্ত বাংলার কৃষি নির্ভর, পশ্চাৎপদ মুসলিম সমাজের স্বার্থ রক্ষার প্রতিভূ। মাওলানা ভাসানী তাঁর প্রথম জীবনে আসামে বসবাসকারী নির্যাতিত বাঙালি মুসলমানদের অধিকার আদায়ের প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। পরবর্তীতে তিনি হয়েছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের মজলুম মানুষের প্রাণ প্রিয় নেতা। প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম রূপকার মাওলানা ভাসানী এদেশের বামপন্থী-প্রগতিশীল রাজনীতির বিকাশে এক সংগ্রামী ভূমিকা পালন করেছেন। স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও শক্তিশালী গণতান্ত্রিক-সাংবিধানিক কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আজীবন লড়াই করে গেছেন পশ্চিম পাকিস্তানী কায়েমী স্বার্থবাদী প্রাসাদ ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে। ছাত্রনেতা হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে ভূমিকা পালনের মাধ্যমে শেখ মুজিবের রাজনীতিক জীবনের সূচনা। বাঙালি জাতীয়তাবাদের মোহন রূপকার হিসেবে পরবর্তীকালে তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত নেতা এবং সমগ্র জাতির আশা-আকাঙ্খা ও সংগ্রামের মূর্ত 'প্রতীকরূপে'

পরিণত হন। একজন সৈনিক থেকে রাজনীতির শীর্ষ ব্যক্তিত্বে প্রতিষ্ঠিত শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের উত্থান অন্যান্য নেতার চেয়ে ভিন্নতর। ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় মানুষ যখন দিশেহারা, রাজনৈতিক দিক-নির্দেশনা যখন যথোপযুক্ত নয়, তখন সময়ের দাবি পূরণ করতে দুঃসাহসী কাণ্ডারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মেজর জিয়া। পরবর্তীতে বাংলাদেশের রাজনৈতিক শূন্যতার এক স্তব্ধ সময়ে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের ভাবাদর্শে দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ ও উজ্জীবিত করেন।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে নেতৃত্বের এই ধারাক্রম আজকে ইতিহাসের অংশ হলেও সমকালের মতোই তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি বর্তমানেও বিদ্যমান। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও শহীদ জিয়ার ভাবাদর্শ এতই সুস্পষ্ট যে বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক গতি নির্ধারণে তাঁদের রাজনৈতিক দলই প্রধান ভূমিকা পালন করছে। এখানো আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবের ইমেজ আর জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) জিয়ার ইমেজ ধারণ করেই রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বলা বাহুল্য যে, স্বাধীনতা পরবর্তী কোন নেতৃত্ব এই দুই জনপ্রিয় নেতার ইমেজ এখনো ভাঙতে পারেনি। তুলাদণ্ডে নেতৃত্বের সাফল্য-ব্যর্থতা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ কাজ হলেও একথা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের এ যাবতকালের রাজনীতিতে শেখ মুজিব এক অবিস্মরণীয় নেতা। যিনি ব্যক্তি মুজিব থেকে এক রাজনৈতিক আদর্শে পরিণত হয়েছেন; নিজেই নিজের ব্যক্তি সত্তাকে ভেঙে তৈরি করেছেন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি। উত্তুঙ্গ জনপ্রিয়তা থেকে যদিও তাকে ব্যর্থতার দায়ভার নিয়ে বিদায় নিতে হয়েছে; তবুও এ সত্য পরিষ্কারভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, জীবিত মুজিবের মতো লোকান্তরিত মুজিবও এক শক্তিশালী আদর্শের নাম। যে আদর্শ নেতৃত্বের মোহনীয় যোগ্যতায় অভিষিক্ত; ত্যাগ-তিতিক্ষা, সংগ্রাম আর নির্যাতনে আপসহীন এবং দুঃখজনক হলেও স্মর্তব্য, যে বিজয়ী বীর ছিনিয়ে এনেছিলেন মুক্তি, তাকেই অভিযুক্ত করা হয় বাক-ব্যক্তি-সংবাদপত্র তথা গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকার হরণকারী হিসেবে। বস্তুতঃ এই হলো প্রাচীন ট্রাজেডির মতো এক আধুনিক দুঃখ গাঁথা: সাফল্য ও ব্যর্থতার নির্মম ইতিবৃত্ত। শেখ মুজিব (১৯২০-১৯৭৫) নেতৃত্বের সাফল্যের মাত্রাসমূহ এবং ব্যর্থতার পেছনে অন্তর্নিহিত কার্যকারণগুলো পর্যবেক্ষণ করার প্রচেষ্টাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

১০.১ প্রসঙ্গ : নেতৃত্ব

নেতৃত্ব কী? একজন মানুষ কর্তৃক অন্য একজন মানুষের আচার আচরণে প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতাকে সাধারণভাবে নেতৃত্ব বলে অভিহিত করা হয়। উত্তরাধিকার, বিশেষ ব্যক্তিত্ব, আইনানুগ কর্তৃত্ব, সম্মোহনী শক্তি, বিশেষজ্ঞের জ্ঞান, দক্ষতা, প্রজ্ঞা ইত্যাদি গুণের কারণে একজন ব্যক্তি নেতৃত্বের মর্যাদায় উন্নীত হতে পারেন।[১] নেতৃত্বকে রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক দুই ভাবে বিশ্লেষণ করা যায়। ক্ষমতাসীন বা বিরোধী দলের কোন ব্যক্তি যখন অন্যান্যদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডকে প্রভাবিক করতে সমর্থ হন, তখন তাকে বলা হয় রাজনৈতিক নেতা। বস্তুতঃ কোন একজন ব্যক্তির নেতৃত্বের যোগ্যতাই কোন রাজনৈতিক দলকে পরিচালিত এবং সংগঠিত করে।[২] নেতৃত্ব সম্পর্কিত এলিট তাত্ত্বিকদের ধারণায় লক্ষ্য করা গেছে যে, সকল ধরনের রাজনৈতিক দল বা সংগঠন

মুষ্টিমেয় লোকের শাসনাধীন হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। কারণ, সংগঠন বা দল পরিচালনা করার যোগ্যতা ও দক্ষতা সকলেরই থাকে না। কারো কারো থাকে। দল বা সংগঠনের তহবিল, যোগাযোগ নেটওয়ার্কসহ গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয়ে এদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। সকল ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় এরূপ নীতিই সাধারণতঃ কার্যকর হতে দেখা যায়।[৩]

কর্মধারা, প্রভাব বিস্তার, অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হওয়া প্রভৃতি মানদণ্ড দ্বারা নেতৃত্বের সাফল্য ও ব্যর্থতা পরিমাপ করা হয়। একজন সফল নেতার ক্ষেত্রে : অনুসারীদের অনুপ্রাণিত করা, দলীয় বিবাদ-বিসম্বাদ দূর করা, জন কল্যাণ সাধন করা, জনগণের আশা-আকাঙ্খার অনুধাবন করা, সংগঠন ও দেশ পরিচালনার উপযোগী জ্ঞান, কৌশল, অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, সাহস প্রভৃতি গুণাবলী থাকতে হয়।[৪]

নেতৃত্ব সংক্রান্ত তত্ত্বসমূহের মধ্যে- ১. মহামানব তত্ত্ব, ২. অবস্থান/পরিবেশ তত্ত্ব অন্যতম। মহামানবতত্ত্ব অনুযায়ী স্বকীয় যোগ্যতার দ্বারাই একজন ব্যক্তি নেতৃত্বের আসনে আসীন হন। অবস্থান/পরিবেশ তত্ত্ব অনুযায়ী একটি বিশেষ অবস্থা বা পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতি একজন ব্যক্তিকে সাধারণের মধ্যে থেকে নেতৃত্বের মর্যাদায় উপস্থাপন করে। কারো কারো মতে, ব্যক্তিগত মানবিক যোগ্যতা অথবা পরিবেশ- এই দুই'ই ব্যক্তি মানুষকে নেতৃত্বের পদে উন্নীত করতে সহায়তা করে। বিশেষ পরিবেশে বিশেষ যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে নেতৃত্ব পাওয়া সহজতর হয়।[৫]

আধুনিক নেতৃত্বকে জনগণ আইন মান্যকরণ, শৃঙ্খলাবোধ, বৈধতা সম্পর্কিত ধারণা, ভয়, বঞ্চনা, পুরস্কার লাভ ইত্যাদি কারণে মেনে চলে।[৬] ম্যাক্সওয়েবারের মতে, নেতার বৈধ ক্ষমতা আইনগত, ঐতিহ্যগত ও সম্মোহনী এই তিন ধরনের হতে পারে। আইনগত কর্তৃত্ব জনসম্মতির ওপর নির্ভরশীল। ঐতিহ্যগত কর্তৃত্ব উত্তরাধিকার ভিত্তিতে প্রাপ্ত হয়। বীরত্ব, দুর্লভ গুণাবলী ইত্যাদি কারণে বিশেষ বিশেষ সময়ে কোন ব্যক্তি বিশেষ, সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বে পরিণত হতে পারে।[৭]

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় একজন নেতা অনুসারীদের দ্বারা নির্বাচিত হন। নেতা তার দায়-দায়ত্বি ও কার্যক্রমের জন্য তত্ত্বগতভাবে হলেও অনুসারীদের নিকট দায়ী থাকেন। অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নেতার ওপর অনুসারীদের নিয়ন্ত্রণ সাধারণতঃ অনেক কম দেখতে পাওয়া যায়। নেতৃত্ব সংক্রান্ত তত্ত্বগত ধারণার আলোকে মুজিব নেতৃত্বের সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন করার মাধ্যমে সাফল্য ও ব্যর্থতার মাত্রাসমূহ চিহ্নিত করা যেতে পারে।

১০.২ মুজিব নেতৃত্বের সাফল্যের ইতিহাস

বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এক সাধারণ অরাজনৈতিক মুসলিম পরিবারে শেখ মুজিব জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনেই তার রাজনীতিতে হাতে খড়ি হয়। কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে অধ্যায়নকালে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ ঘটে। ছাত্র কর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনেও তিনি কাজ করেন। পরবর্তীকালে আওয়ামী মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগ নেতা হিসেবে ভাষা আন্দোলন, যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনসহ পূর্ববাংলার মানুষের অধিকার আদায়ের সকল সংগ্রামে তিনি ছিলেন সোচ্চার কণ্ঠস্বর। ১৯৬৬ সালে পূর্ববাংলার পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আদায়ের লক্ষ্যে শেখ মুজিব ঐতিহাসিক ৬ দফা আন্দোলনের কর্মসূচি ঘোষণা করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার লক্ষ্যে সংঘটিত বলে কথিত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামালা'য় তাকে জড়িত

করে প্রধান আসামী করা হয়। তারপরও জনমানুষের মনে মুজিবের একটি সংগ্রামী নেতৃত্বের ছবি আঁকা হয়ে যায় এবং পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নিকট ৬ দফা ও এর প্রবক্তা শেখ মুজিব ঈর্ষণীয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।[৮]

শেরে বাংলা[৯] এবং সোহরাওয়ার্দীর[১০] তিরোধান, মাওলানা ভাসানীর[১১] ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে (ন্যাপ) আদর্শিক বিভক্তি, অন্তঃকোন্দল ও সর্বোপরি সমাজতান্ত্রিক আন্তর্জাতিকতার নামে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রতি অনীহা পূর্ব বাংলার সুসংবদ্ধ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ হিসেবে শেখ মুজিবকে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করে। যদিও মাওলানা ভাসানীসহ বামপন্থীরা পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন এবং কোন কোন বামগ্রুপ (প্রধানত পিকিংপন্থী) স্বাধীনতার ঘোষণাও দিয়েছিলো; তবুও নেতৃত্বের মূলধারা এবং ব্যাপক জনসমর্থন শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে চলে।

নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌছার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবের অপরিসীম সাহস, দৃঢ়তা ও ত্যাগ পূর্ববাংলার জনমনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তাঁর অনুপম সাংগঠনিক শক্তি ও কৌশলের কারণে সত্তর দশকে এসে তাঁর দল আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও শক্তিশালী রাজনৈতিক সংগঠনে পরিণত হয়। সত্তরের নির্বাচনে সেজন্য আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবের উত্থান ঘটে পূর্ববাংলার প্রধান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে। ১৯৭১ সালে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে মূলতঃ তিনিই ছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের একচ্ছত্র নেতা এবং অলিখিত শাসক। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালো রাত্রির নৃসংশ ঘটনা, মুজিবের গ্রেফতার, পূর্ববাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা, ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি দ্রুত ঘটমান ঘটনাপ্রবাহ এই জনপদে নিয়ে আসে ব্যাপক পরিবর্তন। অর্জিত হয় বাংলাদেশের রক্তাক্ত স্বাধীনতা। পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিব মুক্ত স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সূচনা ঘটে তাঁর নেতৃত্বের নবতর পর্যায়। এ পর্যায়ে তিনি আর আন্দোলনের নেতা নন–রাষ্ট্রের কর্ণধার। সফল বিরোধী দলীয় আন্দোলন থেকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত শেখ মুজিবের নেতৃত্বের আরেক অধ্যায়ের অগ্নি পরীক্ষা শুরু হয়।

আন্দোলনের নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের সাফল্য অনন্য ও অসাধারণ হলেও শাসক শেখ মুজিবের সাফল্য নিয়ে বির্তক, সংশয় ও মতভেদ রয়েছে। বস্তুতঃ বিরোধী দল ও সরকারে মুজিব নেতৃত্বকে পৃথক পৃথকভাবে খণ্ডিত অবয়বে দেখার প্রবণতায় না গিয়ে সামগ্রিক মুজিব নেতৃত্বকে পর্যবেক্ষণ করাই একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্লেষণের পূর্বশর্ত। মুজিব নেতৃত্বের সূচনা ও সমাপ্তি উভয় পর্যায়েই যেমন উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জিত হয়েছে; তেমনি দেখা গেছে ব্যর্থতার ক্ষতি চিহ্ন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে মুজিব নেতৃত্বের সাফল্য সুদীর্ঘ। যেমন–

১. সাহস, দৃঢ়তা, সাংগঠনিক শক্তি ও কৌশল, আপসহীনতা শেখ মুজিবকে পূর্ব পাকিস্ত ানের আপামর জনগণের একচ্ছত্র নেতার আসনে অধিষ্ঠিত করেছিল।

২. আন্দোলন–সংগ্রাম–নির্বাচনে মুজিব নেতৃত্ব এমন এক সম্মোহনী ইমেজ তৈরি করেছিল যে, শারীরিক অনুপস্থিতি সত্ত্বেও তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান ব্যক্তিত্ব।

৩. মুজিবের শিখরস্পর্শী নেতৃত্বের ফলেই যুদ্ধকালীন বিভিন্ন বাহিনী ও গ্রুপের নিকট থেকে শান্তিপূর্ণভাবে অস্ত্র সমর্পণ সম্ভব হয়েছিল।

৪. মুজিব নেতৃত্ব যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের রাজনৈতিক কাঠামো নির্মাণ ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কার্যক্রম শুরু করে দেশে স্থিতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। বলা হয়, মুজিবের নেতৃত্ব ও উপস্থিতি বাংলাদেশকে রক্ষা করেছিল এক অনিবার্য গৃহযুদ্ধের কবল থেকে।

৫. মুক্তিযুদ্ধের পর পরই ভারতীয় বাহিনীর বাংলাদেশ ত্যাগের ঘটনা কেবলমাত্র সম্ভব হয়েছিল মুজিব নেতৃত্বের বিশাল ক্ষমতার কারণে।

৬. রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রয়োজন মুক্তিযুদ্ধে বিরোধিতা সত্ত্বেও শেখ মুজিব বিভিন্ন মুসলিম দেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের সাহসী ও কুশলী ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃস্থাপন ও দৃঢ়করণে তাঁর ভূমিকা ও নেতৃত্বে ছিল অসামান্য। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের সূচনা তিনিই ঘটাতে সমর্থ হন।

৭. যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের পুনর্গঠন, গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন, সংবিধান প্রণয়নসহ বিভিন্ন আশু করণীয় রাষ্ট্রীয় কর্তব্য সম্পাদনে মুজিব নেতৃত্ব সাহসী ও দৃঢ় ভূমিকা পালন করেছিল।

১০.৩ মুজিব নেতৃত্বের ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত

একদা মুজিব সহযোগী, রাজনীতিক ও আইনজ্ঞ মওদুদ আহমদের মতে, ক্ষমতায় আরোহণের পরক্ষণ থেকেই শেখ মুজিবের পতন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল।[১২] মুক্তিযুদ্ধে অনুপস্থিতিসহ নানা কারণে তিনি তাঁর শক্তি, মেধা ও জনপ্রিয়তাকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হন। একটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র পরিচালনার প্রয়োজনীয় প্রস্তুতির অভাব, প্রশাসনিক অদক্ষতা, অনভিজ্ঞতা, আবেগপ্রবণতা মুজিব নেতৃত্বের ব্যর্থতার প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তার অধিকারী শেখ মুজিব নেতৃত্বের ব্যর্থতাও ছিল উল্লেখযোগ্য। যেমন-

১. মুজিব নেতৃত্ব তাঁর রাজনীতিক দলের নেতা-কর্মী, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অনুগ্রহ প্রার্থীদের দুর্নীতি ও সমাজ বিরোধী কার্যক্রম থেকে বিরত রাখতে পারেনি। সর্বব্যাপী দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কারণে তাঁর নেতৃত্ব এবং দল সম্পর্কে জনমনে যে উচ্চ ধারণা ও মোহ ছিল তা' কেটে যায়। আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও সংগঠন ধীরে ধীরে জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে থাকে।

২. দলের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, উপদল ও কোটারী সৃষ্টি করা থেকে তিনি তার অনুসারীদের বিরত রাখতে পারেননি। তাঁর সংগঠন থেকে যুব সমাজের প্রধান অংশ বেরিয়ে গিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) গঠন করে। জাসদ, অন্যসব বিপ্লবী সংগঠনের মতোই, মুজিবের নেতৃত্ব ও রাজনৈতিক দলের প্রতি চরম চ্যালেঞ্জ হয়ে দাড়ায়।

৩. ব্যাপক জাতীয়করণ এবং অনভিজ্ঞ লোকের হাতে বাণিজ্যিক ও শিল্প প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ভার দেয়ায় অধিকাংশ জাতীয়করণকৃত প্রতিষ্ঠান লোকসান এবং অব্যবস্থাপনায় বন্ধ হয়ে যায়। দল ও পছন্দের বাইরে যোগ্য লোক নিযুক্ত করার ব্যাপারে মুজিব নেতৃত্ব অনীহা প্রদর্শন করায় দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতি তীব্রভাবে দানা বেঁধে

ওঠে। দেশের অর্থনীতিতে দেখা যায় ভয়ানক বিরূপ প্রতিক্রিয়া। মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়। দ্রব্যমূল্য অস্বাভাবিক রকম বেড়ে যায়। সর্বোপরি বেকারত্ব ও দারিদ্র্য বেড়ে গিয়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি মুখ থুবড়ে পড়ে। যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি নজীরবিহীন দুর্ভিক্ষ।

৪. ভারতের সঙ্গে ব্যাপক চোরাচালান, পাকিস্তানী বাহিনী ও মালিকদের পরিত্যক্ত সম্পত্তি ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক লুটতরাজ, ভারতের সঙ্গে ২৫ বছরব্যাপী মৈত্রী চুক্তি, সর্বোপরি সকল ক্ষেত্রে ভারতমুখী নীতি বাংলাদেশের মানুষ সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। সাধারণভাবে এই ধারণার জন্ম নেয় যে, শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ সম্পূর্ণভাবে ভারত নির্ভর; নিজস্ব শক্তি ও ক্ষমতাহীন। এই অবস্থায় প্রকাশ্য ও গোপন রাজনৈতিক দলসমূহ ব্যাপক ভারত বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলে এবং শেখ মুজিবকে ভারতের 'ক্রীড়ানক' হিসেবে অভিহিত করে তাঁর এবং আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

৫. আওয়ামী লীগের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক কৌশল এদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ভালোভাবে গ্রহণ করেনি।

৬. '৭৪ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ এবং অসংখ্য মানুষের মৃত্যু সম্পর্কে দেশী-বিদেশী বিরূপ প্রচারণা মুজিব নেতৃত্ব ও আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।

৭. জাতীয় রক্ষী বাহিনীর মতো লাল বাহিনী, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী প্রভৃতি দলীয় পেটুয়া বাহিনী শেখ মুজিবকে স্বৈরাচারি ও আক্রমণাত্মক হিসেবে প্রতিপন্ন করে। জনমনে এই সকল বাহিনীর নির্মম কার্যকলাপ ভীতির সঞ্চার করে, যা মুজিব নেতৃত্বের প্রতি জনসমর্থনকে দ্রুত কমিয়ে আনে। অন্যদিকে, রক্ষী বাহিনীকে ব্যাপক সুযোগ–সুবিধা প্রদান করে সমান্তরাল সশস্ত্র বাহিনী গঠনের উদ্যোগ দেশের প্রতিষ্ঠিত সশস্ত্র বাহিনীকে হতাশ, বঞ্চিত ও বিক্ষুব্ধ করে। ফলে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মুজিব ও আওয়ামী লীগের মানসিক দূরত্ব বৃদ্ধি পায়।

৮. শেখ মুজিবের ভারত–সোভিয়েত নীতি মুসলিম ও পশ্চিমা বিশ্ব ভালোভাবে গ্রহণ করেনি। আবার ইসলামী বিশ্ব ও পশ্চিমের গণতান্ত্রিক দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্কন্নোয়ন শেখ মুজিবের উদ্যোগ ভারত–সোভিয়েত জোটকে বিক্ষুব্ধ করে। এই দ্বৈত নীতির ফলে বিদেশে মুজিবের প্রকৃত বন্ধু হ্রাস পায় এবং মুজিবের নেতৃত্ব পররাষ্ট্র নীতিতে কোন গ্রহণযোগ্য সাফল্য আনতে ব্যর্থ হয়।

৯. দেশব্যাপী সীমাহীন অরাজকতা, নৈরাজ্য, সন্ত্রাস, ভীতি স্বাভাবিক জীবনযাত্রাকে বিঘ্নিত করে। মানুষ প্রচণ্ড নিরাপত্তাহীনতার প্রেক্ষাপটে মুজিব নেতৃত্বের ওপর থেকে ক্রমেই আস্থা হারাতে থাকে।

১০. সংসদীয় গণতন্ত্রকে নাকচ করে দিয়ে একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থার অধীনে রাষ্ট্রপতির একচ্ছত্র শাসন, রাজনৈতিক মত এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, বাধ্যতামূলক সমর্থন আদায়ের সাংবিধানিক বিধি প্রণয়ন করে শেখ মুজিব গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের আনুষ্ঠানিক মৃত্যু ডেকে আনেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে মুজিবের সুদীর্ঘকালের গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের ঐতিহ্য দারুণভাবে ক্ষুণ্ন হয়। ফলে দেশ মুজিব ও আওয়ামী লীগের হাতে জিম্মি এবং আইনানুগ পদ্ধতিতে সরকার পরিবর্তনের পথ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ করা হয়েছে বলে জনমনে বিশ্বাস গড়ে ওঠে। যা আপামর জনগণ থেকে শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে।[১৩]

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ভোর রাতে এক সশস্ত্র অভ্যুত্থানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রধান স্থপতি শেখ মুজিব পারিবারিক সদস্যসহ নির্মমভাবে নিহত হন। ক্ষমতা আরোহণকালে যিনি এদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা ছিলেন- মাত্র সাড়ে তিন বছরেরও কম সময়ে তাঁর সকরুণ পতন দেশে কোন ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। প্রধানতঃ তাঁর এককালীন সহচররাই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করেন। প্রকৃত অর্থে, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকালে এদেশের মানুষের মনে যে রাজনৈতিক–অর্থনৈতিক আশা–আকাঙ্খার জন্ম নিয়েছিলো– তা অনুধাবন করতে পারলেও বাস্তবায়ন করা শেখ মুজিব নেতৃত্ব ও আওয়ামী লীগের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামোতে সম্ভব হয়নি। অন্য কোন নেতৃত্বের পক্ষেও যুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে পুঞ্জীভূত সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সহজ ও সম্ভব হতো কি–না সন্দেহ। কারণ, শেখ মুজিবকে এই জাতির এক কঠিন সময়ে নেতৃত্ব দিয়ে ইতিহাসের দ্রুত পালাবদলের মুহূর্তে দেশ শাসন করতে হয়েছিল। সেই পালাবদলের ক্রান্তকালকে সুসংগঠিত দল ও কর্মী ছাড়া একার পক্ষে জয় করা এক অসম্ভব কল্পনা মাত্র।

১০.৪ উপসংহার: সাফল্য-ব্যর্থতায় প্রজ্বলিত শিখা

সাফল্য ও ব্যর্থতার মেরুকরণে শেখ মুজিব নেতৃত্ব এক অনিঃশেষ চেতনা। তিনি কোন উত্তরাধিকার সূত্রে নেতৃত্ব লাভ করেননি। ব্যক্তিগত ত্যাগ, সাহসিকতা, দৃঢ়তা, সাংগঠনিক শক্তির গুণাবলী তাঁকে সাধারণ অবস্থা থেকে বাংলাদেশের রাজনীতির অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব এবং মুকুটহীন সম্রাটে পরিণত করেছিল। সম্মোহনী নেতৃত্বের ক্ষমতায় ১৯৭১ সালে জনতা–সাগরে তিনি তুলেছিলেন মহাপ্লাবণ: অসহযোগের দিনগুলোতে আইনানুগ শাসক না হয়েও তাঁর নির্দেশেই কার্যতঃ পূর্ব-পাকিস্তান পরিচালিত হয়েছিল। মুজিবের অপূর্ব সাংগঠনিক শক্তির কারণে তাঁর দল আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। নেতৃত্বের প্রতিযোগিতায় সমকালীন কেউই তার সামনে টিকে থাকতে পারেনি। পূর্ব-পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে তিনি তাঁর দলের পক্ষে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হন এবং স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলনকে বাঙ্গালি জাতিসত্তার স্বাধীনতায় উপনীত করতে সফল হন। দলীয় নেতা শেখ মুজিব, জাতির নেতায় পরিণত হতে সমর্থ হয়েছিলেন।

শেখ মুজিব একজন মহামানব হিসেবে রাজনৈতিক নেতৃত্ব অর্জন করেননি। রাজনীতির দীর্ঘ ও জটিল পথ পাড়ি দিয়ে তাঁকে জয় করতে হয়েছে জাতির নেতৃত্ব। সমকালীন পরিস্থিতি মুজিবকে পূর্ববাংলার জনগণের অবিসম্বাদিত নেতার মর্যাদায় উঠে আসতে সহায়তা করেছে। অন্যদিকে, বিদ্যমান পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার যোগ্যতাও তাঁর মধ্যে দেখা গেছে। তিনি কেবলমাত্র পরিবেশের ফসল নন। তিনি ছিলেন একই সঙ্গে সময়ের সন্তান এবং সময়ের সফল নিয়ন্ত্রক।

মুজিব নেতৃত্বের দু'টি দিক সুস্পষ্ট। ক্ষমতার বাইরে আন্দোলনের নেতা এবং রাষ্ট্র প্রধান– এই দুই পর্যায়ে তিনি সমানভাবে সফল ছিলেন না। আন্দোলনে তার নেতৃত্বের সাফল্য, ক্ষমতাসীন অবস্থায় সম্পূর্ণ সাফল্যজনক ছিলোনা। ক্ষমতায় গিয়ে তিনি নেতৃত্বের যোগ্যতাকে প্রমাণ করতে পারেননি; পারেননি নিজস্ব সম্মোহনী নেতৃত্বের ক্ষমতাকে প্রতিষ্ঠানিক ভিত্তি দিতে।

নেতৃত্বের সাফল্য ও ব্যর্থতা পরিমাপ করলে দেখা যায় যে, মুজিবের সাফল্যের ক্ষেত্রে কাজ করেছে ব্যক্তিগত ভূমিকা ও পরিবেশের সুবিধাজনক প্রভাব; ব্যর্থতার জন্যও

ক্রিয়াশালী ছিল ব্যক্তিগত ও অবস্থানগত প্রভাব। যে প্রভাবের প্রতিক্রিয়া সব সময় উত্তরণ করা যায় না। তবে, নেতৃত্বের সাফল্য–ব্যর্থতা নির্ধারণে অবস্থা বা পরিবেশের প্রভাব বিবেচনায় আনা হলেও একমাত্র পরিবেশকেই কৃতিত্ব প্রদান করা হয় না। পরিবেশের আনুকূল্য বা বৈরিতা থাকবেই। সেটা জয় করে কতটুকু সাফল্য অর্জন বা ব্যর্থতায় নিমজ্জিত হতে হয়েছে– একজন নেতার মূল্যায়নে সেটাই মূল বিবেচ্য বিষয়। এই বিবেচনায় শেখ মুজিব স্বকীয় সাফল্যে উজ্জ্বল, ব্যর্থতায় ম্লান একজন অপরিহার্য ব্যক্তিত্ব : বাংলাদেশের রাজনীতিতে এক অন্তহীন চেতনা প্রবাহ।

সাফল্য ব্যর্থতার নিরিখে শেখ মুজিবের মূল্যায়ন আরো দীর্ঘকাল চলতে থাকবে। তাঁকে নিয়ে স্তাবকতা কিংবা তার লোকান্তরে সমালোচনায় ক্ষত–বিক্ষত করার এ যাবত প্রচলিত পদ্ধতিতে যুগপৎ বাদ দিয়ে নবতর মূল্যায়নের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা অপরিহার্য। কারণ, এ জাতির উত্থানকালে তাঁর নেতৃত্বের সাফল্যকে যেমন ধারণ করতে হবে, তেমনি ব্যর্থতাকেও অতিক্রম করতে হবে– আগামীর কল্যাণ ও সমৃদ্ধির প্রয়োজনে। বস্তুতঃ অনাগত ভবিষ্যতের কথা মনে রেখে আবেগ ও বিরাগ বর্জন করে বস্তুনিষ্ঠ মুজিব ও তাঁর নেতৃত্বের সঠিক চিত্র উদ্ভাসিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়- যে চিত্রে হবে এ জাতিসত্তার এক ক্রান্তিকালীন পর্যায়ে নেতৃত্বদানকারী নেতার প্রকৃত প্রতিচ্ছবি।

সূত্র ও পাদটীকা

১. H. H. Gerth and C. W. Mill (eds), *From Maxweber,* London: Routledge and Kegan Paul Limited, 1967, pp. 78-80
২. Robert Michels, *Political Parties,* New York: The Free Press, 1966, p. 73
৩. *পূর্বোক্ত*
৪. Jack R. Gibb, "Dynamics of Leadership and Communication" in R. Lassy and R. R. Fernandez (eds.), *Leadership and Social Change,* California: University Associates Inc., 1976, p. 107
৫. Maxweber, *The Theory of Social and Economic Organizaton,* New York: The Free Press, 1966, p. 328
৬. Stephen Cotgore, *The Science of Society,* London: George Allen and Unwin, 1980.
৭. A. Yuki, *Leadership in Organization,* New Jersey: Prentice Hall Inc., 1981, p. 60.
৮. Abdul Wadud Bhuiyan, *Emergence of Bangladesh and Role of Awami League*, Dhaka: University Press Ltd., 1982; Johra Khanam, *The Awami League in the Political Development of Bangladesh 1972-75,* Unpublished Ph.D Dissertation, Chittagong: University of Chittagong, 1989.
৯. Md. Sanaullah, *Role of Leaders in Developing Countries --AK Fazlul Huq : A Case Study,* Unpublished Ph.D Dissertation, Chittagong: University of Chittagong, 1983.
১০. Mohammad H.R. Talukder (ed.), *Memories of Huseyn Shahieed Suhrawardhy with Brief Account of his Life and Work,* Dhaka: University Press Ltd., 1987.
১১. শাহ আহমদ রেজা, *ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম*, ঢাকা: গণপ্রকাশনী, ১৯৮৬; সাইফুল ইসলাম, *স্বাধীনতা, ভাসানী, ভারত*, ঢাকা: অয়ন প্রকাশনী, ১৯৮৭; হাসান আবদুল কাইয়ুম (সম্পা.), *মজলুম জননেতা মাওলানা ভাসানী*, ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৮
১২. Moudud Ahmed, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman,* Dhaka: UPL 1983, p. 264.
১৩. মঈদুল হাসান, *মূলধারা: '৭১*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬; Rounaq Jahan, *Bangladesh Politics: Problems and Issues,* Dhaka : University Press Ltd., 1980.

মুজিব শাসনের পতন: একটি বিশ্লেষণ

ড. ইউ. এ. বি. রাজিয়া আখতার বানু

১৯৪৫ পরবর্তীকালে বিশ্বব্যাপী উপনিবেশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রে দীর্ঘ সময়কাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের জওহরলাল নেহেরু, ইন্দোনেশিয়ার আহমদ সুকর্ণ এবং কেনিয়ার জেমো কেনিয়াত্তা- স্বাধীনতা আন্দোলনের এমন অগ্রসেনানীদের প্রত্যেকেই এক দশকেরও বেশি সময়কাল শাসন ক্ষমতায় ছিলেন। কেনেথ কাউন্ডা ও জুলিয়াস নায়েবের মতো স্বাধীনতার সৈনিকরাও সুদীর্ঘকাল রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। বিশ্বব্যাপী জাতীয়তাবাদী নেতাদের শাসন কৃতিত্বের ব্যাপক সাফল্যের প্রেক্ষাপটে, মাত্র ৪৪ মাসে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সফল রূপকার শেখ মুজিবর রহমানের শাসনের অবসান বিস্ময়কর মনে হয়।

পাকিস্তানী শাসকদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে শেখ মুজিব প্রায় সমগ্র দেশবাসীর সমর্থন লাভে সক্ষম হন; এই অবিস্মরণীয় সাফল্যের পর দুঃখজনকভাবে শেখ মুজিবের রাজনৈতিক পতনকে হতবুদ্ধিকর ঘটনা বলে মনে হবে। বস্তুতঃ শেখ মুজিব তাঁর দেশবাসী বাঙ্গালী জনগোষ্ঠীর কাছে যে বিপুল-বিশাল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন, কাছাকাছি সময়ে অন্য কোন জাতীয়তাবাদী নেতা এমন দুর্লভ সুযোগ ও সৌভাগ্য পাননি। মধ্য ষাটের দশকে শেখ মুজিব যখন ঐতিহাসিক ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন গড়ে তুললেন, তখন তিনি বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চলমান প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন। সে সময় পাকিস্তানের ফৌজি শাসক আয়ুব খানের সরকার কতিপয় সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাসহ শেখ মুজিবকে প্রধান আসামী করে কথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। এই মামলায় "ভারতের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন" করার অভিযোগে যখন ঢাকা সেনানিবাসে শেখ

মুজিবের বিচার শুরু হয়, তখন এ অঞ্চলের জনগণ ব্যাপক গণ–বিক্ষোভ শুরু করে এবং গণ-আন্দোলনের মুখে পাকিস্তানী সরকার শেখ মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। জনগণের জন্য সংগ্রাম করে নির্যাতন ভোগ করার জন্য বাঙ্গালী জনগণ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে সম্মানিত করেছিল।[১] প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ১৯৭০ সালে সমগ্র পাকিস্তানে যে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ অর্জন করে এমন এক অভাবনীয় বিজয় ... যা পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায়নি; প্রদত্ত ভোটের ৭২.৫৭ শতাংশ পেয়ে আওয়ামী লীগ সাবেক পূর্ব-পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসনই লাভ করে।[২] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে (মার্চ ১৯৭১-ডিসেম্বর ১৯৭১) পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি থেকেও শেখ মুজিব বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের অনুপস্থিত প্রধান হিসেবে নির্বাচিত হন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল চেতনা হিসেবে কাজ করেন। ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে মুক্ত বাংলাদেশে শেখ মুজিবের প্রত্যাবতর্নের সময় অনেকেই তাঁকে জাতির পিতা হিসেবে অভিনন্দিত করেন। শাসন ক্ষমতায় মাত্র সাড়ে তিন বছরের সংক্ষিপ্ত সময়কালে শেখ মুজিব ও তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্য এক নৃশংস আর রক্তাক্ত সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে নিহত হন (১৫ আগস্ট ১৯৭৫) এবং সেই শোকাবহ ঘটনার কোন প্রকাশ্য প্রতিবাদই সেসময় জনগণ করেনি। শেখ মুজিব শাসনের এই অসম্মানজনক অবসানকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যাবে? এর কারণ সম্ভবতঃ নিহিত আছে মুজিব শাসনামলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার ফলপ্রসূতা, বৈধতা এবং ঐকমত্য গড়ে তোলার জন্য গৃহীত প্রক্রিয়ার অদ্ভুত আন্তঃমিশ্রণের মধ্যে।

কোন শাসনের অবসান তখনই হবে যখন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বৈধতা অবক্ষয়প্রাপ্ত হয়। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বৈধতা অর্জন করে থাকে মূল্যবোধ ও স্থিতিশীলতা অর্জনের মধ্য দিয়ে।[৩] মূল্যবোধ ও স্থিতিশীলতা অর্জনের জন্যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দু'টি শর্ত অবশ্যই পুরণ করতে হয় : ১. প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে সম্পর্কিত সমাজের বিভিন্ন স্তরের বৃহত্তর রাজনৈতিক মতামতকে প্রতিফলিত করতে হবে; ২. প্রতিষ্ঠানগুলোকে সন্তোষজনক কার্যকলাপের কৃতিত্ব প্রদর্শন করে নিজস্ব উপযোগিতা প্রমাণ করতে হবে।[৪] কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উপযোগিতা সম্পর্কে জনগণ তখনই হতাশ হয় যখন সেই প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা জনগণের প্রত্যাশার অনেক নিচে নেমে যায়। একইভাবে কোন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ও কার্যকারিতার ভিত্তিতে জনগণের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ সমঝোতা গড়ে ওঠতে পারে– এমনকি উক্ত প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সময় সমাজের রাজনীতি সংশ্লিষ্ট অংশ প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে একমত নাও থাকতে পারে। তবে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতা ও সাধারণ রাজনৈতিক ঐকমত্য পারস্পরিকভাবে কোন সরকারের স্থিতিশীলতা রক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।

মুজিব শাসনের পতন বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই প্রবন্ধে শেখ মুজিবের শাসনকাল ও সে সময়কার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নানাদিক পর্যালোচনা করা হবে। রাজনৈতিক

প্রতিষ্ঠান যেমন রাজনৈতিক দল, আমলাতন্ত্র, মন্ত্রিসভা ও সংসদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা করে এসকল প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা নির্ণয় এবং দেশের সাধারণ রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের ক্ষেত্রে সে সকল প্রতিষ্ঠানের প্রভাব অনুসন্ধান করা হবে। সে আমলে রাজনৈতিক লক্ষ্য–উদ্দেশ্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান মত–পার্থক্য নিরসনে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ব্যর্থতা কেমন করে অতিদ্রুত মুজিব শাসনের পতন ঘনিয়ে আনে, সেটাও পর্যবেক্ষণ করা হয়।

১১.১ গণ-পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী

সাবেক পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানী সামরিক আক্রমণের পর ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল স্বাধীনতার যে ঘোষণা দেয়া হয়, তা'ই ছিল ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সরকারের আইনগত ভিত্তি। ১৯৭০ এবং ১৯৭১ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা উল্লেখিত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করেন। স্বাধীনতার ঘোষণায় বলা হয়: "একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত এই ঘোষণা বহাল থাকবে... রাষ্ট্রপতি... প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ও আইনগত ক্ষমতা ভোগ করবেন... বাংলাদেশের জনগণকে একটি সুশৃঙ্খল ও সঠিক সরকার প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল কিছু করবেন।"[৫]

স্বাধীনতা অর্জনের পর পরই বৈপ্লবিক সরকার দেশের সংবিধান প্রণয়নের জন্যে তড়িৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে রাষ্ট্রপতির 'বাংলাদেশ সাংবিধানিক পরিষদ আইন' আদেশের মাধ্যমে একটি সাংবিধানিক পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের ১ মার্চ অনুষ্ঠিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকারী জনপ্রতিনিধিরা সাংবিধানিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। রাজনৈতিক দল ও আইন পরিষদের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে আওয়ামী লীগের (বিশেষ করে শেখ মুজিব) মনোভাব (পরবর্তীতে যা বেশ স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়) একই দিন প্রদত্ত রাষ্ট্রপতির অপর এক আদেশে (সাংবিধানিক পরিষদ সদস্যপদ [বাতিল আইন]) লক্ষ্য করা যায়।

এ আদেশে বলা হয়: আইন পরিষদের কোন সদস্য যদি, যে দলের নমিনেশনে নির্বাচিত হয়েছেন সে দল থেকে পদত্যাগ করেন বা বহিষ্কৃত হন, তবে তাঁর আসনটিকে শূন্য ঘোষণা করা হবে।[৬] এ আদেশের মাধ্যমে সাংবিধানিক পরিষদকে সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাসীন দলের অনুগত করে তোলা হয়। পরিষদের চার শ' তিরিশ জন সদস্যের মধ্যে ক্ষমতাসীন দলের টিকেটে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল চার শ' সাতাশ জন।

সাংবিধানিক পরিষদ মাত্র উনিশ কর্মদিবসে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়ন করে। ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে সাংবিধানিক পরিষদ 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি সিডিসি' নামে মাত্র একটি কমিটি গঠন করে। তৎকালীন আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রি ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গঠিত 'সিডিসি'তে চার জন সিনিয়র মন্ত্রিসহ সর্বমোট ৩৩ জনকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। স্বাধীনতার সংগ্রামকালে যদিও আওয়ামী লীগ নেতারা

সমাজতন্ত্রের শ্লোগান দিয়েছিলেন; তবুও তারা এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে গিয়ে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রে পূর্ব ঘোষিত 'সংসদীয় গণতন্ত্র'কে বর্জন করা যাবে না। তবে যুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপটে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের একটি মিশ্র প্রক্রিয়া গ্রহণে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ রাজি ছিলেন। ফলে 'সিডিসি' ব্রিটিশ ব্যবস্থার 'ওয়েস্ট মিনস্টার' ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্রের আলোকে একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন করে।

সংবিধান প্রণয়নের কাজে 'সিডিসি' ৭৪টি বৈঠকে মোট তিন শ' ঘণ্টার মত সময় ব্যয় করে।[৮] ১৯৭৩ সালের অক্টোবর মাসে খসড়া সংবিধান যখন অনুমোদনের জন্য সাংবিধানিক পরিষদে উপস্থাপন করা হয়, তখন শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার এ প্রসঙ্গে কোন মুক্ত আলোচনার সুযোগ দেয়নি। সংবিধানে যে সকল সংশোধনী স্থান পেয়েছিল, কেবল সেগুলো পূর্বেই আওয়ামী লীগের সংসদীয় দল (এএলপিপি) কর্তৃক পর্যালোচিত ও গৃহীত হয়। সাংবিধানিক পরিষদে খসড়া সংবিধান বিলটি উপস্থাপন ও এর দ্বিতীয় পাঠের মধ্যবর্তী সময়ে এএলপিপি পাঁচ দিন বৈঠকে মিলিত হয়ে বিলটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পেছনে মাত্র ১৫ ঘণ্টা সময় ব্যয় করে। এএলপিপি'র বৈঠকে প্রায় তিন শ' সংশোধনী প্রস্তাব আনা হয়।[৯] পরে ৮০টির মতো সংশোধনী এএলপিপি চূড়ান্ত ভাবে অনুমোদন করে। আওয়ামী লীগের পরিষদ সদস্যরা এ সকল সংশোধনী সাংবিধানিক পরিষদে উত্থাপন করে– যার অধিকাংশই ছিল ভাষাগত পরিবর্তন মাত্র।[১০]

সংবিধান বিলের ১৫৩টি ধারা ও ৪টি তফসিলের কোন অংশ পরীক্ষার জন্য সাংবিধানিক পরিষদ কোন কমিটি গঠন করেনি। বিলটি উত্থাপনের মাত্র ৬ দিন পরই পরিষদ বিলটির উপর সাধারণ আলোচনা আহ্বান করে। অথচ বিলটির ব্যাপারে জনমত প্রকাশের জন্য মাত্র ৬ দিন সময়কালের আলোচনা যথেষ্ট বলা চলে না।[১১] শাসক আওয়ামী লীগ দলের ৪৫ জন সদস্যকে সংবিধান বিলের উপর আলোচনার সুযোগ দেয়া হয়। অথচ এ ব্যাপারে আলোচনা করার ইচ্ছা প্রকাশ করে কেবলমাত্র আওয়ামী লীগেরই ১৭৫ জনেরও বেশি সদস্য আবেদন করেছিলেন।[১২]

'সিডিসি, এবং 'এএলপিপি'র সংবিধান প্রণয়ন সংক্রান্ত আলোচনাগুলো রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। ফলে এসকল কমিটির চাপা আলোচনা খসড়া সংবিধানের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনগণের সংশয় দূরীকরণে কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে খসড়া সংবিধান নিরীক্ষণ করার একমাত্র স্থান ছিল সাংবিধানিক পরিষদ। এমনকি, পরিষদের আলোচনায় যেসকল সমালোচনামূলক মতামত জানা যেতো, তা' সংবিধানে যুক্ত না হলেও, এর ফলে সংবিধানের গ্রহণযোগ্যতা, দায়িত্ব–কর্তব্য বহুগণ বৃদ্ধি পেতো। যা অন্য কোনভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়। অথচ সংবিধান নিয়ে ব্যাপক আলোচনার ঘটনা কোন আশ্চর্যজনক বা নতুন বিষয় নয়। ১৯৪৬-১৯৪৯ সালে ভারতের সাংবিধানিক পরিষদে নেহেরু ও তাঁর দল স্তাবকতাহীনভাবে মোট ১৬৫ দিন সংবিধান প্রসঙ্গে আলোচনার সুযোগ দেয়।[১৩] ভারতীয় সংবিধান অবশ্যই একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। তারপরও ভারতীয় সংবিধান প্রণয়নকালে ১৬৫ দিনের আলোচনার তুলনায়

বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের ক্ষেত্রে মাত্র ১৯ দিনের আলোচনা যে নিতান্তই অপ্রতুল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। জনপ্রতিনিধিদের ভূমিকা সম্পর্কে মত পার্থক্যগত বৈষম্য তুলনা করলে নেহেরু ও শেখ মুজিবের সামগ্রিক শাসন প্রক্রিয়ার ব্যবধান সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যাবে।

ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায়, যেসকল ক্ষেত্রে আইন প্রণেতা জনপ্রতিনিধিরা (সাংসদ) নির্বাহীদের (মন্ত্রি) উপর আইনগত কর্তৃত্ব করার সুযোগ লাভ করেন, যে সকল ক্ষেত্রে আইন পরিষদ (সংসদ) শক্তিশালী, মর্যাদাপূর্ণ ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠে। আইন প্রণেতাদের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমেই বৈধ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব।[১৪] সংসদকে কার্যকর ও শক্তিশালী করার আরেকটি পদ্ধতি হলো, সদস্যদের দক্ষতা ও যোগ্যতা বিকাশের জন্য তাদেরকে সংসদীয় কার্যক্রমের 'কাজের ভেতর দিয়ে শিক্ষিত' করে তোলা।[১৫]

প্রবন্ধের এ পর্যায়ে বাংলাদেশের সাংবিধানিক পরিষদের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করা হবে। প্রথমেই দেখা হবে, সাংবিধানিক পরিষদ কি ধরনের লোকের প্রতিনিধিত্বে গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীতে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান, সংসদীয় ও রাজনৈতিক যোগ্যতা এবং অপরাপর অভিজ্ঞতার বিষয়ে আলোকপাত করা হবে। এ সকল বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে সাংবিধানিক পরিষদ সদস্যদের (এমসিএ) প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশ সাংবিধানিক পরিষদের অধিকাংশ সদস্যই (এমসিএ) ছিলেন বয়সে তরুণ। তাদের প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছিল কলেজ পর্যায়ের উপরে। কিন্তু এমসিএ'র ৮৮ শতাংশ ইতোপূর্বে সংসদীয় কার্যক্রম সম্পর্কে আদৌ কোন অভিজ্ঞতা অর্জন করেননি। রাজনৈতিক আন্দোলন ও সংগঠনের অফিস পরিচালনার মধ্যেই তাদের অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ ছিল। যদিও এই রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাই তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় নিয়ে যায়; তবুও কেবলমাত্র ঐটুকু অভিজ্ঞতা তাদেরকে আইনসভার জন্য যোগ্য সদস্য রূপে গড়ে তোলেনি। ফলে দেখা যায়, এমসিএ'দের তারুণ্য ও উচ্চশিক্ষা থাকা সত্ত্বেও আইন প্রণেতাসুলভ যোগ্যতা না থাকায় বেশির ভাগ সদস্যই সাংবিধানিক পরিষদের কার্যক্রমে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেননি। এছাড়াও অধিকাংশ এমসিএ শহর-কেন্দ্রীক মধ্যবিত্ত-পেশাজীবী শ্রেণী থেকে এসেছেন। যেমন, সদস্যদের মধ্যে আইনজীবী ছিলেন ২৯.৫ শতাংশ, ব্যবসায়ী ২৬.৯ শতাংশ, শিক্ষক ৯.৩ শতাংশ এবং চিকিৎসক ৭.৫ শতাংশ। দু'একজন ছাড়া আইনসভার ব্যবসায়ী পেশা থেকে আগত সদস্যদের কারোই বড় আকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিলনা। দেখা যায়, শহুরে মধ্যবিত্ত-পেশাজীবি সম্প্রদায়ের প্রায় সকল সদস্যেরই গ্রামাঞ্চলে পূর্ব পুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত ভূ-সম্পত্তি রয়েছে। সাংবিধানিক পরিষদের শতকরা ৫৪.৪ ভাগ সদস্যের প্রত্যেকেই কমপক্ষে ১০ একর জমির মালিক ছিলেন। এমসিএ'দের সিংহভাগই বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে উচ্চ জোতদার শ্রেণীভুক্ত ছিলেন।[১৬] ফলে সমাজতন্ত্রকে জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সঙ্গে সংবিধানের মৌলিক আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করা হলেও খসড়া সংবিধানে ভূমি সংস্কার বা ভূমি জাতীয়করণ সংক্রান্ত কোন সুনির্দিষ্ট ধারার উল্লেখ

করা হয়নি। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থায় ভূমি প্রসঙ্গে সুস্পষ্ট বক্তব্য না থাকা আওয়ামী লীগের সময়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। কারণ সমাজতন্ত্রের কথা বলা হলেও দলীয় নেতারা কেউ শ্রেণীহীন ছিলেন না, ছিলেন ধনী ভূ–স্বামী–জোতদার শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। আওয়ামী লীগের জাতীয়করণ নীতি মূলতঃ বৃহৎ ও মাঝারি ধরনের শিল্প–প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এগুলোর অধিকাংশের মালিক ছিল অবাঙ্গালী–যারা যুদ্ধের পর এদেশ ছেড়ে চলে যায়। এমসিএ'রা খসড়া সংবিধানের দ্বারা নিজেদের সম্পত্তি রক্ষা করতে সক্ষম হলেও নির্বাহীদের বিরুদ্ধে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব করার প্রবণতা হারান।[১৭]

যে যাই হোক, সাংবিধানিক পরিষদের কার্যকর ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা ছিল সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত আইন। এ আইন অনুযায়ী, কোন সদস্য যে দলের টিকেটে নির্বাচিত হবেন, সে দল থেকে বহিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সেই সদস্য পরিষদের সদস্যপদ হারাবেন। এ ব্যবস্থার ফলে সাংবিধানিক পরিষদের ৯ মাসব্যাপী কার্যকালে আওয়ামী লীগের ৪৩ জন এমসিএ দল থেকে বহিষ্কৃত হন। পাশাপাশি তারা সাংবিধানিক পরিষদের সদস্যপদও হারান। অনেক তরুণ ও শিক্ষিত এমসিএ সাংবিধানিক পরিষদে সক্রিয় ভূমিকা পালনে আগ্রহী থাকলেও সদস্যপদ বাতিল আইনের ভয়ে তারা নিরব ও সতর্ক থাকেন। ১৯৭২ সালের এপ্রিলে সাংবিধানিক পরিষদের অধিবেশন শুরুর দিনে একজন তরুণ এমসিএ একটি প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা চালান। প্রস্তাবটি ছিল– আগামী সাধারণ নির্বাচনের পূর্ব পর্যন্ত সাংবিধানিক পরিষদ জাতীয় সংসদের ভূমিকা পালন করবে। প্রধানমন্ত্রি এতে তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হন এবং সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, যদি কোন সদস্য এএলপিপি'র পূর্ব অনুমোদন ছাড়া কোন প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা চালায় তবে তাঁকে দল থেকে বহিষ্কার করা হবে।[১৮] প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের এহেন হুমকীসুলভ আচরণ সাংবিধানিক পরিষদকে একটি 'মূক সভা'য় পরিণত করে। ফলে কার্যকরী আইন পরিষদের ঐতিহ্য সাংবিধানিক পরিষদের মাধ্যমে গড়ে উঠতে পারেনি।

১১.২ সংসদের গঠন ও কার্যাবলী

সংবিধানের কার্যকারিতা শুরু হবার পর ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে জাতীয় সংসদের তিনশ' আসনের মধ্যে শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২শ' ৯৩টি আসনে জয় লাভ করে এবং মোট প্রদত্ত ভোটের ৭৩.১৭ শতাংশই আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পক্ষে পড়ে।[১৯] এমনকি, মহিলাদের জন্যে সংরক্ষিত ১৫টি আসনও আওয়ামী লীগ পায়- যাদেরকে সাধারণ নির্বাচনে জয়ী সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত করে জাতীয় সংসদে আনা হয়। প্রথম জাতীয় সংসদ সদস্যদের আর্থ–সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষাভিত্তিক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে চরিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাংবিধানিক পরিষদ সদস্যদের তুলনায় জাতীয় সংসদের সদস্যরা তরুণ এবং অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত। তবে পেশাগত অবস্থান উভয় ক্ষেত্রে প্রায় একই। জাতীয় সংসদ সদস্যদের বেশির ভাগ শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে এসেছেন। কিন্তু সংসদ সদস্যদের ভূ-সম্পত্তির পরিমাপ করলে দেখা যায়,

শতকরা ৬১.৬ ভাগ সদস্য ১০ একরের বেশি ভূমির মালিক। যা সাংবিধানিক পরিষদ সদস্যদের ভূমি-মালিকানার তুলনায় বেশি। যদিও প্রথম জাতীয় সংসদে তরুণ ও অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত সদস্যের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়; তবুও জাতীয় সংসদের কার্যকারিতা ও কর্মদক্ষতা সাংবিধানিক পরিষদের তুলনায় তেমন বৃদ্ধি পায়নি। জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্যে শতকরা ৩৩ ভাগ সদস্যের কোনই সংসদীয় যোগ্যতা ছিল না। ১০ শতাংশ সদস্যের সাংবিধানিক পরিষদসহ দু'টি সংসদের পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। শতকরা ৫৭ ভাগ সদস্যের কেবলমাত্র সাংবিধানিক পরিষদে কাজ করবার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল। দেখা যায় যে, সাংবিধানিক পরিষদের কার্যক্রম পরিষদ সদস্য এমসিএ'দের বিবিধ সংসদীয় যোগ্যতা ও আইনগত বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক করার ক্ষমতা গড়ে তুলতে সাহায্য করেনি। তদুপরি, আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারক নেতৃবৃন্দের মনোভাব, আইন প্রণয়নে সদস্যদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশ গ্রহণের ব্যাপারে ছিল নেতিবাচক। ফলে জাতীয় সংসদ কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়। আড়াই বছরব্যাপী কার্যকালের জাতীয় সংসদ মাত্র ১১৮ দিন অধিবেশনে মিলিত হয়। এ সংক্ষিপ্ত সময়কালে জাতীয় সংসদে ১৪০টি আইন পাস হয়। সকল আইনের মধ্যে ৮৫টি প্রথমে রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ হিসেবে জারি করা হয় এবং পরে সংসদের মাধ্যমে আইনে পরিণত করা হয়। যা ছিল মোট আইনগত কার্যক্রমের শতকরা ৬০ ভাগ।[২০] বিশেষ করে সংবিধানের দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংশোধনী বিল সংসদে যেভাবে পাস করানো হয়, তাতে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সংসদের নিজস্ব ক্ষমতা বলতে কিছুই নেই।

বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বিতীয় সংশোধনী বিলে রাষ্ট্রপতিকে দেশে জরুরী অবস্থা জারির ক্ষমতা দেয়া হয়- জরুরী অবস্থাকালে নাগরিকের সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার স্থগিত থাকবে এবং নাগরিক তার অধিকার ক্ষুণ্নের প্রশ্নে আইনের আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারবে না। এই বিলে সংসদের দুই অন্তঃবর্তীকালীন বিরতি ৬০ দিন থেকে বাড়িয়ে ১২০ দিন করা হয়। আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্যদের কোনরূপ বিরোধিতা ছাড়াই এ বিল সংসদে উপস্থাপনের মাত্র দু'দিনের মধ্যে পাস হয়।

বাংলাদেশ সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ও চরিত্রের মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। এ বিলের মাধ্যমে প্রচলিত সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির পরিবর্তন করে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সংসদীয় কার্য পরিচালনার সকল রীতিনীতি ভঙ্গ করে সংসদে বিলটির বিষয়বস্তু পাঠ বা আলোচনা ছাড়াই মাত্র আধাঘন্টা সময়ের মধ্যে চতুর্থ সংশোধনী বিল পাস করা হয়।[২১]

জাতীয় সংসদে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছাড়াই নিবর্তনমূলক আটকাদেশ প্রদান, রাজনৈতিক দল, ট্রেড ও শ্রমিক ইউনিয়নের কার্যক্রম নিষিদ্ধকরণ, দ্রুত বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইবুন্যাল গঠন এবং শেখ মুজিবের অনুগত আধাসামরিক জাতীয় রক্ষী বাহিনীর অফিসারদের কোন ওয়ারেন্ট বা কারণ ছাড়া গ্রেফতার ও তল্লাশী চালানোর ক্ষমতা দানের মতো বহু সংখ্যক নির্যাতনমূলক আইন সে সময় পাস করা হয়।[২২] সংসদীয়

কার্যক্রমের পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যরা জাতীয় সংসদে 'রাবার স্ট্যাম্প', বা 'সাক্ষী গোপাল' এর ভূমিকা পালন করে। এসকল সংসদ সদস্যরা পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিচিতি লাভ করেন। তাঁদের নেতৃত্বের যোগ্যতা কেবলমাত্র স্থানীয় দলীয় কার্যালয় পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁদের রাজনৈতিক আন্দোলনের গোটা প্রক্রিয়া ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের হাত থেকে তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে আওয়ামী লীগকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করা। ফলে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ার গঠনের পেছনে খুব স্বাভাবিকভাবেই ক্ষমতার মোহ কাজ করতো। তাঁরা মনে করতেন যে, সংগঠন, বিশেষ করে শেখ মুজিবের সমর্থন ছাড়া তাদের পক্ষে সংসদ সদস্য পদে নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যদের ক্ষমতার মোহ, আইন প্রণেতা হিসেবে মর্যাদা, স্থানীয় সরকার প্রশাসনের উপর তাদের প্রভাব, রিলিফ কমিটির চেয়ারম্যান পদের দ্বারা যতটা পূরণ হতো, সংসদের নির্বাহী কার্যক্রমের দ্বারা ততোটা পূরণ হতো না। জাতীয় সংসদের ভেতরে কিংবা বাইরে ক্ষমতার কোন বিকল্প কেন্দ্র গড়ে উঠবার সম্ভাবনা আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্যদের উদ্বিগ্ন করে তুলতো। তাঁদের সহজাত প্রবণতাই ছিল, যে কোন প্রকারে ক্ষমতা হস্তগত করা। শেখ মুজিবের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কারণ এই মনোভাবের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা যায়। যেজন্য তারা সংসদে বহু নিবর্তনমূলক আইন পাস বা সংসদীয় গণতন্ত্রের বদলে একদলীয় স্বৈরাচারী শাসন প্রবর্তনের সময় আনুগত্য প্রদর্শন করেন।[২৩]

১১.৩ মন্ত্রিসভার ক্ষয়প্রাপ্তি

১৯৭৩ সালে নতুন সংবিধান কার্যকরী হওয়ার আগ পর্যন্ত প্রাদেশিক সংবিধান আইন দ্বারা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি এ আইন জারি করা হয়েছিল। এ আইনের আওতায় প্রধানমন্ত্রিকে প্রধান করে একটি মন্ত্রিসভা গঠন করা হয় এবং বলা হয় যে, 'রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রির পরামর্শ অনুসারে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।'[২৪] আইনটি জারির পরদিন শেখ মুজিব রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সাংবিধানিক পরিষদ একই সাথে সাংবিধানিক ও আইন পরিষদ হিসেবে কাজ করবে না বলে শেখ মুজিবের সিদ্ধান্তের অর্থ ছিল এই যে, তিনি তাঁর সরকারকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমালোচনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হতে দিতে চাননি।[২৫] ফলে ১৯৭২ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল পর্যন্ত শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভা সম্পূর্ণ একচ্ছত্রভাবে জবাবদিহিমুক্ত থেকে আইন প্রণয়নগত এবং নির্বাহী ক্ষমতা ভোগ করে। দালালদের বিচারের জন্য বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন, কোন আপীলের সুযোগ ছাড়াই সরকারী কর্মচারীদের বরখাস্ত, শিল্পাঞ্চলে ধর্মঘট নিষিদ্ধকরণ, জনগণের মৌলিক অধিকার হরণসহ বিভিন্ন বিষয়ে ১৪০ টিরও বেশি রাষ্ট্রপতির আদেশ সে সময় জারি করা হয়। এ সকল আদেশের মধ্যে ব্যাংক ও শিল্প জাতীয়করণ, ভূমি মালিকানার সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণের মতো মৌলিক

অর্থনৈতিক পরিবর্তনের বিষয়গুলোও অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাষ্ট্রপতির আদেশে "দেশ শাসন পদ্ধতিতে জনগণের আশা-আকাঙ্খা প্রতিফলিত হচ্ছে কি– না তা' পরীক্ষা করে দেখার মতো মৌলিক অধিকার থেকেও নাগরিকদের বঞ্চিত করা হয়।"[২৬]

শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ছিল ২৩ জন। মন্ত্রিদের আর্থ–সামাজিক ও রাজনৈতিক দক্ষতার বৈশিষ্ট্যগত কাঠামো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্যের বয়স ছিল ৪০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ যে সকল ছাত্র চল্লিশের দশকের শেষ ও পঞ্চাশের দশকের শুরুতে ছাত্র রাজনীতি আরম্ভ করেন এবং ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এ সকল নেতৃবৃন্দের আন্দোলনের অভিজ্ঞতা তাদেরকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে। আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার বেশির ভাগ সদস্য ছিলেন পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত এবং সামাজিক-অর্থনৈতিকভাবে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে আগত। মন্ত্রিসভার দক্ষতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, মন্ত্রিদের সর্বোচ্চ অভিজ্ঞতা হচ্ছে রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দান এবং বিরোধী কার্যালয় দখল।[২৭] অথচ রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের মতে, এ তত্ত্বই উন্নয়নশীল বিশ্বের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে, জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে সাফল্যের সঙ্গে সরকার পরিচালনার জন্য নেতিবাচক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী পরিহার করে ইতিবাচক ও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করতে হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক মেজাজের শেকড় এতোই গভীরভাবে প্রোথিত ছিল যে, তাঁরা এই প্রবণতা কাটিয়ে উঠতে পারেননি এবং সর্বত্র প্রতিপক্ষ দেখতে শুরু করেন। তদুপরি মন্ত্রিসভার সদস্যদের সংসদীয় কার্যক্রমের অভিজ্ঞতাও তেমন দীর্ঘ ছিলনা। মাত্র দু'জন সদস্যের (মন্ত্রিসভার মোট সদস্যের শতকরা ৯ ভাগ) আয়ুব সংবিধানের আওতায় দু'টি আইন সভায় অংশ গ্রহণের অভিজ্ঞতা ছিল। প্রধনমন্ত্রি শেখ মুজিবসহ ১১ জন মন্ত্রি (মন্ত্রিসভার শতকরা ৪৮ ভাগ) ১৯৫৪ সালে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ছিলেন। বাকী ১০ জন সদস্যের (মন্ত্রিসভার শতকরা ৪৩ ভাগ) আদৌ কোন পূর্ব অভিজ্ঞতাই ছিলনা। শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য ইতোপূর্বে কখনোই মন্ত্রি ছিলেন না। একজন মাত্র সদস্য ছিলেন ১৯৫৬-১৯৫৮ সালে ২ বছর মেয়াদী আওয়ামী লীগ সরকারের মন্ত্রি। শেখ মুজিব নিজেও সে সময় মন্ত্রি হন। কিন্তু তিনি মাত্র এক বছরেরও কম সময়ে মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। যদি মুক্তিযুদ্ধকালে গঠিত প্রবাসী সরকারের মন্ত্রিসভাকে হিসাবের মধ্যে আনা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, আরো অন্য ৫ জন সদস্যের এক বছর মেয়াদী মন্ত্রিত্ব করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু সার্বিকভাবে শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভা দেশ পরিচালনার জন্য যথোপযুক্ত ছিল না। যদিও শেখ মুজিব ছিলেন অন্যান্যদের চেয়ে ব্যতিক্রম তবুও মন্ত্রিসভার সামষ্টিক অতি সাধারণ প্রকৃতি প্রথম বছরের পুরো সময় একই থাকে। মন্ত্রিসভার ক্ষয় প্রাপ্তি শুরু হয় ১৯৭৩ সালে অনুষ্ঠিত প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পর।[২৮] স্বাধীনতা প্রাপ্তির প্রথম বছরের শেষের দিকে যখন বামপন্থী বিপ্লবীদের তৎপরতা এবং দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা প্রতিরোধে শেখ মুজিব সরকারের ব্যর্থতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, তখন থেকেই শেখ মুজিব সকল ক্ষমতা নিজ হাতে কেন্দ্রীভূত করতে শুরু করেন। কেননা মন্ত্রিসভায় যৌথ দায়িত্ব পালনের মনোভাব এবং 'কাজের মাধ্যমে শিক্ষা' প্রক্রিয়া ছিল না।[২৯]

শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান জাতীয় সমস্যার প্রেক্ষাপটে মন্ত্রিদের ফলপ্রসূ চেতনার অভাব তাঁদের মনোযোগকে বিভিন্নমুখী করে তোলে। শেখ মুজিব নিজেও রাজনৈতিক অঙ্গনে ছড়িয়ে যাওয়া বিভিন্ন গুজব, কান কথা ও গাল-গল্পে প্রভাবিত হন। এসকল দুষ্ট চক্রের প্রথম শিকারে পরিণত হন ত্রাণ ও পুনর্বাসন মন্ত্রি যিনি ১৯৭৩ সালের ১৭ মে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মন্ত্রিসভার সদস্য পদ থেকে ইস্তফা দেন।[৩০] মন্ত্রির পদত্যাগের কারণ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। যখন জাতীয় সংসদের অধিবেশন শুরু হয় তখন প্রধানমন্ত্রি এ ব্যাপারে সংসদে কোন বিবৃতি দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি। ১৯৭৪ সালের ৭ জুলাই মন্ত্রিসভা থেকে ৬ জন মন্ত্রি এবং ৩ জন প্রতিমন্ত্রি পদত্যাগ করেন।[৩১] যদিও সে সময় জাতীয় সংসদের অধিবেশন চলছিল তবুও প্রধানমিন্ত্র মন্ত্রিদের পদত্যাগ সম্পর্কে কোন বিবৃতি প্রদানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রি তাজউদ্দিন আহমদকে ১৯৭৪ সালের ২৬ অক্টোবর মন্ত্রিসভা থেকে আকস্মিকভাবে বরখাস্ত করা হয়।[৩২] মন্ত্রিসভা ক্রমেই শেখ মুজিবের মন্ত্রণাসভায় পরিণত হতে থাকে। বিভিন্ন জ্ঞাত সূত্র মতে, অতি দ্রুত শেখ মুজিবের পরামর্শ ক্ষেত্র সংকুচিত হতে থাকে এবং ১৯৭৫ সালের শুরুতে আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রটি পারিবারিক সদস্য ও একান্ত সহযোগীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মন্ত্রিসভা পরিণত হয় একটি মৃত-প্রায় প্রতিষ্ঠানে।

১১.৪ আমলাতন্ত্র

উপনিবেশ আমল থেকে প্রায় এক শ' বছরের বেশি সময়কাল ধরে বাংলাদেশ নামক ভূ-খণ্ডে আমলাতন্ত্র একটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করেছে। নীতি নির্ধারণ ও প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদগুলোতে প্রথমে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস (আইসিএস) এবং পরবর্তীতে আইসিএস'-এর অনুরূপ সিভিল সার্ভিস অব পাকিস্তান (সিএসপি) থেকে লোক নিয়োগ করা হয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারী আওয়ামী লীগ এ সকল আমলাদের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতার সমালোচনায় সব সময়ই কঠোর ভূমিকা পালন করে।[৩৩] স্বাধীনতার পর প্রতিষ্ঠিত শেখ মুজিব সরকারের প্রথম পদক্ষেপ ছিল সিএসপিদের কর্তৃত্ব, উচ্চ বেতন ও চাকরির নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিনষ্ট করা। ক্ষমতায় আরোহনের পর পরই জারিকৃত রাষ্ট্রপতির আদেশ-৯ এর দ্বারা সরকারকে রাষ্ট্রীয় স্বার্থে যে কোন আমলাকে কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই বরখাস্ত করার ক্ষমতা দেয়া হয় এবং এ বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে আদালতে কোন মামলা দায়ের নিষিদ্ধ করা হয়। আমলাদের সর্বোচ্চ বেতন দু'হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি আদেশ-৯ জারি করে ১৮০ জন বাঙালি সিএসপির মধ্যে ৯ জনকে এবং বিভিন্ন পদের আরো ৬ হাজার সরকারী কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করা হয়।[৩৪] ১৯৭২ সালের প্রণীত বাংলাদেশ সংবিধানে আমলাদের ক্ষমতা হ্রাসের বিষয়টি অনুমোদন করা হয় (সংবিধানের ১৩৪ নং ধারা)। তাছাড়া গুরুত্বপূর্ণ সর্বোচ্চ সরকারি পদগুলোতে সিএসপিদের একচ্ছত্র অধিকার বিলুপ্ত করা হয়। পাকিস্তান আমলে সরকারী কর্পোরেশনগুলোর চালিকা নির্বাহী পদগুলোতে সিএসপি সদস্যদের একচেটিয়া দাপট এর মাধ্যমে অবসান ঘটে। মুজিব সরকার নব্য

স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারী কর্পোরেশন ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর উচ্চতর নির্বাহী পদে বহু সংখ্যক ব্যবসায়ী ব্যক্তিকে নিয়োগ করে। পাকিস্তান আমলে পরিকল্পনা কমিশনের উচ্চ পর্যায়ে সর্বদা সিনিয়র সিএসপি সদস্যরা নিয়োগ প্রাপ্ত হতেন। কিন্তু বাংলাদেশে মুজিব শাসনামলে পরিকল্পনা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ পদগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পেশাজীবী অর্থনীতিবিদদের দ্বারা পূরণ করা হয়।[৩৫]

উচ্চ পর্যায়ের এলিট আমলাদের ক্ষমতা ও পদমর্যাদা খর্ব করায় সচিবালয়ে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। দেখা যায়, পেশাজীবী বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সমন্বয়ে গঠিত পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সম্পদ বণ্টন, কর্মসূচি প্রণয়ন ও তদারকীর কাজ করতেন। অন্যদিকে মন্ত্রিদের নেতৃত্বে সাবেক সিএসপি সদস্যরা পরিকল্পনা কমিশন প্রণীত প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কাজ করতেন। ফলে পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প প্রস্তাব বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আমলাদের পক্ষ থেকে ক্রমাগত বিরোধিতা ও অসহযোগিতা শুরু হয়।[৩৬] শেখ মুজিব যখন নিজস্ব আইন প্রয়োগ এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিভাজন সৃষ্টির দ্বারা ফায়দা লুটতে শুরু করেন তখন পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটে। এ সময় প্রধানমন্ত্রির কৃপা দৃষ্টি হাসিলের জন্য আমলাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়। ফলে বাংলাদেশ সচিবালয়ে সামগ্রিকভাবে কর্মদক্ষতার ক্রমাবনতি ঘটে।

আওয়ামী লীগ নির্বাচনকালে ঔপনিবেশিক আমলের জেলা পর্যায়ের আমলাদের কর্তৃত্বভিত্তিক প্রশাসন পরিবর্তন করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রশাসন প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেয়– কিন্তু সরকার প্রতিষ্ঠা করে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এ ওয়াদা বাস্তবায়নে গড়িমসি শুরু করে। শেখ মুজিব সরকার আইন-শৃংখলার ব্যাপক অবনতিরোধ এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় অস্ত্রের যে ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল তা' উদ্ধারের জন্য কেন্দ্রীভূত প্রশাসনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সবসময় ক্ষমতা হারানোর ভয় করতেন এবং স্থানীয় পর্যায়ে নির্বাচিত নেতাদের প্রশাসনিক ক্ষমতা গ্রহণের বিষয়টি উৎসাহিত করতেন।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার কখনো চায়নি যে, সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুযায়ী আমলাতন্ত্র নিরপেক্ষ ও স্বায়ত্তশাসিত ক্ষমতাভোগ করুক। এমনকি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মতো, আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দলীয় ক্যাডারদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার ভেতরে সংস্থাপনও করেনি। আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের বলা হতো বাইরে থেকে প্রশাসনের উপর কড়া নজর রাখতে। বাংলাদেশ সচিবালয়ে দলীয় ক্যাডাররা আওয়ামী লীগ প্রণীত নীতিসমূহ বাস্তবায়নের পর্যায়েই চাপ সৃষ্টি করতো। মাঠ পর্যায়ে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতারা প্রশাসনকে তাঁদের অভিলাষ অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনে বাধ্য করতো। ফলে শেখ মুজিব শাসনামলে প্রশাসন কেন্দ্রে ও স্থানীয় পর্যায়ে স্বাধীন কর্মকাণ্ড পরিচালনা থেকে বঞ্চিত হয়। আওয়ামী লীগ দলীয় রাজনীতিকদের অনাকাঙ্খিত হস্তক্ষেপের কারণে প্রশাসক–আমলাগণ নীতি–নৈতিকতা হারিয়ে ফেলেন। সাম্যবাদী ক্যাডারদের মতো আদর্শবাদ ও প্রশিক্ষণ না থাকায় আওয়ামী লীগ ক্যাডাররা সমগ্র প্রশাসনকে ব্যক্তিগত কিংবা খুব বেশি হলে দলীয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য খেয়াল খুশী মতো ব্যবহার করে; যেসকল কর্মকাণ্ড আওয়ামী লীগ ও প্রশাসন ব্যবস্থা– উভয়টিকেই জনগণের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করে তোলে।

১১.৫ রাজনৈতিক দল

বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূল গতিশীলতা জাতীয় সংসদ, মন্ত্রিসভা কিংবা প্রশাসন থেকে আসেনি। এসকল প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত ক্ষয় প্রাপ্তি সমাজের মধ্যে চরম দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। ফলে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের মূলশক্তি আসে রাজনৈতিক দল বিশেষ করে বিপ্লবী বামপন্থী দলগুলোর কাছ থেকে। বিপ্লবী বামপন্থী দলগুলো মনে করতো যে, সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সর্বহারার শাসন কায়েম করে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পীড়িত জনগণের মুক্তি দেয়া সম্ভব। এ বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবে সর্বহারাদের সাচ্চা রাজনৈতিক দল।"

স্বাধীনতা–পূর্ব বাংলাদেশে বেশ কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল কাজ করতো। কিন্তু আদর্শগত বিরোধ ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে সঠিক অবস্থান নিতে ব্যর্থ হওয়ায় এ সকল বামপন্থী সংগঠন ছিল রাজনৈতিকভাবে অকার্যকর।[৩৭] স্বাধীনতার পর পরই বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। এ সময় দু'টি বিপ্লবী বামপন্থী দল শেখ মুজিব সরকারকে উদ্বিগ্ন করে তোলার মত যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করে। বাংলাদেশী তরুণদের মুক্তিযুদ্ধ অভিজ্ঞতা বামপন্থী বৈপ্লবিক দলগুলোর দ্রুত উত্থানকে ত্বরান্বিত করে। প্রথমতঃ স্বাধীনতা যুদ্ধ মাওবাদীদের 'বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস' এ মতবাদকে সমর্থন করে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্য সশস্ত্র সহিংসতাকে বৈধতা দান করে। যুদ্ধের সময় গেরিলা যোদ্ধারা, যাদের অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সমর্থক ছাত্রকর্মী, তারা দারিদ্র্য পীড়িত জনগণের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিল। এ সকল ছাত্রকর্মীরা পরবর্তীতে স্বাধীন দেশে প্রাণপনে বেঁচে থাকার সংগ্রাম নিপীড়িত মানুষের মধ্যে দেখতে পান এবং দলীয় যোদ্ধা হিসেবে নিজেদের দুর্দশা সম্পর্কেও তাদের নবতর উপলব্ধি ঘটে। দ্বিতীয়তঃ স্বাধীনতা–পূর্ব সময়ে আওয়ামী লীগের অতিরঞ্জিত প্রতিশ্রুতি জনগণের মধ্যে ব্যাপক আশা-আকাঙ্খা ও প্রত্যাশার জন্ম দিয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর পরই সামগ্রিক পরিস্থিতি বিশেষ করে অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক অবনতি ঘটায় জনতার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। ফলে পরিবর্তনকামী বৈপ্লবিক শ্লোগান জনমনে স্থান করে নিতে খুব বেশি সময়ের প্রয়োজন হয়নি।

স্বাধীনতা–পরবর্তীকালের সবচেয়ে শক্তিশালী বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দল ছিল জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জাসদ। আওয়ামী লীগের ভিন্ন মতাবলম্বীরাই এ দলটি সংগঠিত করে।[৩৮] স্বাধীনতার কয়েক মাসের মধ্যেই আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠনের (ছাত্র লীগ) কতিপয় শীর্ষস্থানীয় নেতা 'বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট লীগ' নামে একটি গোপন সংগঠন গড়ে তোলেন। কমিউনিস্ট লীগ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলোতে ভাঙনের সৃষ্টি করে নিজেদের অনুগত সংগঠন দাঁড় করান। এ প্রক্রিয়া শেষে প্রকাশ্য রাজনৈতিক দল হিসেবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল 'জাসদ'-এর আত্মপ্রকাশ ঘটে। আওয়ামী লীগ থেকে বেড়িয়ে আসা নবগঠিত জাসদ শ্রেণী সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি ঘোষণা করে।

জাসদ–তাত্ত্বিকরা ক্ষমতাসীন এলিট (আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী এজেন্ট) এবং সর্বহারাদের মধ্যকার সংঘাত গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরে দেখান যে, সংসদীয় রাজনীতি হচ্ছে বঞ্চিত জনতাকে চিরস্থায়ীভাবে শাসন করবার একটি কৌশল মাত্র। জাসদ অতি অল্প সময়েই কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ব্যাপক সমর্থন লাভে সমর্থ হয়। কর্নেল (অবঃ) আবু তাহেরে নেতৃত্বে জাসদ বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে একটি গোপন ফ্রন্ট সৃষ্টি করে। মুক্তিযুদ্ধকালে কর্নেল তাহের একটি পা হারান এবং চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গীর কারণে আওয়ামী লীগ সরকার তাঁকে সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করে। জাসদ-এর আত্মগোপনকারী ফ্রন্ট, সেনাবাহিনী বিশেষ করে নন–কমিশন অফিসার ও সাধারণ সৈনিকদের মধ্যে শাখা খুলতে শুরু করে।

অপর শক্তিশালী বৈপ্লবিক সংগঠন 'সর্বহারা পার্টি' গড়ে তোলেন ৩০ বছর বয়স্ক তরুণ প্রকৌশলী সিরাজ শিকদার।[৩৯] এ সংগঠন 'চৈনিক মডেল' অনুসরণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ শোষিত শ্রেণী হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে 'জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব' সম্পন্ন করতে অগ্রসর হয়। ফলে শুরু হয় এক দীর্ঘ মেয়াদী সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধ। সর্বহারা পার্টি এবং এর সকল সহযোগী সংগঠনই ছিল আত্মগোপনকারী। তবে জাসদ এর মতো সর্বহারা পার্টি'রও একটি গোপন সামরিক ফ্রন্ট ছিল– যাঁর নেতৃত্বে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের আরেক বীর সেনানী কর্নেল জিয়াউদ্দিন, যিনি বৈপ্লবিক আন্দোলনে যোগ দেয়ার স্বার্থে সেনাবাহিনীর চাকরি পরিত্যাগ করেন।

এছাড়াও বামপন্থীদের নেতৃত্বে আরো ছয়টি বৈপ্লবিক সংগঠন ছিল– যারা স্বাধীনতা পূর্ব বাংলাদেশেও সক্রিয় ছিল। এ সকল সংগঠনের সব ক'টিই বাংলাদেশে 'ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ'–এর আগ্রাসনের ব্যাপারে অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ করতো এবং 'শেখ মুজিবের পুতুল' সরকারকে উৎখাতের প্রচেষ্টায় নিয়োজিত ছিল। কট্টর বামপন্থীরা অবশ্য জাসদ ও সর্বহারা পার্টিকে প্রকৃত কমিউনিস্ট সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দিতে চাইতো না। তবে জাসদ ও সর্বহারা পার্টির তরুণ নেতৃত্ব অধিকাংশ হতাশ–গেরিলা–মুক্তিযোদ্ধাকে ঐক্যবদ্ধভাবে একত্রিত করতে সক্ষম হয়– যে শক্তি ক্ষমতাসীন মুজিব সরকারের জন্য প্রবল হুমকী হিসেবে দেখা দেয়।

১১.৬ আওয়ামী লীগ

এ কথা শুনতে খারাপ লাগলেও সত্য যে, বিপ্লবীরা কাল্পনিক স্বর্গরাজ্যের স্বপ্ন দেখিয়ে পরিণামে কেবলমাত্র রক্তপাত, দুঃখ–দুর্দশা আর অশ্রু বয়ে আনে। এমন হতাশাজনক পরিস্থিতি স্বাধীনতা–পরবর্তী বাংলাদেশে কাম্য ছিলনা। কেননা, পাকিস্তানী বাহিনীর নির্মম অত্যাচারের ঘটনায় বাংলাদেশের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ছিল গভীরভাবে সহানুভূতিশীল। স্বাধীনতার পরের প্রথম তিন বছরে বাংলাদেশ আড়াই হাজার কোটি মার্কিন ডলারের সম পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য লাভ করে।[৪০]

বাংলাদেশে অর্থনৈতিক সাহায্যের বিপুল জোয়ার থাকার পরেও মানুষের জীবন যাত্রার ব্যয় স্বাধীনতার প্রথম বছরের শেষেই একশ' ভাগ বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি

পর্যায়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে ৪০০ থেকে ৫০০ শতাংশে দাড়ায়। যার ফলে দেশব্যাপী দেখা দেয় চরম খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ। অনাহারে গ্রাম ও শহরের হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু ঘটে।

শেখ মুজিবের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার রাজনৈতিকীকরণের নীতির মধ্যেই নিহিত ছিল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সংকটের শেকড়। সরকার জাতীয়করণকৃত কল-কারখানা, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর নির্বাহী ব্যবস্থাপনায় দলীয় লোকজনদের নিয়োগ প্রদান করে- যাদের সামান্যতম ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা ছিলনা। বস্তুতঃ এ সকল দলীয় মনোনয়নপ্রাপ্ত শিল্প ব্যবস্থাপকরা লুটপাট, মজুতদারী ও চোরাকারবারীতে ব্যস্ত ছিল। এদিকে শেখ মুজিব সরকার কার্যতঃ সকল আমদানি বাণিজ্য জাতীয়করণ করার মাধ্যমে লাইসেন্সধারী ডিলারদের দ্বারা পণ্য-দ্রব্য বিতরণের ব্যবস্থা করেন। এ সকল লাইসেন্স-পারমিট পেতো মূলতঃ আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা এবং তারা নিজেরা ব্যবসা না করে সেগুলো উচ্চ মূল্যে প্রকৃত ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিত। আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এবং শেখ মুজিবের কতিপয় আত্মীয় পাকিস্তানী মালিকদের ফেলে যাওয়া সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করে। শেখ মুজিবের একমাত্র ভাইসহ আওয়ামী লীগের সাথে ঘনিষ্ঠ লোকাজনের লাগামবিহীন চোরাচালানের ফলে বাংলাদেশে উৎপন্ন ধান ও পাটের শতকরা পনের ভাগ দেশের বাইরে চলে যেতে থাকে।[৪১] ফলে দেশে অতি দ্রুত একদল নব্য ধনী শ্রেণীর সৃষ্টি হয়-যারা উৎপাদন কর্মকাণ্ডে জড়িত না থেকেও সরকারের উপর প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে।[৪২]

আওয়ামী লীগ নেতাদের জাঁক জমক ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপনকারী শ্রেণী হিসেবে আবির্ভাব হলে শাসক গোষ্ঠীর বিলাস ও বঞ্চিতদের শোষিত হবার ব্যাপারে বামপন্থীদের শ্লোগান ব্যাপক জনপ্রিয়তা ও জন সমর্থন লাভ করে। অধিকন্তু আওয়ামী লীগ প্রচারিত আদর্শের ভূয়া বুলি প্রকৃত মার্কসবাদী মতবাদের আবেদনকে মোকাবিলা করতে সক্ষম ছিল না। আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা প্রচার করতো যে, তাঁরা 'মুজিববাদ' নামে এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করছেন। কিন্তু 'মুজিববাদ' আদর্শকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র-এ চার মতাদর্শের বেশি কিছু বলতো না। ছাত্র সমাজসহ শিক্ষিত বাংলাদেশীরা স্বাধীনতা সংগ্রামে শেখ মুজিবের ভূমিকাকে সমর্থন করলেও তাঁকে কখনোই বুদ্ধিজীবী বলে মনে করেননি। আওয়ামী লীগ নেতাদের 'মুজিববাদ' কায়েমে দৃঢ় মনোভাবের মুখে শিক্ষিত শ্রেণীর যে কোন যুক্তি-তর্কই প্রত্যাখ্যাত হতো।

বাংলাদেশের মতো দারিদ্র্য পীড়িত সমাজে বুদ্ধিবৃত্তিক দিক-নির্দেশনাবিহীন আদর্শের অভাবের সঙ্গে চরম ক্ষমতার মোহ ও সম্পদ অর্জনের প্রতিযোগিতা অচিরেই আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের আন্তঃকোন্দলে পতিত করে। আওয়ামী লীগের তরুণ অংশের দ্বন্দ্ব-সংঘাতের একদিকে ছিলেন শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ ফজলুল হক মনি এবং অন্যদিকে ছিলেন প্রধানমন্ত্রি শেখ মুজিবের রাজনৈতিক সচিব তোফায়েল আহমেদ ও আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবদুর রাজ্জাক। শেখ মনি কতিপয় তরুণ

আওয়ামী লীগ ক্যাডারকে নিয়ে একটি যুব সংগঠন গড়ে তোলেন এবং আওয়ামী লীগের শ্রমিক সংগঠন 'শ্রমিক লীগ' এর সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নানকে নিজের পক্ষে টানেন। অপরদিকে তোফায়েল ও রাজ্জাক আওয়ামী লীগের ছাত্র সংগঠন 'ছাত্রলীগ' এর উপর নিজেদের প্রভাব জোরদার করেন।[৪৩] তরুণ আওয়ামী লীগ নেতাদের মধ্যকার চরম কোন্দল প্রবীণ নেতাদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে তখনই ফুটে উঠেনি। তাজউদ্দিন আহমদ আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় ক্ষমতাশালী পদটি শেখ মনির কাছে হারান। তাজউদ্দিন প্রকাশ্যে শেখ মনি ও তার অসৎ-দুর্বৃত্ত সহচরদের সমালোচনা করতে থাকেন। শেখ মনির পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি 'মুজিববাদ' মতবাদকেও তাজউদ্দিন আহমদ পছন্দ করতেন না। আওয়ামী লীগের প্রধান নেতৃবৃন্দ তাজউদ্দিনকে নৈতিক সমর্থন দিলেও শেখ মনির কোপানলে পতিত হবার আশঙ্কায় প্রকাশ্যে কোন অবস্থান গ্রহণ করতে পারেনি।[৪৪]

কতিপয় রাষ্ট্রবিজ্ঞানী যুক্তি দেখান যে, এমন সব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারী সংগঠন টিকে থাকতে পারে-যারা আন্দোলনে যোগদানকারী বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে পারে। এ ধরনের সমন্বয়বাদী কার্যক্রমের সাফল্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে উদাহরণ হিসেবে সাধারণতঃ উল্লেখ করা হয়।[৪৫] বাংলাদেশের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের বেলায় দেখা যায়, একমাত্র শেখ মুজিবের মধ্যস্থতাই ছিল দলের ভেতরকার বিভিন্ন উপ-দলের কাছে গ্রহণযোগ্য। কিন্তু শেখ মুজিব যেনতেনভাবে দলের অন্তঃবিরোধ মিটিয়ে দিতেন। ফলে দ্বন্দ্ব-সংঘাত আক্রান্ত আওয়ামী লীগে খুবই স্বল্প সময়ের জন্য শান্তি বজায় থাকতো।

আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বিভিন্ন উপদলীয় কোন্দল প্রায়ই ভ্রাতৃঘাতী লড়াই-এর চরিত্র ধারণ করে। ১৯৭২-৭৫ সময়কালে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী গুপ্ত হত্যার শিকার হয় মূলতঃ উপদলীয় সংঘাতের কারণে।[৪৬] ১৯৭৪ সালের মার্চ মাসে শেখ মুজিব যখন মস্কোতে চিকিৎসারত তখনই সবচেয়ে ভয়াবহ লড়াই শুরু হয় আওয়ামী লীগের বিভিন্ন উপ-দলের মধ্যে। শেখ মুজিবের ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে তাঁর আর বাঁচার সম্ভাবনা নেই। ফলে আওয়ামী লীগের ক্ষমতালিপ্সু উপদলগুলোর মধ্যে ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু হয়। তাজউদ্দিন আহমদ সৎ ও প্রগতিশীলদের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানান। ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দ প্রকাশ্য জনসভায় দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতাদের এক কালো তালিকা প্রকাশ করেন, যে তালিকার শীর্ষে ছিল শেখ মনি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের নাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও এ সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে এবং শেখ মনির সমর্থক ৭ জন ছাত্র ক্যাডার নির্মমভাবে নিহত হয়।[৪৭] পুরোপুরি সুস্থ হয়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করে শেখ মুজিব কোন রকমে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে ফেলেন। শেখ মনির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে শেখ মুজিব তাঁর ভাগ্নের প্রতি সহানুভূতি দেখান। যা 'সর্বোচ্চ নেতা' শেখ মুজিবের উপর শেখ মনির প্রভাবকে আরো বৃদ্ধি করে।

১১.৭ পঁচাত্তরের আগস্ট অভ্যুত্থান

রাজনৈতিক ও আদর্শিক পর্যায়ে সংগ্রাম এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ সরকারি তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশে বিপ্লবীদের প্রভাব প্রতিহত করা যেতো। উল্লেখিত দু'পর্যায়ে ব্যর্থ হয়ে শেখ মুজিব ব্যাপক দমন নীতির আশ্রয় নিলেন। ১৯৭৫ সালের আগস্ট মাসের সামরিক অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ সরকার ৮৬,০০০ এরও বেশি লোককে আটক করেছিল বলে বামপন্থীরা অভিযোগ করে। দেশের বিভিন্ন স্থানে 'দুবৃত্ত নির্মূল অভিযান'-এর নামে শেখ মুজিবের নিজস্ব জাতীয় রক্ষী বাহিনী কর্তৃক ৬০,০০০ বামপন্থী কর্মী ও সমর্থককে হত্যা করা হয়। চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৯৭৪ সালের ২৮ ডিসেম্বর মুজিব সরকার সমগ্র বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে এবং নাগরিকদের জন্য সংবিধান প্রদত্ত সকল মৌলিক অধিকার অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেয়।[৪৮]

রাজনৈতিক নিপীড়ন যখন উল্টো ফলদায়ক বলে প্রমাণিত হয় তখন শেখ মুজিব সংবিধান পরিবর্তনে সম্মত হন। সংবিধান পরিবর্তন করে শাসন ব্যবস্থা বদলানোর ধারণাটি ঢাকাস্থ রুশ দূতাবাস শেখ মুজিবের ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের দিয়েছিল।[৪৯] দলের চীফ হুইপের কঠোর হস্তক্ষেপে অনেক সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত অনুভূতির বিরুদ্ধে সংবিধান সংশোধন করে একদলীয় রাষ্ট্রপতি শাসিত 'বাকশাল' ব্যবস্থার সরকার প্রবর্তন করা হয়– যে ব্যবস্থা ছিল অনেক আফ্রিকান দেশের মডেল।[৫০] অথচ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রবীণ গুরু এরিস্টটল বহু পূর্বেই বলে গেছেন যে, সংবিধান ঝালাই করে সমাজে বিদ্যমান মৌলিক ক্রটি সারানো যায় না। সংবিধান বদল করে নগ্ন একনায়কতন্ত্র প্রবর্তন শেখ মুজিবের শাসনের বৈধতাকে আরো ক্ষতিগ্রস্ত এবং সামরিক বাহিনীর ক্ষুদ্র অথচ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও নিষ্ঠুর অংশের পক্ষে ক্ষমতা দখলের পথকে আরো প্রশস্ত করেছিল।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষক লরেন্স লিফসুজ ১৯৭৫ সালের আগস্ট অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী সামরিক কর্মকর্তাদের বিস্তারিত সাক্ষাতকার নিয়েছিলেন। তিনি এক প্রবন্ধে এ তথ্য দেন যে : মুজিব শাসনামলের অবসানকারী অভ্যুত্থানটি ছিল সিআইএ'র জ্ঞাতসারে আওয়ামী লীগের ডানপন্থী অংশ ও সেনাবাহিনীর অফিসারের বছরকালব্যাপী ষড়যন্ত্রের ফসল। লরেন্সের মতে, ক্রম বর্ধমান বামপন্থী বিপ্লবী আন্দোলনকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যাপারে শেখ মুজিবের ব্যর্থতাই ছিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট বিরোধী শক্তিগুলোর একত্রিত হবার পেছনে মূল কারণ।[৫১] কিন্তু বাস্তবে এমন হয়ে থাকলেও ষড়যন্ত্র প্রমাণ করা খুবই কষ্টকর। অবশ্য, শেখ মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর সদস্যদের যথেষ্ট ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্বেষ ছিল। আওয়ামী লীগ সরকারের উপর্যুপরি চারটি রাজস্ব বাজেটে সেনাবাহিনীর জন্য গড় বরাদ্দ ছিল বছর প্রতি মোট বাজেটের শতকরা ১৫ ভাগের মতো ক্ষুদ্র অংশ।[৫২] সেনাবাহিনীর জন্যে বরাদ্দ সামান্য অর্থের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় করা হয় নব গঠিত আধা–সামরিক জাতীয় রক্ষী বাহিনীকে অস্ত্র সজ্জিত ও শক্তিশালী করার কাজে। ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহযোগীদের মন্ত্রণায় শেখ মুজিব যেভাবে অফিসারদের পদোন্নতি ও বরখাস্ত করছিলেন তা'ও সশস্ত্র বাহিনীকে ক্ষুব্ধ করেছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের মাধ্যমে সাধারণ জনগণ ও সেনাবাহিনীর মধ্যকার বিদ্যমান দূরত্ব ঘুচে যায়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিপ্লবী সংগঠনগুলোর মধ্যে দু'টি–জাসদ ও সর্বহারা পার্টি–ইতোমধ্যেই সেনাবাহিনীতে অনুপ্রবেশ করেছিল। 'দুর্বৃত্ত ও চরমপন্থীদের দমন, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার ও চোরাচালান দমনের লক্ষ্যে বেসামরিক প্রশাসনের সাথে কাজ করার জন্য শেখ মুজিব তিন বার সেনাবাহিনীকে ব্যারাকের বাইরে নিয়ে এলে সশস্ত্র বাহিনীর রাজনৈতিকীকরণ আরো বৃদ্ধি পায়। কিন্তু অবৈধ অস্ত্রধারী ও দুর্নীতিবাজ আওয়ামী লীগ নেতা– কর্মীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে গেলে শেখ মুজিব প্রতিবারই সেনা বাহিনীকে প্রত্যাহার করে নেন।[৫৩] এমনকি, 'সম্মানিত নাগরিকদের বিরক্ত করার জন্য' অভিযুক্ত করে শেখ মুজিব কতিপয় সামরিক অফিসারকে বরখাস্ত করেন। দৃশ্যতঃ এটা অনুধাবন করা যায় যে, সেনা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষোভ ছাড়াও শেখ মুজিব শাসনের ক্রম হ্রাসমান বৈধতা ও গ্রহণযোগ্যতার কারণে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহে সেনা বাহিনীর হস্তক্ষেপ ছিল কেবলমাত্র সময়ের ব্যাপারে। মুজিবের আদেশে দায়িত্ব পালনের দায়ে কতিপয় অফিসারকে মুজিব কর্তৃক বরখাস্তের ঘটনা এক্ষেত্রে শুধুমাত্র বৃদ্ধিকারী (acceleratlor) ভূমিকা পালন করেছিল। তরুণ সেনা অফিসাররা সম্মান, পদমর্যাদা ও জীবিকা বঞ্চিত হয়ে কেবল অভ্যুত্থান ঘটানো ও নৃশংসভাবে শেখ মুজিবকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি– তাঁর পরিবারের অধিকাংশ সদস্যকেও হত্যা করে।[৫৪]

১১.৮ উপসংহার : অনিবার্য পতন?

যে কেউ অনায়াসে এ যুক্তি দেখাতে পারেন যে, যে কোন মাত্রায় প্রচেষ্টা চালানো হলেও বাংলাদেশের অসংখ্য জটিল সমস্যার মোকাবিলায় যে কোন সরকার পরাস্ত হতে বাধ্য। উন্নয়নশীর দেশগুলো বর্তমান সময়ে যে ধরনের জটিল সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে, বাংলাদেশ জন্মলগ্ন থেকেই সে সকল সমস্যার সম্মুখীন। মাত্র ৫৫,১২৬ বর্গমাইল আয়তনের অসম্ভব ঘনবসতিপূর্ণ বাংলাদেশে প্রতি বর্গমাইলে ২,১৯০ জন মানুষ বসবাস করে। খাদ্য উৎপাদনে দেশের ধারাবাহিক ঘাটতির কথা বিবেচনা করলে প্রায় আট কোটি মানুষের অন্ন সংস্থানের বিষয়টি বস্তুতঃই ভয়াবহ ব্যাপার। তৃতীয় বিশ্বের যে কোন দেশের জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন একটি কঠিন কাজ। স্বাধীনতা যুদ্ধের ধ্বংস লীলার ফলে এ বিষয়টি বাংলাদেশে আরো কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে স্বাধীনতা অর্জনের ফলে জনগণের প্রত্যাশা সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল এবং আইনের প্রতি জনগণের সহজাত শ্রদ্ধাবোধ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। হতাশ জনতা সহজেই হাতে তুলে নিতে পারতো যুদ্ধ পরবর্তীতে সহজলভ্য অস্ত্র ও গোলা–বারুদ, যার ফলে বিদ্যমান সমাজ ব্যবস্থার গ্রন্থিগুলোতে ধস দেখা দেয়। উল্লেখিত দৃষ্টিভঙ্গী একদিকে দেখার শামিল এবং খুবই ভাসা ভাসা।

সীমাহীন সমস্যা সঙ্গে নিয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের যাত্রা শুরু হলেও নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রটির অনেকগুলো সুবিধাও ছিল। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দুরবস্থায় আন্তর্জাতিক সহানুভূতি বাংলাদেশকে স্বাধীনতার প্রথম তিন বছরে আড়াই হাজার কোটি মার্কিন ডলার সাহায্য পেতে সহায়তা

করেছিল। তাছাড়া বাংলাদেশের সমাজে ভাষাগত, গোষ্ঠীগত, বর্ণগত বা সংস্কৃতিগত কোন বিভেদ ছিলনা– যা তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শাসনকার্যকে কঠিন করে তোলে। বাংলাদেশের সমাজে অতিক্রম অযোগ্য কোন শ্রেণী দ্বন্দ্বও ছিলনা। ভাগ্যক্রমে বাংলাদেশ সামন্তবাদী অভিজাততন্ত্র এবং আধুনিক পুঁজিপতিদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছিল। বাংলাদেশের সামন্তবাদী শ্রেণীটি ছিল মূলতঃ হিন্দু যারা ১৯৪৭ সালের ভাগাভাগির পর সাবেক পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করে। শিল্পপতিদের প্রায় সকলেই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানী, স্বাধীনতার প্রাক্কালে যারা বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, শেখ মুজিবের রাজনৈতিক ব্যবস্থার পতনের প্রাথমিক কারণ হলো বাংলাদেশের লাগসই ও কার্যকরী রাজনৈতিক গতিধারায় বিদ্যমান দু'টি সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যর্থতা। প্রথমটি ছিল, রাজনৈতিভাবে সংশ্লিষ্ট সমাজের বিভিন্ন স্তরগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক পদ্ধতি সম্পর্কে ঐক্যমত্য গঠনে ব্যর্থতা। প্রাক-স্বাধীনতাকালে সংসদীয় পদ্ধতি সম্পর্কে যে ঐকমত্য গড়ে উঠেছিল; পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এক বছরব্যাপী সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধে চরমপন্থী শক্তিগুলোর উত্থানে সে ঐক্যমত্য বিনষ্ট হয়। চরমপন্থী গোষ্ঠী ধারণা পোষণ করতো যে, বাংলাদেশের ব্যাপক দারিদ্র্য দূরীকরণের একমাত্র উপায় হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধের মতো আধুনিক অস্ত্র নিয়ে একটি রক্তাক্ত সামাজিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। শীঘ্রই তারা সর্বহারার শত্রুদের নিধন শুরু করলো এবং সরকারের প্রতিনিধি ও শোষক শ্রেণীকে রক্ষাকারী নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লো। যার ফলাফল হিসেবে মুজিব সরকার ও বিপ্লবী বাহিনীগুলোর মধ্যে শক্তি ক্ষয়কারী যুদ্ধ লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক আরো অনেক প্রান্তিক, আধা–সামন্তবাদী ও আধা-পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের মতো বাংলাদেশেও আদর্শবাদী রোমান্টিক বিপ্লবীরা মুজিব শাসনের ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু সেনাবাহিনী অধিকতর ভালো অবস্থান, দক্ষ সংগঠন, গোপনীয়তা, গতি ও চমক প্রদানের ক্ষমতা নিয়ে বিপ্লবীদের কাছে থেকে বিজয় ছিনিয়ে নিলো।

পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে দীর্ঘ কুড়ি বছর সংগ্রামে আওয়ামী লীগ নেতাদের যে দক্ষতা বেড়েছিল সেটা দিয়ে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু দেশ শাসনের নতুন কাজে তাদের এ দক্ষতা ছিল অপ্রাসঙ্গিক। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে শেখ মুজিবের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক দল। ভিন্নমতের প্রতি তার অসহিষ্ণুতা মুজিবের পক্ষের লোকদের পুরোপুরিভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল। কিন্তু নেতিবাচক রাজনীতিকে সংগঠিত করার পদ্ধতি ও কৌশল গঠনমূলক রাজনীতিকে কার্যকর করার জন্য ১৯৭৩–এর সংবিধানের প্রতিষ্ঠানসমূহকে অকার্যকর করে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সময় শেখ মুজিব যেভাবে রাজনৈতিক স্টাইল ও দৃষ্টিভঙ্গী (কেন্দ্রিকতার প্রতি আসক্তি, ভিন্নমতের প্রতি অসহিষ্ণুতা, পছন্দ ও দায়িত্বশীলতার বদলে উদ্যোগ ও নেতৃত্বের প্রাধান্য) অর্জন করেছিলেন; সেটাই সংসদকে অকার্যকর ও মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাহীন করেছিল। রাষ্ট্রের সঙ্গে দলের সম্পর্কের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ

নেতাদের মনোভাব সরকার ও প্রশাসনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করেছিল। বাংলাদেশের সদ্যজাত আইনসভা ও মন্ত্রি পরিষদের প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনার জন্য আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য ও প্রশাসকদের একটি সমষ্টি তৈরি করতে পারতো। না পারার ফল হলো, বর্ধিষ্ণু রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তিগত গণ্ডি পেরিয়ে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্যকারিতা বাড়াতে ও বৈধতার উন্নয়ন ঘটাতে পারেনি। আত্মীয়-স্বজন ও ঘনিষ্ঠজনদের প্রতি শেখ মুজিবের দুর্বলতা বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এটা বুঝা যায় যে, বাহ্যতঃ শক্তিশালী শেখ মুজিব ভেতরে ভেতরে নিরাপত্তার অভাব বোধ করছিলেন। সম্ভবতঃ এটাই তাঁর স্তাবক পরিবৃত্ত থাকার এবং রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়দের সঙ্গে পরামর্শ করার স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করে। নিজের স্বার্থে কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করার খেলাকে শেখ মুজিব উপভোগ করতেন এবং প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য তাঁর কোন সুদূরপ্রসারী কর্ম পরিকল্পনা ছিলনা। তবুও শেখ মুজিব ও তাঁর দল আওয়ামী লীগ সম্ভবতঃ প্রত্যাশার চেয়ে অনেক বেশিই সম্পাদন করেছে। এ কৃতিত্ব শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের যে, তারা অত্যাচারী নিপীড়ক শাসকের হাত থেকে মুক্তি ছিনিয়ে এনে বাংলাদেশীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ক্ষমতা আরোহণের অল্প পরে শেখ মুজিব নিজেই নিজের সমাধি গাঁথা রচনা করেছিলেন সাংবাদিকদের কাছে এই উক্তির মাধ্যমে : সম্ভবতঃ এ জাতির স্বাধীনতার জন্য একজন নেতৃত্ব দেবে আর একজন জাতির ভবিষ্যত বিনির্মাণ করবে।[৫৫]

সূত্র ও পাদটীকা

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও শেখ মুজিবের ভূমিকা সম্পর্কে দেখুন; Talukdar Maniruzzaman, *Redical Politics and the Emergence of Bangladesh,* Dhaka: Bangladesh Books International Ltd. 1975

২. *Ibid,* P. 41

৩. "Political Development and Political Decay" প্রবন্ধে Samuel P. Huntington বলেছেন: "রাজনৈতিক উন্নয়ন ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন যদি সমানভাবে না হয় এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহে যদি ভাঙন দেখা দেয় তবে তা, রাজনৈতিক অবক্ষয়ের প্রাথমিক কারণ হিসেবে কাজ করবে।" বিস্তারিত, *World Politics,* Vol. XVII, 1965, pp. 386-430

৪. Seymour M. Lipset, "Social Conflict, legitimacy and Democracy", in *Political Man,* London: Heinemann Educational Books Ltd. reprint 1971, pp. 77-98

৫. Proclamation of Independence Order, *Bangladesh Documents,* New Delhi: Government of India, Publication Division, n.d. pp. 281-283

৬. *The Bangladesh Observer,* Dhaka: March 24, 1972

৭. ১৯৭০ সালের শেষে এবং ১৯৭১ সালের প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে ১৬৯ জন এবং ৩০০ জন সদস্য প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত হন। ১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন পরিষদ (Constituent Assembl) প্রথম অধিবেশনে মিলিত হলে দেখা যায় যে, নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে, আওয়ামী লীগ থেকে বহিস্কৃত হওয়ায় ২৩ জনের সদস্য পদ বাতিল হয়েছে, মুক্তিযুদ্ধের সময় দালালীর দায়ে ৬ জন অযোগ্য ঘোষিত হয়েছেন। সংবিধান

বিল সংসদে উত্থাপনের সময় পরিষদের সদস্য সংখ্যা কমিয়ে ৪০৪-এ নামিয়ে আনা হয়। ৪৬৯ আসন বিশিষ্ট পরিষদের শক্তি হ্রাসের অন্যান্য কারণ হলো, এরই মাঝে আরো ২০ জন সদস্য আওয়ামী লীগ থেকে বহিষ্কৃত হন, ৩ জন মৃত্যুবরণ করেন, ২ জন পদত্যাগ করেন, ১ জন কূটনৈতিক পেশায় যোগ দেন। বিস্তারিত, Abul F. Huq. "Constutution-making in Bangladesh", *Pacific Affairs,* Vol. XLVI, No. 1, Spring 1973, p. 60

৮. *Ibid,* p. 60

৯. *The Bangladesh Observer,* October 18, 1972

১০. Abul F. Huq. *Op cit.*, p. 68

১১. Morris-Jones, W. H., *Parliament in India,* London: Longmens, Green and Co., 1975, p. 85
উল্লেখ্য ভারতের খসড়া সংবিধানের উপর ৮ মাস জনমত নেয়া হয়।

১২. *The Bangladesh Observer,* October 21, 1972

১৩. Seymour M. Lipset, *পূর্বোক্ত;* Morris-Jones, *Op cit,* p. 81.

১৪. জনপ্রিয় সংসদীয় ব্যবস্থার বিকাশের প্রথম উদাহরণ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক অধিবেশন ও কংগ্রেসে লক্ষ্য করা যায়।

১৫. ভারতীয় সংসদীয় কার্যক্রমের সাফল্যের পেছনে ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের মাধ্যমে ভারতীয় রাজনীতিবিদদের অভিজ্ঞতা অর্জনের বিষয়টি অন্যতম। বিস্তারিত দেখুন, Morris-Jones *op. cit,* pp. 43-73

১৬. Nurul Islam, *Development Planning in Bangladesh : A Study in Polical Economy,* London: C. Hurst and Company, 1977, p. 13; নূরুল ইসলাম একজন পেশাজীবি অর্থনীতিবিদ, পরিকল্পনা কমিশনের উপ-প্রধান এবং মুজিবের কেবিনেট মন্ত্রি হিসেবে কাজ করেছেন।

১৭. স্বাধীনতার পর পর আওয়ামী লীগ সরকার রাষ্ট্রপতি আদেশ বলে জমির সিলিং ৮.৩ একর ধার্য করে। এই পরিকল্পনা আওয়ামী লীগ দলীয় সাংসদদের দ্বারা দারুণভাবে ব্যাহত হয়। ফলে সরকার বাংলাদেশ ভূমি সিলিং (সীমিত) আদেশ–১৯৭২ জারি করে পরিবার-প্রতি জমির পরিমাণ ২৫ একর নির্ধারণ করে। এই আইনটিও কার্যকর হয়নি। অনেকের দখলে প্রচুর অতিরিক্ত জমি ছিল। বিস্তারিত দেখুন, I. N. Mukerjee, "Agrarian Reforoms in Bangladesh", *Asian Survey,* Vol. XVI, No. 5, Maj 1976, pp. 452-462

১৮. *Holiday,* April 26, 1972

১৯. আওয়ামী লীগের সশস্ত্র হস্তক্ষেপ ও জাল ভোট প্রদানের ফলে নির্বাচনের বৈধতা ব্যাহত হয় এবং আওয়ামী লীগ তাদের ইচ্ছে অনুযায়ী সব ক'টি আসনে জয়ী হয়। বিস্তারিত দেখুন, Serajul Hossain Khan, "Electoral Democracy Buried", *Holdiay,* Dhaka: March 18, 1973

২০. বিস্তারিত দেখুন, *The Bangladesh Observer,* June 3, 1973; Sept. 16, 1973, January 15, 1974; July 23, 1974; November 20, 1974; January 21, 1975; June 24, 1975. সংবিধানের প্রদত্ত ক্ষমতায় [ধারা-৯৩ অনুযায়ী] রাষ্ট্রপতি 'অধ্যাদেশ' দিয়ে আইন প্রয়োগ করতে পারেন। যা পরে সংসদের মাধ্যমে প্রয়োজনে আইন হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

২১. Talukdar Maniruzzaman, "Bangladesh in 1975: The Fall of the Mujib Regime and its Aftermath," *Asian Survey,* Vol. XVI, No. 2, February 1976, p. 120
চতুর্থ সংশোধনী পাসের পর থেকে মাত্র দুই জন আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য সংসদের অধিবেশনে যোগদানে বিরত থাকেন এবং পরে পদত্যাগ করেন। এঁরা হলেন, মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল (অব.) এম. এ. জি. ওসমানী এবং *দৈনিক ইত্তেফাক* ও *দি নিউ নেশন* পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন।

২২. *Holiday,* February 3, 1974; Ferbruary 24, 1974

২৩. Raunaq Jahan, "Members of Parliament in Bangladesh," *Legislative Studies Quarterly,* Vol. I, No. 3, August 1976, pp. 365-8

২৪. বাংলাদেশ সংবিধান আদেশ ১৯৭২ এর পূর্ণ বিবরণ দেখুন, *The Bangladesh Observer,* January 13, 1972

২৫. ১৯৪৬ সালে নির্বাচিত ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক পরিষদ ২৪ নভেম্বর ১৯৪৯ নতুন সংবিধান প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় পরিষদ ও শাসনতান্ত্রিক পরিষদ উভয় ক্ষেত্রেই কাজ করে। শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তার বৈধতা পরিমাপ করে সম্পাদকীয় প্রকাশের অভিযোগে সরকার অধিকৃত পত্রিকার প্রবীণ সাংবাদিক–সম্পাদক আব্দুস সালামকে চাকরিচ্যুত করা হয়। নিবন্ধটি ছিল, Abdus Salam, "The Supreme Test" (editorial), *The Bangladesh Observer,* Dacca : March 15, 1972

২৬. A.K. Khan, "People Deprived of Fundamental Rights", *Holiday,* Dacca: August 20, 1972

২৭. তিরিশ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন একমাত্র হিন্দু মন্ত্রি। যিনি ব্রিটিশ ভারতের সময়কাল নেতাজী সুভাষ বসুর অনুসারী হিসেবে রাজনীতি শুরু করেন।

২৮. নির্বাচনের পর যে মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তা' মূলতঃ পূর্বের মন্ত্রিসভার অনুরূপ ছিল। একজন মাত্র নতুন সদস্য মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ছিলেন এবং আওয়ামী লীগ সরকারের (১৯৫৬-৫৮) মন্ত্রি হিসেবে তাঁর দুই বছরের অভিজ্ঞতা ছিল।

২৯. Nurul Islam, *Op. cit.,* p. 49

৩০. *The Bangladesh Observer,* May 18, 1973

৩১. *The Bangladesh Observer,* July 8, 1974

৩২. *The Bangladesh Observer,* October 27, 1974

৩৩. "Awami League Manifesto," *Bangladesh Documents,* New Delhi: Government of India, Publication Divistion, n.d. p. 70

৩৪. Talukdar Maniruzzaman, "Adminisitrative Reforms and Politics within the Bureaucracy in Bangladesh," *The Journal of Commonwealth and Comparative Politics,* Vol. XVII, No. 1 March 1979, p. 48

৩৫. A. T. R. Rahman, "Administration and its Political Environment in Bangladesh," *Pacific Affaris,* Vol. XLVII, No. 2, Summer 1974, p. 171

৩৬. বিস্তারিত দেখুন, তৃতীয় অধ্যায়, "The Planning Commission and the Administrative Ministries," in Nurul Islam, *Op. cit.* p. 63-81

৩৭. বিস্তারিত দেখুন, Talukdar Maniruzzaman, *Radical Politics and the Emergence of Bangladesh,* Dhaka: Bangladesh Books International Ltd. 1975

৩৮. জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জাসদ) বিকাশ ও মতাদর্শ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Lawrence Lifschultz, "Abu Taher's Last Testament: Bangladesh: The Unfinished Revolution", *Economic and Political Weekly,* Special Number, August 1977, pp. 1303-1354

৩৯. স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের বৈপ্লবিক রাজনৈতিক দল সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, Talukdar Maniruzzaman, "Bangladesh an Unfinished Revolution? *Journal of Asian Studies,* Vol. XXXIV, No. 4 August 1975, pp. 891-911, Shapan Ghaani, "Leftist Vigneties in a Half Revolution," Far Eastern Economic Review, Vol. LXXV, No. 10, March 4, 1972. pp. 20-21

৪০. দেখুন, The Post- Budget Statement of Secretary, External Resources Division, *The Azad,* July 2, 1978

৪১. *The Financial Times*: London August 16, 1975

৪২. Badruddin Umar, "On Fake Industries and Dealerships," *Holiday*, April 29, 1973; "The Anti-Awami League," *Holiday* 14, 1974; "The Plunmderers and Capitalist Roaders", *Holiday*, May 5, 1974; "Production, Distribution, Smuggling and Price Rises in Bangladesh, " *Holiday*, May 12, 1974

৪৩. আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন, "Spectre of Paralled Government Stalks the Land: Schism Widens within AL", *Holiday*, May 6, 1973; "Power Stuggle becomes Acute: Crisis Engulfs Country," *Holiday*, May 10, 1973; Badruddin Umar, "Who will have the Awami League", *Holiday*, March 31, 1974

৪৪. "AJL Bee in AL Bonnet," *Holiday*, June 24, 1973; N. M. Harun, "Tajuddin, Usmani to Resign? " *Holiday*, January 6, 1974

৪৫. Rajni Kothari, "The Congress System Revisited : A Decential Review," *Asian Survey*, Vol. XIV, No. 12, 197, pp. 1035-1054.

৪৬. শেখ মুজিবের বিবরণ অনুযায়ী, ৫ জন সংসদ সদস্যসহ তিন হাজার আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মী গুপ্ত হত্যার শিকার হয়; বিস্তারিত, Rounaq Jahan, *op. cit.*, p. 364

৪৭. *Holiday*, April 7, 1974

৪৮. "Power to Mujib's Private Army," *Far Eastern Economic Review*, Vol. 87, No. 2, January 10, 1975; *Gono Kantha* (Bengla National Daily), Dhaka: December 19/26, 1973.

৪৯. David Hearst, "Democracy: Death by Decree," *Far Eastern Economic Review*, January 10, 1975

৫০. Talukdar Maniruzzaman, "Bangladesh in 1975: The Fall of the Mujib Regime and its Aftermath", *Asian Survey*, Vol. XVI, No.2, 1976, pp. 119-120

৫১. Lawrence Lifschults, "The Intrigue Behind the Army Coup which Toppled Sheikh Mujib," *Guardian*, London: August 15, 1979

৫২. *The Bangladesh Observer*, July 1, 1972; June 15, 1973; June 20, 1974; June 24, 1975

৫৩. Enayetullah Khan, "Why the Armed Forces have Been called out," *Holiday*, April 28, 1974.

৫৪. "Anatomy of Dacca Coup," *Sunday*, Calcutta: Sept., 7, 1975

৫৫. A. Krebs, "Mujib led long fight to free Bengalis", *The New York Times*, August 16, 1975

বাংলাদেশের রাজনীতি ও শেখ মুজিবের জীবনপঞ্জী

মুহাম্মদ জহিরুল আলম/শরীফ মামুনুর রহমান হামীদ

১৯২০, ১৭ মার্চ : রাত ৮টায় জন্ম। তৎকালীন ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার (বর্তমানে জেলা) টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। পিতা শেখ লুৎফর রহমান ও জননী মোছাম্মৎ সায়েরা বেগমের চার কন্যা ও দুই পুত্রের মধ্যে তৃতীয় সন্তান। ডাকনাম খোকা। শৈশবকাল কাটে টুঙ্গিপাড়ায়।

১৯২৭ : ৭ বছর বয়সে গিমাডাঙ্গা প্রাইমারী স্কুলে শিক্ষা জীবনের সূচনা।

১৯২৯ : ৯ বছর বয়সে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি।

: পরবর্তী প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় মিশনারি স্কুলে।

১৯৩৪ : ১২ বছর বয়সে বেরিবেরি রোগে আক্রান্ত। শিক্ষাজীবনে সাময়িক বিরতি।

: কলকাতার হাসপাতালে চিকিৎসা ও একটি চোখে অস্ত্রোপচার।

১৯৩৭ : অসুস্থতায় ৪ বছর শিক্ষাজীবন ব্যাহত হবার পর পুনরায় স্কুলে ভর্তি।

১৯৩৮ : ১৮ বছর বয়সে মিথ্যা মামলায় প্রথম কারাবাস।

: একই বছর বেগম ফজিলাতুন নেসার সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ।

১৯৩৯ : অবিভক্ত বাংলার মূখ্যমন্ত্রি শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল পরিদর্শনে এলে ছাত্রদের সমস্যা সমাধানের দাবি নিয়ে সাক্ষাত।

১৯৪০ : গোপালগঞ্জ ওয়্যান্ডার্স ক্লাবে যোগদান।

: ৯ম শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালে দ্বিতীয়বার কারাবরণ।

: নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের সদস্য পদ গ্রহণ।

১৯৪১ : বেঙ্গল মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনের কাউন্সিলর নির্বাচিত। গোপালগঞ্জ মুসলিম ডিফেন্স কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোনীত।

১৯৪২	:	এন্ট্রেস (এস.এস.সি) পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
	:	কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে মানবিক বিভাগে ইন্টারমিডিয়েটে ভর্তি।
	:	কলকাতা ধর্মতলার বেকার হোস্টেলে অবস্থান।
	:	পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ।
১৯৪৩	:	বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর মনোনীত।
১৯৪৪	:	আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
	:	নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্মেলনে (কুষ্টিয়া) যোগদান।
	:	কলকাতাস্থ ফরিদপুরবাসীদের সংগঠন 'ফরিদপুর ডিস্ট্রিক এসোসিয়েশন'-এর সম্পাদক নির্বাচিত।
১৯৪৫		নেতাজী সুভাষ বসু পরিচালিত 'হলওয়েল মনুমেন্ট' আন্দোলনে অংশগ্রহণ।
১৯৪৬	:	ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত।
	:	মুসলিম লীগে যোগদান।
১৯৪৭	:	কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস অনার্সসহ ব্যাচেলর (বিএ) ডিগ্রি লাভ।
	:	কলকাতা দাঙ্গা প্রতিরোধে তৎপরতা।
	:	উপমহাদেশের বিভক্তির প্রেক্ষিতে ঢাকা আগমন।
১৯৪৮	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি।
৪ জানু	:	মুসলিম ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব দান।
২৩ ফেব্রু	:	আইন পরিষদের উর্দুর পক্ষে খাজা নাজিমউদ্দিনের বক্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ ও আন্দোলনের প্রস্তুতি গ্রহণ।
২ মার্চ	:	ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফজলুল হক মুসলিম হলে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব পেশ।
১১ মার্চ	:	ভাষার দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বিক্ষোভরত অবস্থায় অসংখ্য কর্মীসহ গ্রেফতার বরণ।
১৫ মার্চ	:	ছাত্র সমাজের আন্দোলনের মুখে মুক্তি লাভ
১৬ মার্চ	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বটতলায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্র ভাষা সংগ্রাম পরিষদ'-এর সমাবেশে সভাপতিত্ব।
১৭ মার্চ	:	সমাবেশে পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালনের আহ্বান।
১৯ মে	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব।
১১ সেপ্টে	:	মাওলানা ভাসানী ও ছাত্র নেতা শামসুল হকের সঙ্গে গ্রেফতার বরণ।
১৯৪৯, ২১ জানু	:	কারাগার থেকে মুক্তি লাভ।
	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান।
	:	আন্দোলন-সংগ্রামের অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জরিমানা।
	:	কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অগ্রাহ্য এবং চিরদিনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত।

২৯ এপ্রিল : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পুনরায় গ্রেফতার।

২৩ জুন : পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠিত হলে কারাগারে থেকে যুগ্ম সম্পাদক নিযুক্ত।

: জুন মাসের শেষ দিকে মুক্তি লাভ।

: খাদ্য সংকটের বিরুদ্ধে আন্দোলনে যোগদান।

: সেপ্টেম্বরে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের দায়ে গ্রেফতার ও পরে মুক্তি লাভ।

: অক্টোবরে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় মূখ্যমন্ত্রি নূরুল আমিনের পদত্যাগ দাবি।

: অক্টোবর মাসের শেষে লিয়াকাত আলী খানের নিকট একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে যাবার পথে মাওলানা ভাসানীসহ পুনরায় গ্রেফতার।

১৯৫০, ১ জানু : পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রি লিয়াকত আলী খানের ঢাকা আগমন উপলক্ষে আওয়ামী লীগের ভূখা মিছিলে নেতৃত্ব প্রদানের অভিযোগে গ্রেফতার, ২ বছরের জেল।

১৯৫২, ২৬ জানু : উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য খাজা নাজিমউদ্দিনের ঘোষণার প্রতিবাদে কারাগারে আটক অবস্থায় আন্দোলনের ডাক।

১৪ ফেব্রু : রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ১৭ দিনব্যাপী অনশন শুরু। জেল থেকে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে ফরিদপুর কারাগারে প্রেরণ।

২৬ ফেব্রু : ফরিদপুর কারাগার থেকে মুক্তি লাভ।

১৯৫৩, ৯ জুলাই : পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগের কাউন্সিলে দলের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত।

: মুসলিম লীগ বিরোধী ঐক্যের উদ্যোগ গ্রহণ।

১৪ নভেম্বর : হক-ভাসানী-সোহরাওয়ার্দীকে নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সিদ্ধান্ত।

: যুক্তফ্রন্টের সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মনোনয়ন লাভ।

১৯৫৪, ১০ মার্চ : প্রথম সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয়। ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৩টি যুক্তফ্রন্ট এবং এককভাবে আওয়ামী লীগের ১৪৩টি আসন লাভ।

: নির্বাচনে গোপালগঞ্জ আসনে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা ওয়াহিদুজ্জামানকে পরাজিত করে আইনসভার সদস্য নির্বাচিত।

১৫ মে : প্রাদেশিক সরকারের কৃষি ও বনমন্ত্রির (শিল্পমন্ত্রি) দায়িত্ব লাভ।

৩০ মে : কেন্দ্রীয় সরকার ২৯ মে যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল করলে করাচী থেকে ঢাকায় ফিরে পুনরায় গ্রেফতার।

২৩ ডিসে : কারাগার থেকে মুক্তি লাভ।

১৯৫৫, ৫ জুন : জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচিত।

১৭ জুন : ঢাকার পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের জনসভায় প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে ২১ দফা কর্মসূচি ঘোষণা।

২৩ জুন পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা না হলে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যদের আইন সভা থেকে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত।

: গণ-পরিষদের আগস্ট অধিবেশনে প্রদেশের নাম "বাংলা" করার দাবি।

২১ অক্টো		আওয়ামী মুসলিম লীগের কাউন্সিলে 'মুসলিম' শব্দ প্রত্যাহার করে আওয়ামী লীগ গঠন।
	:	পুনরায় দলের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত।
১৯৫৬, ৩ ফেব্রু	:	আওয়ামী লীগ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে মুখ্যমন্ত্রির সঙ্গে সাক্ষাত।
১৪ জুলাই	:	আওয়ামী লীগের সভায় প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর প্রতিনিধিত্বের বিরোধিতা করে প্রস্তাব ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৪ সেপ্টে	:	১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে খাদ্যের দাবিতে ভূখা মিছিলে নেতৃত্ব।
৪ সেপ্টে	:	আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড বিষয়ক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ।
	:	পাকিস্তানী ইসলামী প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে স্বাক্ষর না দেয়া।
১৯৫৭, ৩০ মে	:	দলীয় সিদ্ধান্ত অনুসারে সংগঠনকে শক্তিশালী করার উদ্দেশ্য মন্ত্রিত্ব ত্যাগ।
৭ আগস্ট	:	সরকারি সফরে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গণচীনে গমন।
১৯৫৮, ১৮ জুন	:	আওয়ামী লীগ সরকারের পতন।
২৩ জুন	:	পুনরায় ক্ষমতায় গমন।
৭ অক্টো	:	সামরিক শাসন জারি ও রাজনীতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ।
১২ অক্টো	:	নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার। আটকাবস্থায় ৬টি মামলার আসামী।
১৯৫৯, ডিসে	:	প্রায় ১৪ মাস কারাভোগের পর মুক্তি লাভ এবং জেল গেট থেকে পুনরায় গ্রেফতার।
১৯৬১, ৭ ডিসে	:	হাইকোর্টের রীট আবেদনে মুক্তি লাভ
	:	সামরিক শাসন বিরোধী তৎপরতা।
১৯৬২, ২৪ জানু	:	আতাউর রহমান খানের বাসায় দলীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়ার সঙ্গে গোপন রাজনৈতিক বৈঠক।
৬ ফেব্রু	:	জন নিরাপত্তা আইনে শীর্ষ স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গ্রেফতার।
২ জুন	:	৪ বছরব্যাপী সামরিক শাসনের অবসান।
১৮ জুন	:	কারাগার থেকে মুক্তি লাভ।
২৫ জুন	:	৮ জন শীর্ষ স্থানীয় নেতার সঙ্গে আয়ুব খানের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুক্ত বিবৃতি প্রদান।
৫ জুলাই	:	ঢাকার পল্টনের বিশাল জনসভায় আয়ুব শাহীর কঠোর সমালোচনা।
২৪ সেপ্টে	:	লাহোর গমন। বিরোধী দলীয় মোর্চা জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টে যোগদান। শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে নতুন আন্দোলনের সূচনা।
অক্টো	:	সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে বাংলাব্যাপী ফ্রন্টের জনসংযোগ।
১৯৬৩, ৫ ডিসে	:	বৈরুতের হোটেলে সোহরাওয়ার্দীর রহস্যজনক মৃত্যু।
	:	আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব গ্রহণ।
১৯৬৪, ১৬ জানু	:	সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধকল্পে 'পূর্ব-পাকিস্তান রুখিয়া দাঁড়াও' শীর্ষক ইস্তেহার প্রচার।

২৫ জানু : আওয়ামী লীগ পুনর্গঠনের উদ্যোগ হিসেবে নতুন সাংগঠনিক কাঠামো গঠন। মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশকে সভাপতি করে দলের সাধারণ সম্পাদক পদ গ্রহণ।

১১ মার্চ : দাঙ্গা বিরোধী 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ' গঠন।

১৯৬৫, ২ জানু : রাষ্ট্রপতি নির্বাচন।

: সম্মিলিত বিরোধী দলীয় প্রার্থী মিস ফাতেমা জিন্নাহর পক্ষে ব্যাপক প্রচার কার্যসম্পন্ন।

: রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে মামলা, গ্রেফতার, এক বছর কারাদণ্ড প্রদান, হাইকোর্টের নির্দেশে মুক্তি লাভ।

১৯৬৬, জানু : সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা দায়ের।

৫ ফেব্রু : লাহোরে সম্মিলিত বিরোধী দলসমূহের জাতীয় সম্মেলনে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ।

২১ ফেবু : আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক ৬ দফা কর্মসূচি অনুমোদন।

১ মার্চ : আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত।

: ৬ দফার পক্ষে জনমত গঠনের জন্য দেশব্যাপী জনসংযোগ।

: বছরের প্রথম তিন মাসে ৮ বার গ্রেফতার ও মুক্তি লাভ।

৮ মে : নারায়ণগঞ্জ পাটকল শ্রমিকদের জনসভায় বক্তৃতা শেষে পুনরায় গ্রেফতার।

৭ জুন : মুক্তির দাবিতে সারাদেশে ধর্মঘট পালিত।

১৯ জুন : কুর্মিটোলা সেনানিবাসে আগরতলা মামলার শুনানী শুরু।

১৯৬৮, ৩ জানু : ৩৫ জনের বিরুদ্ধে কুখ্যাত 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা', প্রধান আসামী।

১৭ জানু : কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে পুনরায় জেল গেটেই আটক।

: ঢাকা সেনানিবাস কারাগারে প্রেরণ।

১৯ জুন : কঠোর নিরাপত্তার সামরিক আদালতে আগরতলা মামলার আসামীদের বিচার কার্য শুরু।

১৯৬৯, ৫ জানু : কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত। ১১ দফা দাবি উত্থাপন। আগরতলা মামলার আসামীদের মুক্তি দাবি। দেশব্যাপী আন্দোলন ও সংঘাতের সূচনা।

২৮ জানু : মামলা চলাকালে অভিযোগ অস্বীকার করে বিবৃতি প্রদান।

১ ফেব্রু : রাজনৈতিক দলের গোল টেবিল বৈঠক আহ্বান। প্যারোলে মুক্তিদানের সিদ্ধান্ত। মুক্তি লাভে অস্বীকৃতি।

২২ ফেব্রু : আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার। সকল আসামীসহ মুক্তি লাভ।

২৩ ফেব্রু : ঢাকার রেসকোর্সে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক সম্বর্ধনা ও 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি প্রদান।

২৬ ফেব্রু : রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ। ৬ দফা এবং ছাত্র সমাজের ১১ দফ[illegible] দাবির পক্ষে বক্তব্য প্রদান।

১৩ মার্চ : গোলটেবিল বৈঠক [illegible]াগ।

১৪ মার্চ : ঢাকায় প্রত্যাবর্তন। সংগ্রামের ডাক।

২৫ মার্চ	:	সামরিক শাসন জারি। ইয়াহিয়া খানের কর্তৃত্ব গ্রহণ।
২৫ অক্টো	:	৩ সপ্তাহের সাংগঠনিক সফরে লন্ডন গমন।
১৯৭০, ৬ জানু	:	পুনরায় আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত।
১ এপ্রিল	:	আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৭ জুন	:	নির্বাচনী প্রচারাভিযান শুরু। ঢাকা রেসকোর্সের জনসভায় ৬ দফা দাবি আদায়ের জন্য আওয়ামী লীগকে নির্বাচিত করার জন্য আহ্বান।
১৭ অক্টো	:	'নৌকা' নির্বাচনী প্রতীক গ্রহণ।
২৮ অক্টো	:	বেতার-টিভি ভাষণে ৬ দফার পক্ষে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী করার আহ্বান।
১ নভে	:	'পূর্ব বাংলা শ্মাশান কেন?' শীর্ষক পোস্টার প্রকাশ।
১৫ নভে	:	দেশের উপকূলে প্রলংকরী ঘূর্ণিঝড়ে ১০ লাখ মানুষের মৃত্যু হলে নির্বাচনী প্রচারাভিযান স্থগিত রেখে দুর্গতদের পাশে অবস্থান। পুনর্বাসনে শাসকদের অবহেলার নিন্দা, ত্রাণের জন্য বিশ্বের প্রতি আবেদন।
৭ ডিসে	:	সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ জয় লাভ তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের ১৬৯ আসনের মধ্যে ১৬৭ আসন এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০ আসনের মধ্যে ৩০৫ আসন লাভ।
১৯৭১, ৩ জানু	:	রেসকোর্সের জনসভায় জন প্রতিনিধিদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা।
৫ জানু	:	কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোয়ালিশন গঠনের পশ্চিম অংশের নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সম্মতি জ্ঞাপন।
১২ জানু	:	ঢাকায় ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বৈঠক।
১৩ জানু	:	বৈঠক সমাপ্ত।
২৭ জানু	:	আবার রাজনৈতিক সঙ্কট নিরসনে বৈঠক।
২৮ জানু	:	ঢাকায় ভুট্টোর আগমন, বৈঠকে যোগদান।
১৩ ফেব্রু	:	ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ৩ মার্চ ঢাকার জাতীয় পরিষদের বৈঠকের ঘোষণা।
১৫ ফেব্রু	:	আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যদের জনগণের দাবি আদায়ের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ প্রদান।
১৬ ফেব্রু		ঢাকায় জাতীয় পরিষদের বৈঠক না করার জন্য ভুট্টোর দাবির সমালোচনা করে বিবৃতি।
১ মার্চ	:	ইয়াহিয়া খান কর্তৃক অনির্দিষ্টকালের জন্য জাতীয় পরিষদের বৈঠক স্থগিত করে জাতির উদ্দেশে ভাষণ।
	:	দেশব্যাপী প্রতিবাদের ঝড়।
	:	আওয়ামী লীগ কার্যকরী পরিষদের জরুরি সভায় সভাপতিত্ব। ২ মার্চ দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান।
৩ মার্চ	:	সফল হরতাল শেষে পল্টন ময়দান থেকে অসহযোগ আন্দোলনের ঘোষণা। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি।
৭ মার্চ	:	ঢাকার রেসকোর্সের জনসমুদ্রে 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম' ঐতিহাসিক ভাষণ। দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন।

১৬ মার্চ	:	ক্ষমতা হস্তান্তর প্রশ্নে ঢাকায় ইয়াহিয়ার সঙ্গে বৈঠক।
	:	আলোচনার জন্য ভুট্টোর ঢাকা আগমন।
২৪ মার্চ	:	ইয়াহিয়া–ভুট্টো–মুজিব আলোচনা।
২৫ মার্চ	:	আলোচনা ব্যর্থ।
	:	মধ্য রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের সূচনা।
	:	রাত ১:১০ মিনিটে ধানমণ্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করে ঢাকা সেনানিবাসে প্রেরণ।
২৬ মার্চ	:	বন্দি অবস্থায় পাকিস্তানের কারাগারে স্থানান্তর।
	:	স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা।
১০ এপ্রিল	:	প্রবাসে গঠিত বিপ্লবী সরকারের রাষ্ট্রপতি পদে অনুপস্থিতে অভিষিক্ত।
১৭ এপ্রিল	:	মুজিবনগরে প্রবাসী সরকারের শপথ গ্রহণ। রাষ্ট্রপতির পক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের তৎপরতা।
১১ আগস্ট	:	পাকিস্তানে বিশেষ সামরিক আদালতে বিচার শুরু।
৭ সেপ্টে	:	লায়ালপুর সামরিক কারাগারে মৃত্যুদণ্ড প্রদান।
১৬ ডিসে	:	বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন।
২৭ ডিসে	:	মুক্তি ও বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেবার জন্য বিশ্ব নেতৃবৃন্দ ও শান্তিকামী মানুষের দাবি।
১৯৭২, ৮ জানু	:	কারাগার থেকে মুক্তি লাভ।
	:	ভুট্টোর সাক্ষাত।
	:	ঢাকার উদ্দেশে লন্ডন যাত্রা। বিমান বন্দরে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রি এডওয়ার্ড হীথের সাক্ষাত।
	:	দিল্লিতে যাত্রা বিরতি। প্যারেড গ্রাউন্ডে অবিস্মরণীয় সম্বর্ধনা। ভারতের রাষ্ট্রপতি ভিপি গিরি ও প্রধানমন্ত্রি মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাত।
১০ জানু	:	দুপুর ১:৪০ মিনিটে স্বাধীন বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন।
	:	বিমান বন্দর থেকে সরাসরি রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় অশ্রুসিক্ত নয়নে ভাষণ।
	:	জাতির পক্ষ থেকে প্রাণঢালা অভিনন্দন জ্ঞাপন।
১১ জানু	:	প্রধানমন্ত্রির দায়িত্ব গ্রহণ।
৬ ফেব্রু	:	সরকারি সফরে ভারত গমন।
	:	২৪ বছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার। ডাকসু'র আজীবন সদস্যপদ প্রদান।
১ মার্চ	:	সরকারি সফরে সোভিয়েত ইউনিয়ন গমন।
১২ মার্চ	:	ভারতীয় সৈন্যদের বাংলাদেশ ত্যাগের ব্যবস্থা গ্রহণ।
১৯ মার্চ	:	২৫ বছর মেয়াদি ভারত–বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর।
২৬ মার্চ	:	সকল ভারী শিল্প–ব্যাংক–বীমা জাতীয়করণ।
১ মে	:	তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর সরকারি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি।
৩০ জুলাই	:	লন্ডনে পিত্তকোষে অস্ত্রোপচার।
	:	লন্ডন থেকে জেনেভা গমন।

১০ অক্টোবর	:	বিশ্ব শান্তি পরিষদ কর্তৃক 'জুলিও কুরী' পুরস্কারে ভূষিত।
৪ নভে	:	বাংলাদেশের প্রথম সংবিধান প্রণয়ন।
	:	৭ মার্চ প্রথম সাধারণ নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা।
১৪ ডিসে	:	গণপরিষদে সংবিধান গৃহীত।
১৫ ডিসে	:	মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় খেতাব ঘোষণা।
১৯৭৩, ৭ মার্চ	:	প্রথম সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের ৩০০ আসনের মধ্যে ২৯৩ আসন লাভ।
৩ সেপ্টে	:	আওয়ামী লীগ, সিপিবি, ন্যাপে'র সমন্বয়ে গঠিত ঐক্যফ্রন্টের নেতৃত্ব গ্রহণ।
৬ সেপ্টে	:	জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য আলজিরিয়া গমন।
১৭ অক্টো	:	সরকারি সফরে জাপান গমন।
১৯৭৪, ১৯ ফেব্রু	:	ঢাকা পৌরসভাকে কর্পোরেশন ঘোষণা।
২২ ফেব্রু	:	বাংলাদেশকে পাকিস্তানের স্বীকৃতি।
২৩ ফেব্রু	:	পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদান।
১৮ সেপ্টে	:	সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ।
২৫ সেপ্টে	:	জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষায় ভাষণ প্রদান।
	:	ভারতের সঙ্গে পানি বন্টন ও সীমান্ত চুক্তি স্বাক্ষর।
১৯৭৫, ৩ জানু	:	জরুরি ক্ষমতা ঘোষণা।
২৫ জানু	:	রাষ্ট্রপতি পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন।
	:	রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার গ্রহণ।
	:	বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে দেশে একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন। চতুর্থ সংশোধনী পাশ।
২৫ ফেব্রু	:	বাকশাল-এ যোগদানের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান।
	:	৬৪টি জেলা ঘোষণা। গভর্নর মনোনয়ন।
১৫ আগস্ট	:	সামরিক অভ্যুত্থানে সপরিবারে নিহত।

পরিশিষ্ট : ১

যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা

নীতি : কোরান ও সুন্নার মৌলিক নীতির পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করা হইবে না এবং ইসলামের সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিতে নাগরিকগণের জীবন-ধারণের ব্যবস্থা করা হইবে।

১. বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হইবে।

২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করিয়া ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে উদ্বৃত্ত জমি বিতরণ করা হইবে এবং উচ্চ হারের খাজনা ন্যায়সঙ্গতভাবে হ্রাস করা হইবে এবং সার্টিফিকেটযোগ্য খাজনা আদায়ের প্রথা রহিত করা হইবে।

৩. পাট ব্যবসাকে জাতীয়করণ করার উদ্দেশ্যে তাকে পূর্ববঙ্গ সরকারের প্রত্যক্ষ পরিচালনাধীনে আনয়ন করিয়া পাটচাষীদের পাটের মূল্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে এবং লীগ মন্ত্রিসভার আমলের পাট কেলেংকারি তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট সকলের শাস্তির ব্যবস্থা ও তাহাদের অসুদপায়ে অর্জিত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৪. কৃষি উন্নতির জন্য সমবায় কৃষি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হইবে ও সরকারি সাহায্যে সকল প্রকার কুটির ও হস্তশিল্পের উন্নতি সাধন করা হইবে।

৫. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার জন্য সমুদ্র উপকূলে কুটির শিল্পের ও বৃহৎ শিল্পের লবণ তৈয়ারীর কারখানা স্থাপন করা হইবে এবং মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার আমলের লবণের কেলেংকারি সম্পর্কে তদন্ত করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হইবে ও তাহাদের অসুদপায়ে অর্জিত যাবতীয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

৬. শিল্প ও কারিগর শ্রেণীর গরীব মোহাজেরদের কাজের আশু ব্যবস্থা করিয়া তাহাদের পুনর্বসতির ব্যবস্থা করা হইবে।

৭. খাল খনন ও সেচের ব্যবস্থা করিয়া দেশকে বন্যা এবং দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করা হইবে।

৮. পূর্ববঙ্গকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পায়িত করিয়া ও কৃষিকে আধুনিক যুগোপযোগী করিয়া শিল্প ও খাদ্যে দেশকে স্বাবলম্বী করা হইবে এবং আন্তর্জাতিক শ্রমসংঘের মূলনীতি অনুসারে শ্রমিকদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং সকল প্রকার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হইবে।

৯. দেশের সর্বত্র একযোগে প্রাথমিক ও অবৈতনিক বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন করা হইবে এবং শিক্ষকদের ন্যায়সঙ্গত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার করিয়া শিক্ষাকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে কার্যকর করিয়া কেবলমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হইবে এবং সরকারি ও বেসরকারি

বিদ্যালয়সমূহের বর্তমান ভেদাভেদ উঠাইয়া দিয়া একই পর্যায়ভুক্ত করিয়া সকল বিদ্যালয়সমূহকে সরকারি সাহায্যপুষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে এবং শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা করা হইবে।

১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতি প্রতিক্রিয়াশীল কানুন বাতিল ও রহিত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিয়া উচ্চ শিক্ষাকে সস্তা ও সহজলভ্য করা হইবে এবং অল্পব্যয়সাধ্য ও সুবিধাজনক ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত করা হইবে।

১২. শাসন ব্যয় সর্বাত্মকভাবে হ্রাস করা হইবে এবং তদুদ্দেশ্যে উচ্চ বেতনভোগীদের বেতন কমাইয়া ও নিম্ন বেতনভোগীদের বেতন বাড়াইয়া তাহাদের আয়ের একটি সুসঙ্গত সামঞ্জস্য বিধান করা হইবে। যুক্তফ্রন্টের কোন মন্ত্রি এক হাজারের বেশি বেতন গ্রহণ করিবেন না।

১৩. দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি, ঘুষ-রিশওয়াত বন্ধ করার কার্যকর ব্যবস্থা করা হইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সমস্ত সরকারি ও বেসরকারি পদাধিকারী ব্যবসায়ীর ১৯৪০ সাল হইতে বর্তমান সময় পর্যন্ত সময়ের আয়-ব্যয়ের হিসাব-নিকাশ লওয়া হইবে এবং সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে না পারিলে তাহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে।

১৪. জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স প্রভৃতি কালা-কানুন রদ ও রহিত করতঃ বিনাবিচারে আটক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইবে ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার করা হইবে এবং সংবাদপত্র ও সভা-সমিতি করিবার অধিকার অবাধ ও নিরঙ্কুশ করা হইবে।

১৫. বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ হইতে পৃথক করা হইবে।

১৬. যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রি বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম বিলাসের বাড়িতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিবেন এবং বর্ধমান হাউসকে আপাততঃ ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা হইবে।

১৭. বাংলা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে যাহারা মুসলিম লীগ মন্ত্রিসভার গুলিতে শহীদ হইয়াছেন, তাহাদের পবিত্র স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ঘটনাস্থলে একটি শহীদ মিনার নির্মাণ করা হইবে এবং তাহাদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

১৮. ২১শে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস ঘোষণা করিয়া উহাকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণা করা হইবে।

১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান ও সার্বভৌম করা হইবে এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত আর সমস্ত বিষয় (অবশিষ্টাত্মক ক্ষমতাসমূহ) পূর্ববঙ্গ সরকারের হাতে আনয়ন করা হইবে এবং দেশরক্ষা বিভাগের স্থল বাহিনীর হেডকোয়ার্টার পশ্চিম পাকিস্তানে ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার পূর্ব-পাকিস্তানে স্থাপন করা হইবে এবং পূর্ব-পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণের কারখানা নির্মাণকরতঃ পূর্ব-পাকিস্তানকে আত্মরক্ষায় স্বয়ংসম্পূর্ণ করা হইবে। আনসার বাহিনীকে সশস্ত্রবাহিনীতে পরিণত করা হইবে।

২০. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কোন অজুহাতেই আইন পরিষদের আয়ু বাড়াইবে না। আইন পরিষদের আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বেই মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিয়া নির্বাচন কমিশনে মারফত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করিবেন।

২১. যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার আমলে যখন যে আসন শূন্য হইবে, তিন মাসের মধ্যে তাহা পূরণের জন্য উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা হইবে এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী পরাজিত হইলে মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করিবেন।

৪ ডিসেম্বর, ১৯৫৩

পরিশিষ্ট : ২

৬ দফা কর্মসূচি

আমি পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর বাঁচার দাবিরূপে ৬ দফা কর্মসূচি দেশবাসী ও ক্ষমতাসীন দলের বিবেচনার জন্য পেশ করিয়াছি। শান্তভাবে উহার সমালোচনা করার পরিবর্তে কায়েমী স্বার্থীদের দালালরা আমার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করিয়াছেন। জনগণের দুশমনদের এই চেহারা ও গালাগালির সহিত দেশবাসী সুপরিচিত। অতীতে পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায় দাবি যখনই উঠিয়াছে, তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈ-হৈ করিয়া উঠিয়াছেন। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব-পাক জনগণের মুক্তি-সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত-নির্বাচন-প্রথার দাবি, ছাত্র-তরুণদের সহজ ও স্বল্পব্যয়ে শিক্ষা-লাভের দাবি, বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যমে করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাহাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন।

আমারত প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতেও ইহারা তেমনিভাবে পাকিস্তান দুই টুকরা করিবার দুরভিসন্ধি আরোপ করিতেছেন। আমার প্রস্তাবিত ৬ দফা দাবিতে যে পূর্ব-পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি শোষিত বঞ্চিত আদম সন্তানের অন্তরের কথাই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে তাহাতে আমার কোন সন্দেহ নাই। খবরের কাগজের লেখায়, সংবাদে ও সভা-সমিতির বিবরণে, সকল শ্রেণীর সুধীজনের ভিত্তিতে আমি গোটা দেশবাসীর উৎসাহ-উদ্দীপনার সাড়া দেখিতেছি। ইহাতে আমার প্রাণে সাহস ও বুকে বল আসিয়াছে। সর্বোপরি পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ আমার ৬ দফা দাবি অনুমোদন করিয়াছে। ফলে ৬ দফা দাবি আজ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের জাতীয় দাবিতে পরিণত হইয়াছে। এ অবস্থায় কায়েমী স্বার্থী শোষকদের প্রচারণায় জনগণ বিভ্রান্ত হইবে না, বিশ্বাস আমার আছে।

কিন্তু ইহাও আমি জানি, জনগণের দুশমনদের ক্ষমতা অসীম, বিত্ত প্রচুর, হাতিয়ার অফুরন্ত, মুখ দশটা, গলার সুর শতাধিক।

তাহারা বহুরূপী। ঈমান, ঐক্য ও সংহতির নামে তাহরা আছেন সরকারি দলে। আবার ইসলাম ও গণতন্ত্রের দোহাই দিয়া তাহারা আছেন অপজিশন দলে। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের দুশমনির বেলায় তাহারা সকলে একজোট। তাহারা নানা ছলা-কলায় জনগণকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিবেন, সেই চেষ্টা শুরুও হইয়া গিয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানবাসীর নিঃস্বার্থ সেবার জন্য ইহারা ইতিমধ্যেই বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের হাজার চেষ্টাতেও আমার অধিকার সচেতন দেশবাসী বিভ্রান্ত হইবেন না তাহাতেও আমার কোন সন্দেহ নাই। তথাপি ৬ দফা দাবির তাৎপর্য ও উহার অপরিহার্যতা জনগণের মধ্যে প্রচার করা সমস্ত গণতন্ত্রী বিশেষ আওয়ামী লীগ কর্মীদের

অবশ্য কর্তব্য। আশা করি, তাঁহারা সকলে অবিলম্বে ৬ দফা ব্যাখ্যায় দেশময় ছড়াইয়া পড়িবেন। কর্মী ভাইদের সুবিধার জন্য ও দেশবাসী জনসাধারণের কাছে সহজবোধ্য করার উদ্দেশ্যে আমি ৬ দফার প্রতিটি দফার দফাওয়ারী সহজ সরল ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা ও যুক্তিসহ এই পুস্তিকা প্রচার করিলাম। আওয়ামী লীগের তরফ হইতেও এ বিষয়ে আরও পুস্তিকা ও প্রচার-পত্র প্রকাশ হইবে। আশা করি সাধারণভাবে সকল গণতন্ত্রী বিশেষভাবে আওয়ামী লীগের কর্মীগণ ছাড়াও শিক্ষিত পূর্ব-পাকিস্তানী মাত্রেই এইসব পুস্তিকার সদ্ব্যবহার করিবেন।

১নং দফা

এই দফায় বলা হইয়াছে যে, ঐতিহাসিক লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনাকরতঃ পাকিস্তানকে একটি সত্যিকার ফেডারেশনরূপে গড়িতে হইবে। তাহাতে পার্লামেন্টারী পদ্ধতির সরকার থাকিবে। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। আইনসভাসমূহের সার্বভৌমত্ব থাকিবে।

ইহাতে আপত্তির কি আছে? লাহোর-প্রস্তাব পাকিস্তানের জনগণের নিকট কায়েদে আজমসহ সকল নেতার দেওয়া নির্বাচনী ওয়াদা। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচন এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে হইয়াছিল। মুসলিম বাংলার জনগণ একবাক্যে পাকিস্তানের বাক্সে ভোট দিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দরুনই। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ববাংলার মুসলিম আসনে শতকরা সাড়ে ৯৭টি যে একুশ দফার পক্ষে আসিয়াছিল, লাহোর-প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনার দাবি ছিল তাহার অন্যতম প্রধান দাবি। মুসলিম লীগ তখন কেন্দ্রের ও প্রদেশের সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। সরকারি সমস্ত শক্তি ও ক্ষমতা লইয়া তাঁহারা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন ও পাকিস্তান ধ্বংস হইবে, এসব যুক্তি তখনও দেওয়া হইয়াছিল। তথাপি পূর্ববাংলার ভোটাররা এই প্রস্তাবসহ একুশ দফার পক্ষে ভোট দিয়াছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের পক্ষের কথা বলিতে গেলে এই প্রশ্ন চূড়ান্তভাবে গণতান্ত্রিক উপায়ে মীমাংসিত হইয়াই গিয়াছে। কাজেই আজ লাহোর-প্রস্তাবভিত্তিক শাসনতন্ত্র রচনার দাবি করিয়া আমি কোনও নতুন দাবি তুলি নাই; পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পুরোনো দাবিরই পুনরুল্লেখ করিয়াছি মাত্র। তথাপি লাহেরা-প্রস্তাবের নাম শুনিলেই যাঁহারা আঁতকিয়া ওঠেন, তাঁহারা হয় পাকিস্তান সংগ্রামে শরিক ছিলেন না, অথবা পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণের দাবি-দাওয়ার বিরোধিতা ও কায়েমী স্বার্থীদের দালালি করিয়া পাকিস্তানের অনিষ্ট সাধন করিতে চান। এই দফায় পার্লমেন্টারী পদ্ধতির সরকার, সার্বজনীন ভোটে সরাসরি নির্বাচন ও আইনসভার সার্বভৌমত্বের যে দাবি করা হইয়াছে তাতে আপত্তির কারণ কি? আমার প্রস্তাবই ভাল, না প্রেসিডেনশিয়াল পদ্ধতির সরকার ও পরোক্ষ নির্বাচন এবং ক্ষমতাহীন আইনসভাই ভাল এ বিচার ভার জনগণের উপর ছাড়িয়া দেওয়াই কি উচিত নয়? তবে পাকিস্তানের ঐক্য-সংহতির এই তরফদারেরা এইসব প্রশ্নে রেফারেণ্ডামের মাধ্যমে জনমত যাচাইয়ের প্রস্তাব না দিয়া আমার বিরুদ্ধে গালাগালি বর্ষণ করিতেছেন কেন? তাঁহারা যদি নিজেদের মতে এই আস্থাবান, তবে আসুন এই প্রশ্নের উপরই গণভোট হইয়া যাক।

২নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, ফেডারেশন সরকারের এখতিয়ারে কেবলমাত্র দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্রীয় ব্যাপার এই দুইটি বিষয় থাকিবে। অবশিষ্ট বিষয় স্টেটসমূহের (বর্তমান ব্যবস্থায় যাকে প্রদেশ বলা হয়) হাতে থাকিবে।

এই প্রস্তাবের দরুনই কায়েমী স্বার্থের দালালরা আমার উপর সর্বাপেক্ষা বেশী চটিয়াছেন। আমি নাকি পাকিস্তানকে দুই টুকরাকরতঃ ধ্বংস করিবার প্রস্তাব দিয়াছি। সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি ইহাদের

এতই অন্ধ করিয়া ফেলিয়াছে যে, ইহারা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলি পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে, বৃটিশ সরকারের ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালের যে 'প্ল্যান' দিয়াছিলেন এবং যে– 'প্ল্যান' কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও যোগাযোগ ব্যবস্থা এই তিনটি মাত্র বিষয় ছিল এবং বাকী সব বিষয়ই প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। ইহা হইতে এটা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বৃটিশ সরকার, কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ সকলের মত এই যে, তিনটি মাত্র বিষয় কেন্দ্রের হাতে থাকিলেই কেন্দ্রীয় সরকার চলিতে পারে। অন্য কারণে কংগ্রেস চুক্তি–ভঙ্গ করায় ক্যাবিনেট প্ল্যান থাকিত। আমি আমার প্রস্তাবে ক্যাবিনেট প্ল্যানেরই অনুসরণ করিয়াছি। যোগাযোগ ব্যবস্থা আমি বাদ দিয়াছি সত্য কিন্তু তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। অখণ্ড ভারতের বেলায় যোগাযোগ ব্যবস্থারও অখণ্ডতা ছিল। ফেডারেশন গঠনের রাষ্ট্র–বৈজ্ঞানিক মূলনীতি এই যে, যে যে বিষয়ে ফেডারেটিং স্টেটসমূহের স্বার্থ এক ও অবিভাজ্য, কেবল সেই বিষয়ই ফেডারেশনের এখতিয়ার দেওয়া হয়। এই মূলনীতি–অনুসারে অখণ্ড ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা এক অবিভাজ্য ছিল। পেশওয়ার হইতে চাটগাঁ পর্যন্ত একই রেল চলিতে পারিত। কিন্তু পাকিস্তানে তা নয়। দুই অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা এক ও অবিভাজ্য তো নয়ই, বরঞ্চ সম্পূর্ণ পৃথক। রেলওয়েকে প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্রান্সফার করিয়া বর্তমান সরকারও তাই স্বীকার করিয়াছেন। টেলিফোন–টেলিগ্রাম পোস্টাফিসের ব্যাপারেও এ সত্য স্বীকার করিতেই হইবে।

তবে বলা যাইতে পারে যে, একুশ দফায় যখন কেন্দ্রকে তিনটি বিষয় দিবার সুপারিশ ছিল, তখন আমি আমার বর্তমান প্রস্তাবে মাত্র দুইটি বিষয় দিলাম কেন? এ প্রশ্নের জবাব আমি ৩নং দফার ব্যাখ্যায় দিয়াছি। এখানে আর পুনরুক্তি করিলাম না।

আরেকটা ব্যাপারে ভুল ধারণা সৃষ্টি হইতে পারে। আমার প্রস্তাবে ফেডারেটিং ইউনিটকে 'প্রদেশ' না বলিয়া 'স্টেট' বলিয়াছি। ইহাতে কায়েমী স্বার্থী শোষকরা জনগণকে এই বলিযা ধোঁকা দিতে পারে এবং দিতেও শুরু করিয়াছে যে, 'স্টেট' অর্থে আমি ইন্ডিপেন্ডেট স্টেট বা স্বাধীন রাষ্ট্র বুঝাইয়াছি। কিন্তু তাহা সত্য নয়। ফেডারেটিং ইউনিটকে দুনিয়ার সর্বত্র সব বড় বড় ফেডারেশনেই 'প্রদেশ' বা 'প্রভিন্স' না বলিয়া 'স্টেটস' বলা হইয়া থাকে। কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রকে ফেডারেশন অথবা ইউনিয়ন বলা হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফেডারেল জার্মানী, এমনকি আমাদের প্রতিবেশী ভারত রাষ্ট্র সকলেই তাহাদের প্রদেশসমূহকে 'স্টেট' ও কেন্দ্রকে ইউনিয়ন বা ফেডারেশন বলিয়া থাকে। আমাদের পার্শ্ববর্তী আসাম ও পশ্চিম বাংলা 'প্রদেশ নয় 'স্টেট'। এরা যদি ভারত ইউনিয়নের প্রদেশ হইয়া 'স্টেট' হওয়ার সম্মান পাইতে পারে তবে পূর্ব-পাকিস্তানকে এইটুকু নামের মর্যাদা দিতেইবা কর্তারা এত এলার্জিক কেন?

৩নং দফা

এই দফায় আমি মুদ্রা–সম্পর্কে দুইটি বিকল্প বা অল্টারনেটিভ প্রস্তাব দিয়াছি। এই দুটি প্রস্তাবের যে কোনও একটি গ্রহণ করিলেই চলিবে :

(ক) পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রার প্রচলন করিতে হইবে। এই ব্যবস্থা–অনুসারে কারেন্সী কেন্দ্রর হাতে থাকিবে না, আঞ্চলিক সরকারের হাতে থাকিবে। দুই অঞ্চলের জন্য দুইটি স্বতন্ত্র স্টেট ব্যাংক থাকিবে।

(খ) দুই অঞ্চলের জন্য একই কারেন্সী থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এ অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে যাহাতে পূর্ব-পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানের একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে, দুই অঞ্চলে দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে।

এই দুইটি বিকল্প প্রস্তাব হইতে দেখা যায় যে, মুদ্রাকে সরাসরি কেন্দ্রের হাত হইতে প্রদেশের হাতে আনিবার প্রস্তাব আমি করি নাই। যদি আমার দ্বিতীয় অল্টারনেটিভ গৃহীত হয়, তবে মুদ্রা কেন্দ্রের হাতেই থাকিয়া যাইবে। ঐ অবস্থায় আমি একুশ দফা প্রস্তাবের পরিপন্থী কোনও সুপারিশ করিয়াছি, এ কথা বলা চলে না।

যদি পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা আমার এই প্রস্তাবে রাজী না হন, তবে শুধু প্রথম বিকল্প অর্থাৎ কেন্দ্রের হাতে হইতে মুদ্রাকে প্রদেশের হাতে আনিতে হইবে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ভুল বুঝাবুঝির অবসান হইলে আমাদের এবং উভয় অঞ্চলের সুবিধার খাতিরে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই প্রস্তাবে রাজী হইবেন। আমরা তাহাদের খাতিরে সংখ্যাগরিষ্ঠতা ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য মানিয়া লইয়াছি, তাহারা কি আমাদের খাতিরে এইটুকু করিবেন না?

আর যদি অবস্থাগতিকে মুদ্রাকে প্রদেশের এলাকায় আনিতেও হয়, তবু তাহাতে কেন্দ্র দুর্বল হইবে না, পাকিস্তানের কোনও অনিষ্ট হইবে না। ক্যাবিনেট প্ল্যানে নিখিল ভারতীয় কেন্দ্রের যে প্রস্তাব ছিল, তাতে মুদ্রা কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল না। ঐ প্রস্তাব পেশ করিয়া বৃটিশ সরকার এবং ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ, সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, মুদ্রাকে কেন্দ্রীয় বিষয় না করিয়াও কেন্দ্র চলিতে পারে। কথাটা সত্য। রাষ্ট্রীয় অর্থ-বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থার স্বীকৃতি আছে। কেন্দ্রে বদলে প্রদেশের হাতে অর্থনীতি রাখা এবং একই দেশে পৃথক পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক থাকার নজির দুনিয়ার বড় বড় শক্তিশালী রাষ্ট্রেও আছে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি চলে ফেডারেল রিজার্ভ সিস্টেমের মাধ্যমে পৃথক পৃথক স্টেট ব্যাংকের দ্বারা। এতে যুক্তরাষ্ট্র ধ্বংস হয় নাই; তাদের আর্থিক বুনিয়াদও ভাঙিয়া পড়ে নাই। অত যে শক্তিশালী দোর্দণ্ড-প্রতাপ সোভিয়েত ইউনিয়ন, তাদেরও কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও অর্থমন্ত্রি বা অর্থ-দফতর নাই। শুধু প্রাদেশিক সরকারের অর্থাৎ স্টেট রিপাবলিকানসমূহেরেই অর্থমন্ত্রি ও অর্থ-দফতর আছে। কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্রয়োজন ঐসব প্রাদেশিক মন্ত্রি ও মন্ত্রি-দফতর দিয়াই মিটিয়া থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার মত দেশেও আঞ্চলিক সুবিধার খাতিরে দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র রিজার্ভ ব্যাংক বহুদিন আগে হইতেই চালু আছে।

আমার প্রস্তাবের মর্ম এই যে, উপরোক্ত দুই বিকল্পের দ্বিতীয়টি গৃহীত হইলে মুদ্রা কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে থাকিবে। সে অবস্থায় উভয় অঞ্চলের একই নকশার মুদ্রা বর্তমানে যেমন আছে তেমনি থাকিবে। পার্থক্য শুধু এই হইবে যে, পূর্ব-পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পূর্ব-পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পূর্ব-পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'ঢাকা' লেখা থাকিবে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের রিজার্ভ ব্যাংক হইতে ইস্যু হইবে এবং তাতে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বা সংক্ষেপে 'লাহোর' লেখা থাকিবে। পক্ষান্তরে, আমার প্রস্তাবের দ্বিতীয় বিকল্প না হইয়া যদি প্রথম বিকল্পও গৃহীত হয়, সে অবস্থাতেও উভয় অঞ্চলের মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য থাকিবে এবং পাকিস্তানের ঐক্যের প্রতি ও নিদর্শনস্বরূপ উভয় আঞ্চলিক সরকারের সহযোগিতায় একই নকমার মুদ্রা প্রচলন করা যাইবে।

একটু তলাইয়া চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে যে, এই দুই ব্যবস্থার একটি গ্রহণ করা ছাড়া পূর্ব-পাকিস্তানকে নিশ্চিত অর্থনৈতিক মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করার অন্য কোনও উপায় নাই। সারা পাকিস্তানের জন্য একই মুদ্রা হওয়ায় ও দুই অঞ্চলের মুদ্রার মধ্যে কোনও পৃথক চিহ্ন না থাকায় আঞ্চলিক কারেন্সী সার্কুলেশনে কোনও বিধি-নিষেধ ও নির্ভুল হিসাব নাই। মুদ্রা ও অর্থনীতি কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকায় অতিসহজেই পূর্ব-পাকিস্তানের আয় পশ্চিম পাকিস্তান

চলিয়া যাইতেছে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, শিল্প-বাণিজ্য, ব্যাংকিং, ইনসিওরেন্স ও বৈদেশিক মিশনসমূহের হেডঅফিস পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় প্রতি মিনিটে এই পাচারের কাজ অবিরাম গতিতে চলিতেছে। সকলেই জানেন সরকারি স্টেট ব্যাংক ও ন্যাশনাল ব্যাংকসহ সমস্ত ব্যাংকের হেডঅফিস পশ্চিম পাকিস্তানে। এই সেদিন মাত্র প্রতিষ্ঠিত ছোট দু-একখানি অনুষ্ঠিত সমস্ত আর্থিক লেনদেনে টাকা বালুচরে ঢাকা পানির মত একটানে তলদেশে হেডঅফিসে অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানে চলিয়া যাইতেছে, পূর্ব-পাকিস্তান শুকনা বালুচর হইয়া থাকিতেছে। বালুচরে পানির দরকার হইলে টিউবওয়েল খুদিয়া তলদেশ হইতে পানি তুলিতে হয়। অবশিষ্ট পানি তলদেশে জমা থাকে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রয়োজনীয় অর্থও তেমনি চেকের টিউবঅয়েলের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তান হইতে আনিতে হয়। উদ্বৃত্ত আর্থিক সেভিং তলদেশেই অর্থাৎ পশ্চিম পাকিস্তানেই জমা থাকে। এই কারণেই পূর্ব-পাকিস্তানে ক্যাপিটেল ফরমেশন হইতে পারে নাই। সব ক্যাপিটেল ফরমেশন পশ্চিমে হইয়াছে। বর্তমান ব্যবস্থা চলিতে থাকিলে কোনদিন পূর্ব পাকিস্তানে মূলধন গঠন হইবেও না। কারণ সেভিং মানেই ক্যাপিটেল ফরমেশন।

শুধু ফ্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বা মুদ্রা পাচারই নয়, মুদ্রাস্ফীতি-হেতু পূর্ব-পাকিস্তানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দুর্মূল্য, জনগণের বিশেষত পাটচাষীদের দুর্দশা, সমস্তের জন্য দায়ী এই মুদ্রা ব্যবস্থা ও অর্থনীতি। আমি ৫নং দফার ব্যাখ্যায় এ ব্যাপারে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, এই প্লাইট-অব-ক্যাপিটেল বন্ধ করিতে না পারিলে পূর্ব পাকিস্তানীরা নিজেরা শিল্প-বাণিজ্যে এক পা-ও অগ্রসর হইতে পারিবে না। কারণ এই অবস্থায় মূলধন গড়িয়া উঠিতে পারে না।

৪নং দফা

এই দফায় আমি প্রস্তাব করিয়াছি যে, সকল প্রকার ট্যাক্স-খাজনা কর ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের সে ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের অনাদায়ী রেভিনিউ-এর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে অটোমেটিক্যালি তা জমা হইয়া যাইবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রেই থাকিবে। এইভাবে জমাকৃত টাকাই ফেডারেল সরকারের তহবিল হইবে।

আমার এই প্রস্তাবেই কায়েমী স্বার্থের কালোবাজারী ও মুনাফাখোর শোষকরা সবচেয়ে বেশী চমকিয়া উঠিয়াছে। তাহারা বলিতেছে, ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের না থাকিলে সে সরকার চলিবে কিরূপে? কেন্দ্রীয় সরকার তাহাতে যে একেবারের খয়রাতি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইবে। খয়রাতের উপর নির্ভর করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশরক্ষা করিবে কেমনে? পররাষ্ট্রনীতিই বা চালাইবে কি দিয়া? প্রয়োজনের সময় চাঁদা না দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তো অনাহারে মারা যাইবে। অতএব এটা নিশ্চয়ই পাকিস্তান ধ্বংসেরই ষড়যন্ত্র। কায়েমী স্বার্থীরা এই ধরনের কত কথাই না বলিতেছেন। অথচ এর একটা আশঙ্কাও সত্য নয়। সত্র যে নয় সেটা বুঝবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি তাঁহাদের নিশ্চয়ই আছে। তবু যে তাঁহারা এসব কথা বলিতেছেন, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহাদের ব্যক্তিগত ও শ্রেণীগত স্বার্থ। সে স্বার্থ পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণকে অবাধে শোষণ ও লুণ্ঠন করার অধিকার। তাঁহারা জানেন যে, আমার এই প্রস্তাবে কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের দায়িত্ব দেওয়া না হইলেও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্বিঘ্নে চলার মত যথেষ্ট অর্থের ব্যবস্থা নিখুঁত করিবার শাসনতান্ত্রিক বিধান রচনার সুপারিশ করা হইয়াছে। এইটাই সরকারী তহবিলের সবচেয়ে অমোঘ, অব্যথ্য ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ উপায়। তাঁহারা ইহাও জানেন যে, কেন্দ্রকে ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা না দিয়াও ফেডারেশন চলার বিধান রাষ্ট্রবিজ্ঞানে স্বীকৃত। তাঁহারা এই খরবও রাখেন যে, ক্যাবিনেট মিশনের যে প্ল্যান বৃটিশ সরকার রচনা করিয়াছিলেন এবং কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ

উভয়েই গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতেও সমস্ত ট্যাক্স ধার্যের ক্ষমতা প্রদেশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল; কেন্দ্রকে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই। ৩নং দফার ব্যাখ্যায় আমি দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রি ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তাহার মধ্যে দেখাইয়াছি যে, অর্থমন্ত্রি ও অর্থদফতর ছাড়াও দুনিয়ার অনেক ফেডারেশন চলিতেছে। তাহার মধ্যে দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ফেডারেশন সোভিয়েত ইউনিয়নের কথাও আমি বলিয়াছি। তথায় কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রি বা অর্থ-দফতর বলিয়া কোনও কিছুর অস্তিত্বই নাই। তাহাতে কি সেজন্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? পড়ে নাই। আমার প্রস্তাব কার্যকর হইলেও তেমনি পাকিস্তানের দেশরক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল হইবে না। কারণ আমার প্রস্তাবে তহবিলের নিরাপত্তার জন্য শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করা হইয়াছে। সে অবস্থায় শাসনতন্ত্র এমন বিধান থাকিলে যে আঞ্চলিক সরকার যেখানে যখন যে- খাতেই যে টাকা ট্যাক্স ধার্য ও আদায় করুন না, কেন শাসনতন্ত্র নির্ধারিত সেই টাকার হারের অংশ রিজার্ভ ব্যাংকে কেন্দ্রীয় তহবিলে জমা হইয়া যাইবে। সে টাকায় আঞ্চলিক সরকারের কোনও হাত থাকিবে না। এই ব্যবস্থায় অনেক সুবিধা হইবে। প্রথমতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ট্যাক্স আদায়ের ঝামেলা পোহাইতে হইবে না। তৃতীয়তঃ ট্যাক্স ও কেন্দ্রের জন্য ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের মধ্যে ডুপ্লিকেশন হইবে না। তাহাতে আদায় খরচায় অপব্যয় ও অপচয় বন্ধ হইবে। ঐভাবে সঞ্চিত টাকার দ্বারা গঠন ও উন্নয়নমূলক অনেক কাজ করা যাইবে। অফিসারবাহিনীকেও উন্নততর সৎকাজে নিয়োজিত করা যাইবে। চতুর্থতঃ ট্যাক্স ধার্য ও আদায়ের একীকরণ সহজতর হইবে। সকলেই জানেন, অর্থ-বিজ্ঞানীরা এখন ক্রমেই সিঙ্গল ট্যাক্সেশনের দিকে আকৃষ্ট হইতেছেন। ট্যাক্সেশনকে ফেডারশনের এলাকা হইতে অঞ্চলের এখতিয়ারভুক্ত করা এই সর্বোত্তম ও সর্বশেষ আর্থিক নীতি গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ বলা যাইতে পারে।

৫নং দফা

এই দফায় আমি বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ে নিম্নরূপ শাসনতান্ত্রিক বিধানের সুপারিশ করিয়াছি :

১. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক পৃথক হিসাব রাখিতে হইবে।

২. পূর্ব-পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পূর্ব পাকিস্তানের এখতিয়ারে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানের এখতিয়ারে থাকিবে।

৩. ফেডারেশনের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা দুই অঞ্চলে হইতে সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রে নির্ধারিত হারাহারি মতে আদায় হইবে।

৪. দেশজাত দ্রব্যাদি বিনাশুল্কে উভয় অঞ্চলের মদ্যে আমদানী-রফতানী চলিবে।

৫. ব্যবসা-বাণিজ্য সম্বন্ধে বিদেশের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রফতানী করিবার অধিকার আঞ্চলিক সরকারের হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতান্ত্রিক বিধান করিতে হইবে।

পূর্ব-পাকিস্তানকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য এই ব্যবস্থা ৩নং দফার মতই আবশ্যক। পাকিস্তানের আঠার বছরের আর্থিক ইতিহাসের দিকে একটু নজর বুলাইলেই দেখা যাইবে যে :

(ক) পূর্ব-পাকিস্তানে অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প গড়িয়া তোলা হইয়াছে এবং হইতেছে। সেই সকল শিল্পজাত দ্রব্যের দ্বারা অর্জিত বিদেশী মুদ্রাকে পশ্চিম পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা বলা হইতেছে।

(খ) পূর্ব-পাকিস্তানের মূলধন গড়িয়া না উঠায় পূর্ব-পাকিস্তানে অর্জিত বিদেশী মুদ্রা ব্যবহারের ক্ষমতা পূর্ব-পাকিস্তানের নাই এই অজুহাতে পূর্ব-পাকিস্তানের বিদেশী আয়

পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইতেছে। এইভাবে পূর্ব-পাকিস্তান শিল্পায়িত হইতে পারিতেছে না।

(গ) পূর্ব-পাকিস্তান যে পরিমাণে আয় করে সেই পরিমাণ ব্যয় করিতে পারে না। সকলেই জানেন, পূর্ব পাকিস্তান যে পরিমাণ রফতানী করে, আমদানী করে সাধারণত তার বা মুদ্রাস্ফীতি ম্যালেরিয়া জ্বরের মত লাগিয়াই আছে। তাহার ফলে আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম এত বেশী। বিদেশ হইতে আমদানী করা এই জিনিসের পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী দামের তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। বিদেশী মুদ্রা বন্টনের দায়িত্ব এবং অর্থনৈতিক অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারে থাকার ফলে আমাদের এই দুর্দশা।

(ঘ) পাকিস্তানের বিদেশী মুদ্রার তিন ভাগের দুই ভাগই অর্জিত হয় পাট হইতে। অথচ পাটচাষীকে পাটের ন্যায্যমূল্য তো দূরের কথা আবাদী খরচটাও দেওয়া হয় না। ফলে পাটচাষীদের ভাগ্য আজ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের খেলার জিনিসে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানের সরকার পাটের চাষ নিয়ন্ত্রণ করেন; কিন্তু চাষীদের পাটের ন্যায্য দাম দিতে পারে না। এমন অদ্ভুত অর্থনীতি দুনিয়ার আর কোন দেশে নাই। যতদিন পাট থাকে চাষীর ঘরে, ততদিন পাটের দাম থাকে পনর-বিশ টাকা। ব্যবসায়ীর গুদামে চলিয়া যাওয়ার সাথে সাথে তার দাম পঞ্চাশ। এ খেলা গরীব পাটচাষী চিরকাল দেখিয়া আসিতেছে। পাট ব্যবসা জাতীয়করণ করিয়া পাট রফতানীকে সরকারি আয়ত্তে আনা ছাড়া এর কোনও প্রতিকার নাই, এ কথা আমরা বহুবার বলিয়াছি। এ উদ্দেশ্যে আমরা আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার আমলে জুট মার্কেটিং করপোরেশন গঠন করিয়াছিলাম। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পুঁজিপতিরা আমাদের এই আরব্ধ কাজ ব্যর্থ করিয়া দিয়াছেন।

(ঙ) পূর্ব-পাকিস্তানের অর্জিত বিদেশী মুদ্রাই যে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানে খরচ হইতেছে তাহা নয়, আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রার জোরে যে বিপুল পরিমাণ বিদেশী লোন ও এইড আসিতেছে, তাহাও পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইতেছে। কিন্তু সে লোনের সুদ বহন করিতে হইতেছে পূর্ব-পাকিস্তানকেই। ঐ অবস্থার প্রতিকার করিয়া পাটচাষীকে পাটের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে, আমদানী-রফতানী সমান করিয়া জনসাধারণকে সস্তা দামে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিয়া তাহাদের জীবন সুখময় করিতে হইলে এবং সর্বোপরি আমাদের অর্জিত বিদেশী মুদ্রা দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানীর হাতে পূর্ব-পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে হইলে আমার প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থা ছাড়া উপায়ন্তর নাই।

৬নং দফা

এই দফায় আমি পূর্ব-পাকিস্তানের মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের সুপারিশ করিয়াছি। এই দাবি অন্যায়ও নয় নতুনও নয়। একুশ দফার দাবিতে আমরা আনসারবাহিনীকে ইউনিফর্মধারী সশস্ত্রবাহিনীতে রূপান্তরিত করার দাবি করিয়াছিলাম তাহা তো করা হয়ই নাই, বরঞ্চ পূর্ব পাকিস্তান সরকারের অধীনস্থ ই.পি.আর বাহিনীকে এখন কেন্দ্রের অধীনে নেওয়া হইয়াছে। পূর্ব-পাকিস্তানে অস্ত্র-কারখানা ও নৌবাহিনীর হেডকোয়ার্টার স্থাপনকরতঃ এই অঞ্চলকে আত্মরক্ষায় আত্মনির্ভর করার দাবি একুশ দফার দাবি। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার বার বছরেও আমাদের একটি দাবি পূরণ করেন নাই। পূর্ব-পাকিস্তান অধিকাংশ পাকিস্তানীর বাসস্থান। এটাকে রক্ষা করা কেন্দ্রীয় সরকারেরই নৈতিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনে

আমাদের দাবি করিতে হইবে কেন? সরকার নিজে হইতে সে দায়িত্ব পালন করেন না কেন? পশ্চিম পাকিস্তান আগে বাঁচাইয়া সময় ও সুযোগ থাকিলে পরে পূর্ব পাকিস্তান বাঁচান হইবে, ইহাই কি কেন্দ্রীয় সরকারের অভিমত? পূর্ব-পাকিস্তানের রক্ষা-ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তানেরই রহিয়াছে এমন সাংঘাতিক কথা শাসনকর্তারা বলেন কোন মুখে? মাত্র সতের দিনের পাক-ভারত যুদ্ধই কি প্রমাণ করে নাই আমরা কত নিরূপায়? শত্রুর দয়া ও মর্জির উপর তো আমরা বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। কেন্দ্রীয় সরকারের দেশরক্ষা নীতি কার্যত আমাদের তাহাই করিয়া রাখিয়াছে।

তবু আমরা পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির খাতিরে দেশরক্ষা ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে রাখিতে চাই। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব-পাকিস্তানকে এ ব্যাপারে আত্মনির্ভর করিবার জন্য এখানে উপযুক্ত পরিমাণ দেশরক্ষা বাহিনী গঠন করুন, অস্ত্র-কারখানা স্থাপন করুন। নৌ-বাহিনীর দফতর এখানে নিয়া আসুন। এসব কাজ সরকার কবে করিবেন জানি না। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা অল্প খরচে ছোটখাটো অস্ত্র-শস্ত্র দিয়া আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করিতেও পশ্চিমা ভাইদের অত আপত্তি কেন? পূর্ব-পাকিস্তান রক্ষার উদ্দেশে স্বতন্ত্র যুদ্ধ-তহবিলে চাঁদা উঠিয়ে তাহাও কেন্দ্রীয় রক্ষা-তহবিলে নিয়া যাওয়া হয় কেন? ঐসব প্রশ্নের উত্তর নাই। তব কেন্দ্রীয় ব্যাপারে অঞ্চলের হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার আমরাও চাই না।

এ অবস্তায় পূর্ব-পাকিস্তান যেমন করিয়া পারে গরীবী হালেই আত্মরক্ষার ব্যবস্তা করিবে, এমন দাবি কি অন্যায়? এই দাবি করিলেই সেটা হইতে দেশদ্রোহিতা?

এ প্রসঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই-বোনদের খেদমতে, আমার কযেকটি আরজ আছে :

এক. তাঁহারা মনে করিবেন না আমি শুধু পূর্ব-পাকিস্তানীদের অধিকার দাবি করিতেছি। আমার ৬ দফা কর্মসূচিতে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অধিকার দাবিও সমভাবেই রহিয়াছে। এই দাবি স্বীকৃত হইলে পশ্চিত পাকিস্তানীরাও সমভাবে উপকৃত হইবেন।

দুই. আমি যখন বলি, পূর্ব-পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানের পাচার ও স্তূপীকৃত হইতেছে, তখন আমি আঞ্চলিক বৈষম্যের কথাই বলি, ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা বলি না, আমি জানি, এই বৈষম্য সৃষ্টির জন্য পশ্চিম পাকিস্তানীরা দায়ী নয়। আমি এও জানি যে, আমাদের মত দরিদ্র পশ্চিম পাকিস্তানেও অনেক আছেন। যতদিন ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অবসান না হইবে, ততদিন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এই অসাম্য দূর হইবে না। কিন্তু তার আগে আঞ্চলিক শোষণও বন্ধ করিতে হইবে। এই আঞ্চলিক শোষণের জন্যে দায়ী আমাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং সে অবস্থানকে অগ্রাহ্য করিয়া যে অস্বাভাবিক ব্যবস্থা চালাইবার চেষ্টা চলিতেছে সেই ব্যবস্থা দরুন, যদি পাকিস্তানের রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া পূর্ব-পাকিস্তানে হইত, পাকিস্তানের দেশরক্ষা বাহিনীর তিনটি দফতরই যদি পূর্ব-পাকিস্তানে হইত তবে কার কি অসুবিধা-সুবিধা হইত একটু বিচার করুন। পাকিস্তানের মোট রাজস্বের শতকরা ৬২ টাকা খরচ হয় দেশরক্ষা বাহিনীতে এবং শতকরা বত্রিশ টাকা খরচ হয় কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনায়। এই একুন শতকরা চুরানব্বই টাকা পশ্চিম পাকিস্তানে না হইয়া তখন খরচ হইতে পূর্ব-পাকিস্তানে। আপনারা জানেন অর্থবিজ্ঞানের কথা : সরকারি আয় জনগণের ব্যয় এবং সরকারি ব্যয় জনগণের আয়। এই নিয়মে বর্তমান ব্যবস্থায় সরকারের গোটা আয়ের অর্ধেক পূর্ব-পাকিস্তানের ব্যয় ঠিকই, কিন্তু সরকারি ব্যয়ের সবটুকুই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। রাজধানী পশ্চিম পাকিস্তানে অবস্থিত থাকায় সরকারি, আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বিদেশী মিশনসমূহ তাঁদের সমস্ত ব্যয় পশ্চিম পাকিস্তানেই করিতে বাধ্য হইতেছেন। এই ব্যয়ের সাকুল্যই পশ্চিম পাকিস্তানের আয়। ফলে প্রতিবছর পশ্চিম পাকিস্তানের আয় ঐ অনুপাতে বাড়িতেছে এবং পূর্ব-পাকিস্তান তার মোকাবিলায় ঐ পরিমাণ গরীব হইতেছে। যদি পশ্চিম পাকিস্তানের বদলে পূর্ব-পাকিস্তানে আমাদের রাজধানী হইত তবে এইসব খরচ পূর্ব-পাকিস্তানে হইত। আমরা পূর্ব-পাকিস্তানীরা এই পরিমাণে ধনী

হইতাম। আপনারা পশ্চিম পাকিস্তানীরা ঐ পরিমাণে গরীব হইতেন। তখন আপনারা কি করিতেন? যেসব দাবি করার জন্য আমাকে প্রাদেশিক সংকীর্ণতার তহমত দিতেছেন সেইসব দাবি আপনারা নিজেরাই করিতেন। আমাদের চেয়ে জোরেই করিতেন। অনেক আগেই করিতেন। আমাদের মত আঠার বছর বসিয়া থাকিতেন না। সেটা করা আপনাদেরক অন্যায়ও হইত না।

তিন. আপনারা ঐসব দাবি করিলে আমরা পূর্ব-পাকিস্তানীরা কি করিতাম, জানেন? আপনাদের সব দাবি মানিয়া লইতাম। আপনাদিগকে প্রাদেশিকতাবাদী বলিয়া গাল দিতাম না। কারণ আমরা জানি এবং বিশ্বাস করি, ও-সব আপনাদের হক পাওনা। নিজের হক পাওনা দাবি করা অন্যায় নয়, কর্তব্য। এ বিশ্বাস আমাদের এতই আন্তরিক যে, সে অবস্থা হইলে আপনাদের দাবি করিতে হইত না। আপনাদের দাবি করার আগেই আপনাদের হক আপনাদিগকে বুঝাইয়া দিতাম। আমরা নিজেদের হক দাবি করিতেছি বলিয়া আমাদের স্বার্থপর বলিতেছেন। কিন্তু আপনারা যে নিজেদের হকের সাথে সাথে আমাদের হকটাও খাইয়া ফেলিতেছেন আপনাদেরকে লোকে কি বলিবে? আমরা শুধু নিজেদের হকটাই চাই। আপনাদের হকটাও আত্মসাৎ করিতে চাই না। আমাদের দিবর সুযোগ থাকিলে বরঞ্চ পরকে কিছু দিয়াও দেই। দৃষ্টান্ত? শুনুন তবে :

১. প্রথম গণ-পরিষদে আমাদের মেম্বার সংখ্যা ছিল ৪৪; আর আপনাদের ছিল ১৮, আমরা ইচ্ছা করিলে গণতান্ত্রিক শক্তিতে ভোটের জোরে রাজধানী ও দেশরক্ষার সদর দফতর পূর্ব-পাকিস্তান আনিতে পারিতাম। তা করি নাই।
২. পশ্চিম পাকিস্তানীদের সংখ্যাল্পতা দেখিয়া ভাই-এর দরদ লইয়া আমাদের ৪৪টা আসনের মধ্যে ৬ টাতেই পূর্ব-পাকিস্তানীর ভোটে পশ্চিম পাকিস্তানী মেম্বার নির্বাচন করিয়াছিলাম।
৩. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে শুধু বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করিতে পারিতাম, তাহা না করিয়া বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্রভাষার দাবি করিয়াছিলাম।
৪. ইচ্ছা করিলে ভোটের জোরে পূর্ব-পাকিস্তানের সুবিধাজনক শাসনতন্ত্র রচনা করিতে পারিতাম।
৫. আপনাদের মন হইতে মেজরিটি ভয় দূর করিয়া সে স্থলে ভ্রাতৃত্ব ও মমতাবোধ সৃষ্টির জন্য উভয় অঞ্চলের সকল বিষয়ে সমতা বিধানের আশ্বাসে আমরা সংখ্যা গুরুত্ব ত্যাগ করিয়া সংখ্যা-সাম্য গ্রহণ করিয়াছিলাম।

চার. সুতরাং পশ্চিম পাকিস্তানী ভাই সাহেবান, আপনারা দেখিতেছেন, যেখানে-যেখানে আমাদের দান করিবার সুযোগ ছিল, আমরা দান করিয়াছি। আর কিছুই নাই দান করিবার, থাকিলে নিশ্চয় দিতাম। যদি পূর্ব-পাকিস্তানে রাজধানী হইত তবে আপনাদের দাবি করিবার আগেই আমরা পশ্চিম পাকিস্তানে সত্য সত্যই দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করিতাম। দ্বিতীয় রাজধানীর নামে ধোঁকা দিতাম না। সে অবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সকল প্রকার ব্যয় যাহাতে উভয় অঞ্চলে সমান হয়, তার নিখুঁত ব্যবস্থা করিতাম। সকল ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে এবং প্রদেশসমূহকে পৃথক পৃথকভাবে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতাম। আমরা দেখাইতাম পূর্ব-পাকিস্তানীরা মেজরিটি বলিয়া পাকিস্তান শুধু পূর্ব-পাকিস্তানীদের নয়, ছোট বড় নির্বিশেষে তা সকল পাকিস্তানীর পূর্ব-পাকিস্তানে রাজধানী হইলে তার সুযোগ লইয়া আমরা পূর্ব-পাকিস্তানীরা। সব অধিকার ও চাকুরি গ্রাস করিতাম না। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসনভার পশ্চিম পাকিস্তানীদের হাতেই দিতাম। আপনাদের কটন বোর্ডে আমরা চেয়ারম্যান হইতে যাইতাম না। আপনাদের প্রদেশের আমরা গভর্নর হইতেও চাহিতাম না। আপনাদের পি.আই.ডি.সি আপনাদের ওয়াপদা, আপনাদের ডিআইটি, আপনাদের পোর্ট ট্রাস্ট, আপনাদের রেলওয়ে ইত্যাদির চেয়ারম্যানি আমরা দখল করিতাম না। আপনাদেরই করিতে দিতাম। সমস্ত অল পাকিস্তানী প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব-পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত করিতাম না। ফলত পূর্ব-পাকিস্তানকে অর্থনীতিতে মোটা ও পশ্চিম পাকিস্তানকে সরু করিতাম না। দুই অঞ্চলের মধ্যে এই মারাত্মক ডিসপ্যারিটি সৃষ্টি হইতে দিতাম না।

এমন উদারতা, এমন নিরপেক্ষতা, পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে এমন ইনসাফ বোধই পাকিস্তানী দেশপ্রেমের বুনিয়াদ। ইহা যাহার মধ্যে আছে কেবল তিনি দেশপ্রেমিক। যে নেতার মধ্যে এই প্রেম আছে, কেবল তিনিই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের উপর নেতৃত্বদানের যোগ্য। যে নেতা বিশ্বাস করেন, দুইটি অঞ্চল আসলে পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় দেহের দুই চোখ, দুই কান, দুই নাসিকা, দুই পাটি দাঁত, দুই হাত, দুই পা, যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানকে শক্তিশালী করিতে হইলে এসব জোড়ার দুইটিকেই সমান সুস্থ ও শক্তিশালী করিতে হইবে; যে নেতা বিশ্বাস করেন পাকিস্তানের এক অঙ্গ দুর্বল হইলে গোটা পাকিস্তানই দুর্বল হইয়া পড়ে; যে নেতা বিশ্বাস করেন ইচ্ছা করিয়া বা জানিয়া যাহারা পাকিস্তানের এক অঙ্গকে দুর্বল করিতে চায়, তাহারা। পাকিস্তানের দুশমন; যে নেতা দৃঢ় ও সবল হস্তে সেই দুশমনদের শায়েস্তা করিতে প্রস্তুত আছেন, কেবল তিনিই পাকিস্তানের জাতীয় নেতা হইবার অধিকারী, কেবল তাঁহারই নেতৃত্বে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট ও শক্তি অপরাজেয় হইবে। পাকিস্তানের মত বিশাল ও অসাধারণ রাষ্ট্রের নায়ক হইতে হইলে নায়কের অন্তরও হইতে হইবে বিশাল ও অসাধারণ। আশা করি আমার পশ্চিম পাকিস্তানী ভাইরা এই মাপকাঠিতে আমার ছয় দফা কর্মসূচির বিচার করিবেন। তহা যদি তাঁহারা করেন তবে দেখিতে পাইবেন, আমার এই ছয় দফা শুধু পূর্ব-পাকিস্তানের বাঁচার দাবি নয়, গোটা পাকিস্তানেরই বাঁচার দাবি। আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা, আপনারা দেখিতেছেন যে, আমার ৬ দফা দাবিতে একটিও অন্যায়, অসঙ্গত, পশ্চিম পাকিস্তান বিরোধী বা পাকিস্তান ধ্বংসকারী প্রস্তাব করি নাই। বরঞ্চ আমি যুক্তি–তর্ক–সহকারে দেখাইলাম, আমার সুপারিশ গ্রহণ করিলে পাকিস্তান আরও অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। তথাপি কয়েমী স্বার্থের মুখপাত্ররা আমার বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার এলজন লাগাইতেছেন। এটা নতুনও নয়, বিস্ময়ের কথাও নয়। পূর্ব-পাকিস্তানের মজলুম জনগণের পক্ষে কথা বলিতে গিয়া আমার বাপ-দাদার মত মুরুব্বিরাই ইহাদের কাছে গাল খাইয়াছেন, ইহাদের হাতে লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন, আর আমি কোন ছার! দেশবাসীর মনে আছে, আমাদের নয়নমণি শেরে বাংলা ফজলুল হককে ইহারা দেশদ্রোহী বলিয়াছিলেন। দেশবাসী ইহাও দেখিয়াছেন যে, পাকিস্তানের অন্যতম স্রষ্টা পাকিস্তানের সর্বজনমান্য জাতীয় নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দীকেও দেশদ্রোহিতার অভিযোগে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল ইহাদেরই হাতে। অতএব দেখা গেল পূর্ব-পাকিস্তানের ন্যায্য দাবির কথা বলিতে গেলে দেশদ্রোহিতার বদনাম ও জেল–জুলুমের ঝুঁকি লইয়াই সে কাজ করিতে হইবে। অতীতে এমন অনেক জেল–জুলুম ভুগিবার তকদির আমার হইয়াছে। মুরুব্বিদের দোয়ার, সহকর্মীদের সহৃদয়তায় এবং দেশবাসীর সমর্থনে সে সব সহ্য করিবার মত মনের বল আল্লাহ আমাকে দান করিয়াছেন। সাড়ে পাঁচ কোটি পূর্ব-পাকিস্তানীর ভালবাসাকে সম্বল করিয়া আমি এই কাজে যে, কোনও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত আছি। আমার দেশবাসীর কল্যাণের কাছে আমার মত নগণ্য ব্যক্তির জীবনের মূল্যই বা কতটুকু? মজলুম দেশবাসীর বাঁচার দাবির জন্য সংগ্রাম করার চেয়ে মহৎ কাজ আর কিছু আছে বলিয়া আমি মনে করি না। মরহুম জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ন্যায় যোগ্য নেতার কাছেই আমি এ জ্ঞান লাভ করিয়াছি। তাঁহার পায়ের তলে বসিয়াই এতকাল দেশবাসীর খেদমত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। তিনিও আজ বাঁচিয়া নাই, আমিও আজ যৌবনের কোটা বহু পিছনে ফেলিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌছিয়াছি। আমার দেশের প্রিয় ভাই–বোনেরা, আল্লাহর দরগায় শুধু এই দোয়া করিবেন, বাকী জীবনটুকু আমি যেন তাঁহাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি সাধনায় নিয়োজিত করিতে পারি।

শেখ মুজিবর রহমান
৪ঠা চৈত্র, ১৩৭২
মার্চ, ১৯৬৬

পরিশিষ্ট : ৩

ছাত্র সমাজের ১১ দফা

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের ডাক ঃ এগার দফার দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া তুলুন। স্বৈরচারী সরকারের দীর্ঘদিনের অনুসৃত জনস্বার্থবিরোধী নীতির ফলেই ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর জীবনে সঙ্কট ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। শাসনে-শোষণে অতিষ্ঠ হইয়া ছাত্র-জনতা ছাত্র গণআন্দোলনের পথে আগাইয়া আসিয়াছেন।

আমরা ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থে নিম্নোক্ত ১১ দফার দাবিতে ব্যাপক ছাত্র-গণআন্দোলনের আহ্বান জানাইতেছি।

১. (ক) সচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করিতে হইবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া দিতে হইবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করিতে হইবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হইবে। কারিগরি শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করিতে হইবে।

(গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ্য আইএ, আই.এসসি, আই.কম ও বি.এ, বি.এসসি, বি.কম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ্য এম.এ ও এম.কম ক্লাস চালু করিতে হইবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করিতে হইবে। স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও স্টাইপেন্ড কাড়িয়া লওয়া চলিতে না।

(ঙ) হল, হোস্টেলের ডাইনিং হল ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করিতে হইবে।

(চ) হল ও হোস্টেল সমস্যার সমাধান করিতে হইবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করিতে হইবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করিতে হইবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হইবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করিতে হইবে।

(ঝ) মেডিকেল, বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিতে হইবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিন্যান্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবি মানিয়া লইতে হইবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষায় অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরীর সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষেও ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সে' সুযোগ দিতে হইবে এবং বোর্ড ফাইনারে পরীক্ষা বাতিল করিয়া একমাত্র সেমিস্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হইবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মানিয়া লইতে হইবে। আই,ই,আর ছাত্রদের ১০ দফা, সমাজ কল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম,বি,এ, ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবি মানিয়া লইতে হইবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অনান্য বিশ্ববিদ্যালযে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা "ফ্যাকাল্টি" করিতে হইবে।

(ড) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মানিয়া লইতেত হইবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মানিয়া লইতে হইবে।

(ঢ) ট্রেনে, স্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখাইয়া শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কনসেশনে' টিকেট দেওয়ার ব্যবস্থা করিতে হইবে। মাসিক টিকিটেও এই 'কনসেশন' দিতে হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মত বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোন স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করিতে হইবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ 'কনসেশন' দিতে হইবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করিতে হইবে। সরকারি ও আধাসরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কনসেশন' দিতে হইবে।

(ণ) চাকুরির নিশ্চয়তা বিধান করিতে হইবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করিতে হইবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রমাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করিতে এবং ছাত্র সমাজ ও দেশবাসীর স্বার্থ গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিল করিতে হইবে।

২. প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। বাক-স্বাধীনতা ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হইবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার উপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

৩. নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মানিয়া লইবার ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হইবে।

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হইবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হইবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকিবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতা হইবে নিরংকুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকিবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকিবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকিতে হইবে য, যাহাতে পূর্ব-পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হইতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেশন রিজার্ভ ব্যাংক থাকিবে। দুই অঞ্চলের দুইটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাংক তাকিবে এবং পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করিতে হইবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকিবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে, ফেডারেল সরকারের কোন কর ধার্য করিবার ক্ষমতা থাকিবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল

তহবিলে জমা হইবে। এই কর্মে রিজার্ভ ব্যাংকসমূহের উপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকিবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহির্বাণিজ্যের পৃথক হিসাব রক্ষা করিবে এবং বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির এখতিয়ারাধীন থাকিবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশী মুদ্রা অঙ্গে রাষ্ট্রগুলি সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করিবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আমদানী–রফতানী চলিবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশী রাষ্ট্রগুলির সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী–রফতানী করিবার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির হাতে ন্যস্ত করিয়া শাসনতন্ত্রে বিধান করিতে হইবে।

(চ) পূর্ব-পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হইবে। পূর্ব-পাকিস্তানে অস্ত্র–কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করিতে হইবে।

৪. পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর–পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদানকরতঃ সাব-ফেডারেশন গঠন করিতে হইবে।

৫. ব্যাংক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করিতে হইবে।

৬. কৃষকের উপর হইতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করিতে হইবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করিতে হইবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহসিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্যমূল্য দিতে হইবে।

৭. শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরী ও বোনাস দিতে হইবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করিতে হইবে। শ্রমিক স্বার্থবিরোধী কালা-কানুন প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করিতে হইবে।

৮. পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পানি সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৯. জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা আইন ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করিতে হইবে।

১০. সিয়াটো, সেন্টো, পাক–মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করিয়া জোটবহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করিতে হইবে।

১১. অবিলম্বে দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে গ্রেফতারী পরোয়ানা, হুলিয়া এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করিতে হইবে।

সংগ্রামী ছাত্র সমাজের পক্ষে :

আবদুর রউফ– সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
খালেদ মোহাম্মদ আলী– সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ।
সাইফুদ্দিন আহমেদ– সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
সামসুদ্দোহা– সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
মোস্তফা জামাল হায়দার– সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
দীপা দত্ত– সহসম্পাদিকা, পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন।
তোফায়েল আহমেদ– সহ-সভাপতি, ডাকসু।
নাজিম কামরান চৌধুরী– সাধারণ সম্পাদক, ডাকসু।

১৪ জানুয়ারি, ১৯৬৯

পরিশিষ্ট : ৪

প্রথম জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ৭ মার্চ ১৯৭৩

রাজনৈতিক দল/ স্বতন্ত্র	প্রাপ্ত আসন সংখ্যা	প্রাপ্ত আসনের শতকরা হার	প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা	প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হার
আওয়ামী লীগ	২৮২*	৯৭.৬৬%	১,৩৭,৯৩,৭১৭	৭৩.১৬%
ন্যাপ (মোজাফফর)	--	--	১৫,৬৯,২৯৯	৮.৩২%
জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল	০১	০.৩৩%	১২,২৯,১১০	৬.৫২%
ন্যাপ (ভাসানী)	--	--	১০,০২,৭৭১	৫.৩২%
জাতীয় লীগ	০১	০.৩৩	৬২.৩৫৪	০.৩৩%
স্বতন্ত্র	০৫	১.৬৬%	৯,৮৯,৮৮৪	৫.২৫%

- ❖ নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী সর্বমোট প্রার্থী : ১০৯১ জন
- ❖ নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী রাজনৈতিক দল : ১৪টি
- ❖ সর্বমোট বৈধ ভোটারের সংখ্যা : ৩,৫২,০৫,৬৪২ জন
- ❖ নির্বাচনে প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা : ১,৯৩,২৯,৬৪৩টি
- ❖ প্রাপ্ত ভোটের শতকরা (%) হার : ৫৫.৬১%

** নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত ১১ জন প্রার্থী ১১টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন। এ ছাড়াও মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৫টি আসনই আওয়ামী লীগ লাভ করে। ফলে আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত জাতীয় সংসদের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় (২৮২+১১+১৫) ৩০৮টি।*

পরিশিষ্ট : ৫

প্রথম জাতীয় সংসদের (১৯৭৩) কার্যকাল

অধিবেশন	শুরু	শেষ	কার্যদিবস
প্রথম	০৭.০৪.৭৩	১৯.০৪.৭৩	৭ দিন
দ্বিতীয়	০২.০৬.৭৩	১৭.০৭.৭৩	৩৭ দিন
তৃতীয়	১৫.০৯.৭৩	২৬.০৯.৭৩	১০ দিন
চতুর্থ	১৫.০১.৭৪	০৫.০২.৭৪	১৬ দিন
পঞ্চম	০৩.০৬.৭৪	২২.০৭.৭৪	৩৭ দিন
ষষ্ঠ	১৪.১১.৭৪	২৩.১১.৭৪	৫ দিন
সপ্তম	২০.০১.৭৫	২৫.০১.৭৫	২ দিন
অষ্টম	২৩.০৬.৭৫	১৭.০৭.৭৫	২০ দিন

❖ সর্বমোট অধিবেশন : ৮টি

❖ সর্বমোট কার্যদিবস : ১৩৪ দিন

পরিশিষ্ট : ৬

মুজিব আমলের সংসদ সদস্যদের (১৯৭৩) বিশ্লেষণ

বয়স	২৫-৩০	৩১-৩৫	৩৬-৪৫	৪৬-৫৫	৫৬-তদূর্ধ	মোট
	১১.১%	২২.৫%	৪০%	২১.৮%	৪.৬%	২৮০

শিক্ষা	১০ম শ্রেণীর নিচে	১০ম শ্রেণী	স্কুল পাস	কলেজ পাস	স্নাতকোত্তর	কারিগরি শিক্ষা	মোট
	৩.২%	১১.০%	১২.৫%	৪২.৩%	২৭.৩%	৩.২%	২৮১

পেশা	আইনজীবি	ব্যবসায়ি	ভূস্বামী	কৃষক	চাকরি	শিক্ষক	চিকিৎসক	রাজনীতিক	অন্যান্য	মোট
	২৬.৫%	২৩.৭%	২.৮%	১৪.৮%	০.৭%	৯.৯%	৫.৩%	১২.৭%	৩.৯%	২৮৩

আয় (বার্ষিক)	২০ হাজারের কম	২০-৩০ হাজার	৩০-৫০ হাজার	৫০ হাজার-তদূর্ধ	মোট
	৩২.২%	৩১.৮%	২৪.৪%	১১.৭%	২৮৩

রাজনৈতিক আন্দোলনের	৫ বছরের কম	৫-১০ বছর	১১-১৫ বছর	১৬-তদূর্ধ	মোট
অভিজ্ঞতা	৬.৫%	১৩.৪%	১২.০%	৬৮.১%	২৭৬
দলীয় দায়িত্বের অভিজ্ঞতা	২৬.২%	২৭.৪%	৪.৬%	৪১.৮%	২৬৩

রাজনীতিতে যোগদান

১৯৪৭-এর পূর্বে	'৪৭-'৫৫,	'৫৬-'৫৯,	'৬২-'৬৬,	'৬৯-'৭০,	'৭১-এর পর	মোট
২৯.৩%	৩১.১%	৯.২%	১৬.৬%	৬.০%	১.৪%	২৮৩

পরিশিষ্ট : ৭

মুজিব শাসনামলে সংবিধান সংশোধনীসমূহ

১. সংবিধান (প্রথম সংশোধন) আইন, ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ১৫ নং আইন (১৫ জুলাই, ১৯৭৩)

গণহত্যাজনিত অপরাধ, মানবতা বিরোধী অপরাধ বা যুদ্ধাপরাধ এবং আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধের জন্য কোন সশস্ত্র বাহিনী বা প্রতিরক্ষা বাহিনী বা সহায়ক বাহিনীর সদস্য কিংবা যুদ্ধবন্দিকে আটক, ফৌজদারীতে সোপর্দ কিংবা দণ্ডদান করার বিধান সংবলিত আইন।

২. সংবিধান (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৩

১৯৭৩ সালের ২৪ নং আইন (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩)

আটকাদেশ, জরুরি অবস্থা ঘোষণা এবং মৌলিক অধিকার স্থগিত করার বিধান সংবলিত আইন।

৩. সংবিধান (তৃতীয় সংশোধন) আইন, ১৯৭৪

১৯৭৪ সালের ৭৪ নং আইন (২৮ নভেম্বর, ১৯৭৪)

ভারতের কাছে বেরুবাড়ি হস্তান্তর, বাংলাদেশ কর্তৃক চিরস্থায়ীভাবে তিন বিঘা করিডোর লিজ লাভ এবং সীমানা নির্ধারণী সংক্রান্ত আইন।

৪. সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) আইন, ১৯৭৫

১৯৭৫ সালের ২ নং আইন (২৫ জানুয়ারি, ১৯৭৫)

রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতির সরকার, এক দলীয় শাসন প্রবর্তন, জাতীয় দল গঠন, ভোটাধিকার হরণ এবং আদালতের ক্ষমতা খর্ব করার আইন।

পরিশিষ্ট : ৮

মুজিব শাসনামলে রাষ্ট্রপতি, উপ-রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রি ও মন্ত্রিবর্গ

ক. রাষ্ট্রপতিবৃন্দ

১. শেখ মুজিবর রহমান (১০.৪.১৯৭১–১২.১.১৯৭২)
২. সৈয়দ নজরুল ইসলাম (অস্থায়ী) (১০-৪.১৯৭১–১০.১.১৯৭২)
৩. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (১২.১.১৯৭২–২৩.১২.১৯৭৩)
৪. মুহাম্মদউল্লাহ (২৩.১২.১৯৭৩–২৫.১.১৯৭৫)
৫. শেখ মুজিবর রহমান (২৫.১.১৯৭৫–১৫.৮.১৯৭৫)

খ. উপ-রাষ্ট্রপতিবৃন্দ

১. সৈয়দ নজরুল ইসলাম (২৬.১.১৯৭৫–১৫.৮.১৯৭৫)

গ. প্রধানমন্ত্রিবৃন্দ

১. তাজউদ্দিন আহমেদ (১০.৪.১৯৭১–১২.১.১৯৭২)
২. শেখ মুজিবর রহমান (১২.১.১৯৭২–২৫.১.১৯৭৫)
৩. মুহাম্মদ মনসুর আলী (২৫.১.১৯৭৫–১৫.৮.১৯৭৫)

ঘ. মন্ত্রিবৃন্দ

১. খন্দকার মোশতাক আহমদ (১০.৪.১৯৭১–১৫.৮.১৯৭৫)
২. মুহাম্মদ মনসুর আলী (১০.৪.১৯৭১–২৫.১.১৯৭৫)
৩. এ.এইচ.এম. কামরুজ্জামান (১০.৪.১৯৭১–১৫.৮.১৯৭৫)
৪. শেখ আবদুল আজিজ (২৫.১২.১৯৭১–৬.৭.১৯৭৪)
৫. ফনীভূষণ মজুমদার (২৫.১২.১৯৭১–৬.১১.১৯৭৫)
৬. জহুর আহমেদ চৌধুরী (২৫.১২.১৯৭১–১.১১.১৯৭৫)
৭. অধ্যাপক ইউসুফ আলী (২৫.১২.১৯৭১–৬.১১.১৯৭৫)
৮. আবদুস সামাদ আজাদ (২৫.১২.১৯৭১–১৫.৮.১৯৭৫)

৯. সৈয়দ নজরুল ইসলাম (২৫.১.১৯৭২–২৫.১.১৯৭৫)
১০. তাজউদ্দিন আহমেদ (১২.১.১৯৭২–২৬.১০.১৯৭৪)
১১. ড. কামাল হোসেন (১২.১.১৯৭২–১৫.৮.১৯৭৩)
১২. মতিউর রহমান (১২.১.১৯৭২–৬.৬.১৯৭৪)
১৩. মোস্তাফিজুর রহমান সিদ্দিকী (১৯.১.১৯৭২–১৬.৩.১৯৭৩)
১৪. মুহাম্মদ শামসুল হক (১৯.১.১৯৭২–১৬.৩.১৯৭৩)
১৫. আবদুল মান্নান (১২.৪.১৯৭২–৬.১১.১৯৭৫)
১৬. ড. মফিজ চৌধুরী (১২.৪.১৯৭২–৬.৭.১৯৭৪)
১৭. মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমেদ (১২.৪.১৯৭২–১৬.৩.১৯৭৩)
১৮. মিজানুর রহমান চৌধুরী (১২.৪.১৯৭২–১৭.৫.১৯৭৩)
১৯. মুহাম্মদ আতাউল গনি ওসমানী (১২.৪.১৯৭২–৬.৭.১৯৭৪)
২০. আবদুর রব সেরনিয়াবাত (১২.৪.১৯৭২–১৫.৮.১৯৭৫)
২১. মুহাম্মদ সোহরাব হোসেন (১২.৪.১৯৭২–৬.১১.১৯৭৫)
২২. আবদুল মালেক উকিল (১২.৪.১৯৭২–২৭.১.১৯৭৪)
২৩. মনোরঞ্জন ধর (১৬.৩.১৯৭৩–৬.১১.১৯৭৫)
২৪. মুহাম্মদ শামসুল হক (৬.১২.১৯৭৩–৬.৭.১৯৭৪)
২৫. মোল্লা জালাল উদ্দীন আহমেদ (৬.১২.১৯৭৩–৬.৭.১৯৭৪)
২৬. আবদুল মোমিন (৮.৭.১৯৭৪–৬.১১.১৯৭৫)
২৭. ড. মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী (২৬.১.১৯৭৫–৬.১১.১৯৭৫)
২৮. ড. এ. আর. মল্লিক (২৬.১.১৯৭৫–৬.১১.১৯৭৫)
২৯. মুহাম্মদউল্লাহ (২৬.১.১৯৭৫–১৫.৮.১৯৭৫)
৩০. মুহাম্মদ কোরবান আলী (২৬.১.১৯৭৫–১৫.৮.১৯৭৫)
৩১. আসাদুজ্জামান খান (২৬.১.১৯৭৫–৬.১১.১৯৭৫)
৩২. বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী (৮.৮.১৯৭৫–২০.৮.১৯৭৫)

ঙ. প্রতিমন্ত্রি, উপমন্ত্রিবৃন্দ

১. ডা. ক্ষীতিশ মণ্ডল (৩.১০.১৯৭৩–৬.১১.১৯৭৫)
২. ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম (৩.১০.১৯৭৩–৬.৭.১৯৭৫)
৩. তাহের উদ্দিন ঠাকুর (৩.১০.১৯৭৩–৬.১১.১৯৭৫)
৪. আবদুল মোমিন (৩.১০.১৯৭৩–৭.৭.১৯৭৫)
৫. মোসলেহ উদ্দীন খান (৩.১০.১৯৭৩–৬.১১.১৯৭৫)
৬. আবদুল মোমেন তালুকদার (৩.১০.১৯৭৩–২৬.১.১৯৭৫)
৭. নূরুল ইসলাম মঞ্জুর (৩.১০.১৯৭৩–২১.৭.১৯৭৫)
৮. নূরুল ইসলাম চৌধুরী (৩.১০.১৯৭৩–৬.১১.১৯৭৫)
৯. বেগম বদরুননেসা আহমেদ (৩.১০.১৯৭৩–২৫.৫.১৯৭৫)
১০. বেগম নূরজাহান মুরশেদ (৩.১০.১৯৭৩–৬.১১.১৯৭৫)

১১. কে. এম. ওবায়েদুর রহমান (৩.১০.১৯৭৩–৬.১১.১৯৭৫)
১২. দেওয়ান ফরিদ গাজী (৩.১০.১৯৭৩–৬.১১.১৯৭৫)
১৩. রিয়াজ উদ্দীন আহমেদ (৩.১০.১৯৭৩–২৬.১১.১৯৭৫)
১৪. শাহজাদা আবদুল মালেক খান (৬.৭.১৯৭৮–৬.১১.১৯৭৫)
১৫. সৈয়দ আলতাফ হোসেন (২০.৭.১৯৭৫–৬.১১.১৯৭৫)

সম্পাদকীয় নোট :

[অভ্যুত্থানে শেখ মুজিব পরিবার-পরিজনসহ নিহত হলে ১৫ আগস্ট আওয়ামী লীগেরই একটি অংশ মন্ত্রিসভা গঠন করে। এদের মধ্যে ছিলেনঃ খোন্দকার মোশতাক আহমদ, মুহম্মদউল্লাহ, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, ফনীভূষণ মজুমদার, মোহাম্মদ সোহরাব হোসেন, আবদুল মান্নান, মনোরঞ্জন ধর, আবদুল মোমিন, আসাদুজ্জামান খান, ড. এ. আর. মল্লিক, ড. মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী, শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন, তাহের উদ্দিন ঠাকুর, দেওয়ান ফরিদ গাজী, নূরুল ইসলাম চৌধুরী, নূরুল ইসলাম মঞ্জুর, কে. এম. ওবায়েদুর রহমান, মোসলেম উদ্দীন খান, ডা. ক্ষীতিশ চন্দ্র মণ্ডল, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ আলতাফ হোসেন ও মোমিন উদ্দিন সরকার। জেনারেল ওসমানী ২৪ আগস্ট মন্ত্রিসভায় যোগ দেন। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের গ্রেফতারকৃত শীর্ষ চার নেতাঃ সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমেদ, এম. মনসুর আলী, কামরুজ্জামান কারাগারে নিহত হন ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে।

বস্তুতঃ ক্ষমতার পালা-বদলের সঙ্গে সঙ্গে শেখ মুজিবের মন্ত্রিরা রাজনীতিক নীতি ও আদর্শ বদল করেন। আবদুল মান্নান, আসাদুজ্জামান খান, দেওয়ান ফরিদ গাজী প্রমুখ আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে ফিরে আসেন। সৈয়দ আলতাফ হোসেন বাকশাল-পূর্ব মস্কোপন্থী রাজনীতিতে প্রত্যাবর্তন করেন। জেনারেল ওসমানী নতুন রাজনৈতিক দল জনতা পার্টি গঠন করেন। শেখ মুজিবের মন্ত্রিদের পরবর্তী রাজনৈতিক অবস্থান ছিল সত্যিকার অর্থেই বিচিত্র। শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন খোন্দকার মোশতাকের সঙ্গে ডেমোক্রেটিক লীগ গঠন করেন, কিন্তু পরে এরশাদের মন্ত্রি হয়ে জাতীয় পার্টিতে চলে যান এবং ২০০৭ সালের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এ যোগ দেন। মিজান চৌধুরী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, রিয়াজ উদ্দিন আহমেদ, কোরবান আলীও জাতীয় পার্টিতে যান। কে. এম. ওবায়েদুর রহমান জিয়ার মন্ত্রি হন। বেগম জিয়ার বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে তিনি জাতীয় দল গঠন করেন এবং ১৯৯৬ সালে আবার বিএনপি'তে ফিরে আসেন। ড. কামাল হোসেন, ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, নূরজাহান মোরশেদ আওয়ামী লীগের নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে মত পার্থক্যের ফলে নতুন দল 'গণ ফোরাম' গঠন করেন। তবে ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম আওয়ামী রাজনীতিতে ফিরে এসে ২০০৭ সালের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হন।

আওয়ামী লীগ আবার ক্ষমতায় (১৯৯৬) এলে আগস্ট অভ্যুত্থানের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তাহের উদ্দিন ঠাকুর গ্রেফতার হন।]

পরিশিষ্ট : ৯

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী চুক্তি

TREATY OF FRIENDSHIP, COOPERATION AND PEACE BETWEEN THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH AND THE REPUBLIC OF INDIA

Inspired by common ideals of peace, secularism, democracy, socialism and nationalism.

Having struggled together for the realisation of these ideals and cemented ties of friendship through blood and sacrifices which led to the triumphant emergence of a free, sovereign and independent Bangladesh.

Determined to maintain fraternal and good neighbourly relations and transform their border into a boarder of eternal peace and friendship.

Adhering firmly to the basic tenets of non-alignment, peaceful co-existence, mutual cooperation, non interference in internal affairs and respect for territorial integrity and sovereignty.

Determined to safeguard peace, stability and security and to promote progress of thier respective countries through all possible avenues of mutual cooperation.

Determined further to expand and strengthen the existing relations of friendship between them.

Convineced that the further development of friendship and cooperation meets the national interests of both States as well as the interests of lasting peace in Asia and the world.

Resolved to contribute to strengthening world peace and security and to make efforts to bring about a relaxation of international tension and the final elimination of vestiges of colonialism and imperialism.

Convinced that in the present-day world international problems can be solved only through cooperation and not thorough conflict or confrontation.

The Poeple's Republic of Bangladesh, on the one hand, and the Republic of India, on the other, have decided to conclude the present Treaty.

ARTICLE 1: The High Contracting Parties inspired by the ideals for which their respective peoples struggled and made sacrifices together, solemnly declare that there shall be lasting peace friendship beteen their two countries and their poeples. Each side shall respect the independence, sovereignty and territirial integrity of the other and refrain from interfering in the internal affairs of the other side.

The High Contracting Parties shall further develop and strengthen the relations of friendship, good neighboruliness and allround cooperation existing between them, on the basis of the above mentioned principles as well as the principles of equality and mutual benefit.

ARTICLE 2: Being guided by their devotion to the principles of equality of all

poeple and states, irrepective of race or creed, the High Contracting Parties condemn colonialism and racialism in all their forms and manifestations and reaffirm their determination to strive for their final and complete elimination.
The High Contracting Parties shall cooperate with other states in achieving these aims and support the just aspirations of peoples in their struggle against colonialism and racial discrimination and for their national liberation.
ARTICLE 3: The High Contracting Parties reaffirm their faith in the policy of non-alignment and peaceful co-existence, as important factors for easing tension in the world, maintaining international peace and security and strengthening national sovereignty and independence.
ARTICLE 4: The High Contracting Parties shall maintain regular contacts with each other on major international problems affeeting the interrsts of both States, through meetings and exchanges of views at all levels.
ARTICLE 5: The High Contracting Parties shall continue to strengthen and widen their mutually advantageous and all-round cooperation in the economic, scientific and technical fields. The two countries shall between them on the basis of the principles of equality, mutual benefit and the most favoured nation principle.
ARTICLE 6: The High Contracting Parties further agree to make joint studies and take joint action in the fields of flood control, river basin development and the development of hydro-electric power and irrigation.
ARTICLE 7: The High Contracting Parties shall promote relations in the fields of art, literature, education, culture, sports and health.
ARTICLE 8: In accordance with the ties of friendship existing between the two countries each of the High Contracting Parties solemnly declares that it shall not enter into or participate in any military alliance directed against the other Party.
Each of the High Contracting Parties shall refrain from any aggression against the other Party and shall not allow the use of its territory commiting any act that may cause military damage to or constitute a threat to the security of the other High Contracting Party.
ARTICLE 9: Each of the High Contracting Parties shall refrain from giving any assistance to any third Party taking part in an armed conflict against the other Party. In case either Party is attacked or threatened with attack, the High Contracting Parties shall immediately enter into mutual consulations in order to take appropriate effective measures to eliminate the therat and thus ensure the peace and securilty of their countries.
ARTICLE 10: Each of the High Contracting Parties solemnly declartes that it shall not undertake any commitment, secret or open, toward one or more states which may be incompatible with the present Treaty.
ARTICLE 11: The present Treaty is signed for a term of twenty five years and shall be subject to renewal by mutual agreement on the High Contracting Parties.
The Treaty shall come into force with immediate effect from the date of its signature.
ARTICLE 12: Any differences in interpreting any article or articles of the present Treaty that may arise between the High Contracting Parties shall be settled on a bilateral basis by peaceful means in a spirit of mutual respect and understanding.
Done in Dacca on the Nineteenth Day of March, Nineteen Hundred and Seventy-two.

SHEIKH MUJIBUR RAHMAN
Prime Minister
For the People's Republic of Bangladesh

INDIRA GANDHI
Prime Minister
For the Republic of India

শেখ মুজিবের রাজনৈতিক উত্থান
ড. এম. নজরুল ইসলাম

আমলাতন্ত্রের সংস্কার প্রসঙ্গে শেখ মুজিব
ড. মোহাম্মদ আবদুল হাকিম

শাসনতান্ত্রিক কার্যক্রম: প্রসঙ্গ মুজিব শাসনামল
ড. দিলারা চৌধুরী

মুজিব শাসনামলে সংসদীয় গণতন্ত্র
ড. মাহফুজ পারভেজ

মুজিব আমলের বাংলাদেশ ও বৃহৎ শক্তি
ড. মোহাম্মদ সোলায়মান

শেখ মুজিবের একদলীয় বাকশাল ব্যবস্থা
ড. তারেক শামসুর রেহমান

মুজিব শাসনামলে বিরোধী দল: সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা
ড. জোহোরা খানম

সাফল্য ও ব্যর্থতার নিরিখে মুজিব নেতৃত্ব
ড. হাসান মোহাম্মদ

মুজিব শাসনের পতন: একটি বিশেষণ
ড. ইউ.এ.বি. রাজিয়া আখতার বানু

শেখ মুজিব : জীবনপঞ্জী